মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই

মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই

স্বপন চক্রবর্তী
সম্পাদিত

সূচি

ভূমিকা

তত্ত্ব আছে, তথ্য আছে, কিন্তু এই সংকলনটি তত্ত্বের বই নয়, গবেষণাগ্রন্থও নয়। ২০০৩ সালে হালেদের ব্যাকরণ প্রকাশের দু-শো পঁচিশ বছব পূর্তি উপলক্ষে আমরা, মানে *অবভাস* পত্রিকার পরিচালক ও বন্ধুরা, পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা করি। সেটিতে দুই বাংলার গ্রন্থবিদ্‌দের আমরা একজোট কবতে চেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক, পাঠতাত্ত্বিক, সম্পাদক, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী, প্রকাশক, গ্রন্থেতিহাস-বিশেষজ্ঞ, সাহিত্যবিদ্, মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ, কোষগ্রন্থের সংকলক, হরফশিল্পী—সকলেই ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য, তাঁদেব প্রায় সকলেরই আনুকূল্য পেয়েছিলাম আমবা। যাঁরা নতুন লেখা দিয়ে উঠতে পাবেননি তাঁরাও তাঁদের প্রকাশিত লেখার প্রাসঙ্গিক অংশ পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে আমাদেব মানিত করেছেন। আনিসুজ্জামান, মুনতাসীর মামুন ও শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যাযের রচনাগুলি বাদ দিলে আর বাকি সবকটি লেখা ছাপার অক্ষরে প্রথমবারেব মতো প্রকাশের কৃতিত্ব ও দায়িত্ব *অবভাস* পত্রিকার ও সংস্থার।

হালেদেব ব্যাকরণ বেরোবার দু-শো বছর পূর্ণ হওয়াতে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাংলা ছাপা বই সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছিলেন আনন্দ পাবলিশার্স। তার পব সিকি শতাব্দী কেটে গেছে। এবই মধ্যে আমূল বদলে গেছে প্রকাশনা ও পাঠের প্রযুক্তি, সম্পাদনার রীতিনীতি, গ্রন্থেতিহাস ও মুদ্রণ সংস্কৃতির তাত্ত্বিক প্রকল্প। অথচ বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ প্রায় নেই বললেই চলে। কবে আমাদের হাতে আসবে গবেষণার মৌল রসদ, প্রকাশকের আর্কাইভস বা মুদ্রিত গ্রন্থের বিশদ পঞ্জি, তার জন্যে মুখ ভার করে বসে থাকা নিরর্থক। ফলে শুভানুধ্যায়ীদের পবামর্শে আমরা স্থির করি যে, বিশেষ সংখ্যাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটির দু-একটি লেখা এই বইয়ে বাদ গেছে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দু-একটি নতুন লেখা। সংযোজনের মধ্যে আমার নিজের রচনাটিও পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আমন্ত্রণে সেটি লেখা হয়েছিল, তার জন্যে আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সুযোগে বিশেষ সংখ্যাটির পাঠক, গ্রাহক, বিক্রেতা ও বিজ্ঞাপনদাতাদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই এই গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী অজয় গুপ্তকে।

পলাশ বরন পাল শুধু পদার্থবিজ্ঞানী নন, তিনি সাহিত্যিক, অনুবাদক এবং বাংলা বানান ও হরফ বিষয়ে গবেষক। একটি বিশেষ বাংলা হরফেরও তিনি নির্মাতা। তাঁর

বক্তব্য অন্য বানানে ও হরফে ছাপা মুশকিল, সেটা করলে তাঁর যুক্তির প্রতি অবিচার করা হয়। সে কারণে প্রথম প্রকাশের সময় তাঁর লেখাটি তাঁর উদ্ভাবিত হরফে ও তাঁর প্রস্তাবিত বানানরীতি মেনে ছাপা হয়। বইতে দৃশ্যগত সংগতির স্বার্থে হরফ সামান্য বদল করা হয়েছে, কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর পছন্দের বানানই বহাল আছে। তাঁর প্রবন্ধে সূত্রোল্লেখের ধরনটিও তাঁর নিজস্ব। বইয়ের অন্যত্র বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে লেখকের রীতি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বই সম্পর্কিত বইয়ে যে-অঙ্গসৌষ্ঠব এবং সম্পাদনার যে-মান প্রত্যাশিত তা আমরা সবসময় বজায় রাখতে পারিনি। এ ব্যাপারে প্রাণপাত করেছেন *অবভাস* পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার দুই প্রাণপুরুষ—পার্থ চক্রবর্তী ও শিবাশিস দত্ত। তাঁদের পরিশ্রমের মান না রাখতে পারার সব দায় আমার।

স্বপন চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস: কিছু মৌল সমস্যা

অভিজিৎ গুপ্ত

গত দু-দশকে পশ্চিমের বিদ্যায়তনগুলিতে একটি লুপ্তপ্রায় গবেষণাধারা নতুন কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে। History of the Book বা গ্রন্থেতিহাস নামধারী এই বিষয়ের ছত্রচ্ছায়ায় ইদানীং মুদ্রণ-প্রকাশন-বিপণন-পাঠ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব হচ্ছে। বিশ শতকের সাত ও আট দশকে থিওরির একচেটিয়া আধিপত্যের পর গ্রন্থেতিহাসের পথ ধরে অনেকেই এক বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর গবেষণা পদ্ধতির আবহে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, এই প্রত্যাবর্তনের পথ আদৌ নিষ্কন্টক নয়। যে-কোনো ইতিহাসনিষ্ঠ গবেষণার জন্য কতকগুলি ন্যূনতম শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে অত্যাবশ্যক হল মূলসূত্র বা primary sources-এর জোগান। এই মূলসূত্র—বিশেষত গ্রন্থেতিহাসে—প্রায়শই প্রচলিত অর্থে বইয়ের আওতার বাইরে পড়ে। একাধিক চিহ্নিত পৃষ্ঠাকে একত্রিত করার প্রযুক্তিকে যদি বই আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে তার সবচেয়ে পরিচিত চেহারা হল কোডেক্স (codex), যেখানে দুটি মলাটের আধারে চিহ্নিত পৃষ্ঠাগুলি পর পর বিন্যস্ত। সাবেকি পাঠাভ্যাসে পৃষ্ঠার এই চিহ্নগুলিকেই টেক্সট বা পাঠ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রন্থেতিহাসে বইয়ের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে সমান নজর দেওয়া হয়, যেমন হরফ, ছাপা, বাঁধাই, অলংকরণ, ডাস্ট জ্যাকেট, কাগজ ইত্যাদি। ফলে গ্রন্থেতিহাসিককে সম্পূর্ণ নতুন একটি পাঠাভ্যাস রপ্ত করতে হয়। এবং সেই অভ্যাসের সহায়ক পাঠগুলি প্রায়শই সারস্বত অনুশীলনে তেমন কলকে পায় না—যেমন বিজ্ঞাপন, দলিল-দস্তাবেজ, রসিদ, পোস্টার, বিজ্ঞপ্তি, টিকিট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি। দৈনন্দিন জীবনে এগুলির প্রয়োজন ও ব্যবহার সচরাচর তাৎক্ষণিক হওয়ায় যাদের ওপর সংবক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়, অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, তারা স্বভাবতই এগুলিকে সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হন না। একটি দৃষ্টান্ত: পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রন্থাগারিক হার্ডব্যাক বইয়ের ডাস্ট জ্যাকেট সংরক্ষণ করেন না। অথচ এই ডাস্ট জ্যাকেট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পাঠকে paratext আখ্যা দিয়ে ইদানীং একটি সম্পূর্ণ নতুন পাঠতত্ত্ব গড়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন বা করবেন, তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ: এই গবেষণার সহায়ক পাঠ বা মূলসূত্র কতদূর সহজলভ্য? এই

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একজনের পক্ষে অসম্ভব, কেননা ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস একাধিক গ্রন্থেতিহাসের সমষ্টি। তবু এই ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের মধ্যে হয়তো কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। গবেষণার সহায়ক মূলসূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে একটি সাধারণ লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট মনে হয়েছে যা হল মূলসূত্রের অভাব। এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় বঙ্গদেশের গ্রন্থেতিহাসের মূলসূত্রের খতিয়ান। তবুও সমগ্র ভারতবর্ষের একটা রূপরেখা হয়তো পাওয়া সম্ভব।

যে-কোনো দেশের গ্রন্থেতিহাস আমরা মোটামুটি চারটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করতে পারি—মুদ্রণ প্রযুক্তির ইতিহাস, পুস্তক ব্যাবসার ইতিহাস, পাঠক ও পাঠের ইতিহাস ও গ্রন্থাগারের ইতিহাস। এযাবৎ গ্রন্থেতিহাসে যা কাজ হয়েছে, তার সিংহভাগ প্রথম দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে। গ্রন্থাগারের ইতিহাস নিয়ে কিছু কিছু কাজ হয়ে থাকলেও পাঠক/পাঠের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা অতি বিরল। এর মধ্যে আবার প্রযুক্তির ইতিহাসের অনেকটাই পড়ে যায় মুদ্রণ কারিগরি বা printing engineering-এর আওতায়। মুদ্রণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র। এই দেশে এই একুশ শতকেও অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তির পাশাপাশি সাবেকি লেটারপ্রেস প্রযুক্তির নিশ্চিন্ত সহাবস্থান। এর ফলে লেটারপ্রেস এখনও সম্পূর্ণ 'ইতিহাস' হয়ে যায়নি, যেমনটা হয়েছে পশ্চিমে। তবুও উনিশ শতকের মুদ্রণ শিল্পের প্রায় কোনো রকম নিদর্শনই অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। উইলিয়াম কেরির শ্রীরামপুরস্থ মিশন প্রেসের হরফশিল্পী পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি হরফ বা ছাঁচের কোনো নমুনা আমাদের নেই, উনিশ শতকের ছাপা ছবির ব্লকও প্রায় অলভ্য বললেই চলে। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে—১৯৭৬ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে চার্লস উইলকিন্সের নামাঙ্কিত একটি বাক্সে বাংলা হরফের ম্যাট্রিক্স বা ছাঁচ খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ লিখেছেন: 'প্রতিটি ম্যাট্রিক্সের ওপর কাগজ মুড়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে বাংলা হরফটিও লিখে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণ। ...অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাকর এবং লন্ডনের মুদ্রা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির গবেষকরা অক্সফোর্ডের ওইসব ম্যাট্রিক্স ও পাঞ্চ থেকে হরফ ঢালাই করান।'[২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসের ওয়ালটন স্ট্রিটের মহাফেজখানায় এখনও কিছু উনিশ শতকের বাংলা হরফ খুঁজে পাওয়া সম্ভব—অন্তত সম্ভব ছিল নব্বইয়ের দশকে। কিন্তু বর্তমান কর্তৃপক্ষের কালাপাহাড়িপনার ফলে সেগুলি স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। মনে রাখবেন, এই ও.ই.উ.পি.-ই ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিপত্রের ফাইল স্থানাভাবের যুক্তি দেখিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

যাক সে কথা। গ্রন্থেতিহাসের দ্বিতীয় ধারাটিতে আসা যাক। পুস্তকের ব্যাবসা বলতে কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে

যুক্ত থাকে নানা পেশাদার গোষ্ঠী। নিম্নের রেখাচিত্র থেকে এই গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের একটা আভাস পাওয়া যাবে:
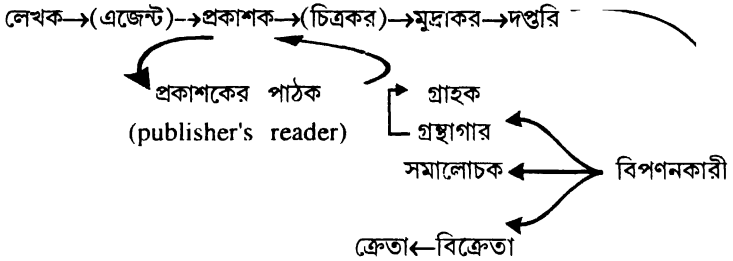
এই গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আবার স্থির করে কতকগুলি সাংগঠনিক ও আইনি শর্তাবলি। যেমন, লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের দুটি প্রাচীন সূচক হল স্বত্ব ও স্বত্বমূল্য। এই দুটি বিষয়ে ঐকমত্য যে-কোনো প্রকাশনার পূর্বশর্ত। অথবা, প্রকাশক-মুদ্রাকর সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বইয়ের ছাপার উৎকর্ষ, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি। আজকের দিনে প্রকাশক ও মুদ্রাকর প্রায়শই স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এক সময় এই দুই সত্তা এক দেহে লীন ছিল। আবার, লেখক ও পাঠকের সম্পর্কে বিপণনকারী ও বিক্রেতার ভূমিকা উপেক্ষা করার কোনো উপায় থাকে না। বিক্রেতা / বিপণনকারীর ভূমিকা বুঝতে গেলে আবার ব্যাবসা ও কোম্পানি সংক্রান্ত আইনকানুন মাথায় রাখতে হচ্ছে। এ ছাড়া তো রয়েইছে সেন্সরসিপ, প্লেজিয়ারিজ্‌ম, নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ।

এবার দেখা যাক এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মূলসূত্র কী কী। লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের অপরিহার্য সূত্র প্রকাশকের আর্কাইভস। এখানেই ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাসকে প্রথম হোঁচট খেতে হচ্ছে। যতদূর জানি, অদ্যাবধি কোনো ভারতীয় প্রকাশক তাঁদের আর্কাইভস সংরক্ষণ করেননি। বহু ক্ষেত্রে আর্কাইভস সংরক্ষণেব কোনো তাগিদই প্রকাশকদের নেই, কেননা পুরোনো কাগজপত্র ওজনদরে বিক্রি করে দিলে দু-পয়সা ঘরে আসে। অথচ পশ্চিমে গ্রন্থেতিহাসের সাম্প্রতিক রমরমার একটি প্রধান কারণ প্রকাশক-আর্কাইভসের সহজলভ্যতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে ম্যাকমিলান প্রকাশন সংস্থার আর্কাইভের কথা ধরা যাক। বিশ শতকে ম্যাকমিলানের আর্কাইভস জমা পড়ে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে, সেখানে সেটির সংরক্ষণ, ক্যাটালগিং, মাইক্রোফিল্‌মিং সবই করা হয় এবং গবেষকদের ব্যবহারের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে মাইক্রোফিল্‌ম প্রযুক্তির ফলে আর্কাইভস দেখার জন্য মূল গ্রন্থাগার বা সংগ্রহশালায় আর ছোটার দরকার হচ্ছে না (যদিও এখানে বলে রাখা ভালো যে, সব মাইক্রোফিল্‌ম প্রকাশকই যে চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য তা নয়, অনেক সময়ে তাঁরা আর্কাইভের একাংশ মাইক্রোফিল্‌ম না করে সে কথা বেমালুম চেপে যান)। ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাসে যে-দুটি প্রকাশক-আর্কাইভস বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির একটি ম্যাকমিলান, অন্যটি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস। এই দুই আর্কাইভস খনন করে গ্রন্থের ইতিহাস কতদূর

পুনরুদ্ধার করা সম্ভব তা সম্প্রতি দেখিয়েছেন দুই গবেষক প্রিয়া জোশি[৩] ও রিমি চট্টোপাধ্যায়[৪]। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই দুই সংস্থার ভারতবর্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রভূত গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোনো দেশীয় প্রকাশকের ইতিহাস উদ্ধার করা যায়নি, শুধুমাত্র কয়েকটি খণ্ডচিত্রে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রকাশকেরা আবার অনেকেই ই-মেল বা ইন্টারনেট মারফত তাঁদের বাণিজ্য চালান, ফলে পুরোনো আমলের কাগজপত্র সংরক্ষণের তাগিদ আরও কমে গিয়েছে।

প্রকাশকের আর্কাইভস ছাড়া আর কী ধরনের মূলসূত্র বঙ্গদেশে লভ্য? এবার আসা যাক প্রকাশিত সূত্রের তালিকায় (published sources), যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রন্থপঞ্জি বা bibliography। কিন্তু এখানেও আমাদের হোঁচট খেতে হচ্ছে। পরিভাষায় আমরা যাকে বলি bibliographical control, তার অবস্থা ভারতবর্ষে এখনও সন্তোষজনক নয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৬৭ বছরটিকে আমরা একটি জল-বিভাজিকা বলে গণ্য করে থাকি। সে বছরে প্রণীত হয় 'ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'। এ প্রসঙ্গে মেরি লয়েডের মন্তব্য:

> The Indian Press Act of 1867 had required publishers to deposit three copies of all publications with their local governments, one copy of which was to be made available to the India Office Library; the Press Regulation Act of 1890 extended this privilege to the British Museum Library. Quarterly lists of publications were printed and despatched to London from which the two selected their requirements.

এর ফলে ১৮৬৭ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষে প্রকাশিত সবরকম প্রকাশনার হদিশ রাখা সম্ভব হয়। তবে ১৮৬৭-১৯৪৭ এই সময়কালের প্রতিটি প্রকাশনাই যে ইন্ডিয়া অফিস বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে জমা পড়েছে এমন নয়, মেরি লয়েডের জবানিতে 'the two [libraries] selected their requirements'। স্বাধীনতার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যখন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে এই বিবলিওগ্রাফির দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর বর্তায়। ১৯৫৪ সালের 'ডেলিভারি অফ বুকস অ্যাক্ট' ও ১৯৫৭ সালের 'কপিরাইট অ্যাক্ট'-এর শর্তানুযায়ী প্রত্যেক প্রকাশক / মুদ্রক কর্তৃক প্রকাশিত / মুদ্রিত প্রতিটি বইয়েব একটি কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এর ফলে সে সমস্ত বই নিয়মমতো জমা পড়েছে তা নয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের এক প্রাক্তন অধিকর্তার মন্তব্য:

> It is very strange that in India there are three similar Acts in vogue simultaneously...They are confusing not only to publishers / printers but have proved to be the

> main bone of contention between the book industry and actual efforts for bibliographic control in India. Since the INB coverage is solely dependent on the receipts of the National Library under the D. B. Act, the gaps in coverage are glaring.

এই উক্তি থেকে অনুমেয় যে, উল্লিখিত INB (Indian National Bibliography) প্রকল্প আশানুরূপ ফল প্রদর্শন করতে পারেনি। তবুও মোটের ওপর এ কথা বলা যেতে পারে যে, ১৮৬৭ সালের পর থেকে পূর্ণাঙ্গ না হলেও প্রায়-সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা গিয়েছে। কিন্তু ১৮৬৭ সাল অবধি প্রকাশনার ক্ষেত্রে বহু ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে। এই ফাঁকগুলো বোজানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে ব্রিটিশ লাইব্রেরির রেফারেন্স ডিভিশন একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থসূচি সংকলনের কাজে হাত দেন। ১৫৫৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ ও বর্মায় প্রকাশিত যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো বইয়ের যে-কোনো সংস্করণ সম্বন্ধে বিবলিওগ্রাফিক তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে *সাউথ এশিয়া অ্যান্ড বার্মা রেট্রসপেক্টিভ বিবলিওগ্রাফি (SABREB)* প্রকল্প সূচিত হয়।[৭] গ্রেহাম শ-এর তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্পের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে, যা'র সময়সীমা ১৮০০ সাল পর্যন্ত। সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাসের এটিই সবচেয়ে মূল্যবান প্রকাশিত সূত্র। কেননা শ শুধু বইয়ের বিবলিওগ্রাফিক তথ্য পরিবেশন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সেগুলি ইদানীং কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে তা-ও নির্দেশ করেছেন, ফলে *SABREB* হয়ে উঠেছে প্রকৃত অর্থে একটি location register। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ব্রিটিশ লাইব্রেরি এই প্রকল্পের প্রতি অর্থানুকূল্য বন্ধ করে দেওয়ায় ১৮০১ থেকে ১৮৬৭, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ৬৭টি বছরের পঞ্জি করে ওঠা সম্ভব হয়নি। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে যে এ সময়ের কোনোই গ্রন্থপঞ্জি নেই তা নয়, ১৮৫৫ সালে রেভারেন্ড জেমস লং সংকলিত গ্রন্থপঞ্জি সম্ভবত ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম আধুনিক গ্রন্থপঞ্জি।[৮] উনিশ শতকে আরও পঞ্জি তৈরি করেছেন রেভারেন্ড জন ওয়েঙ্গার[৯] এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরির প্রবাদপ্রতিম জে. এফ. ব্লুমহার্ট[১০]। ব্লুমহার্ট সংকলিত ক্যাটালগগুলি ব্রিটিশ লাইব্রেরির দুটি প্রধান সংগ্রহকে কেন্দ্র করে তৈরি—ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। উনিশ শতকের শেষ দিকে সংকলিত এই পঞ্জিগুলির উৎকর্ষ আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু বিশ শতকে এই পঞ্জি সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। একমাত্র ব্যতিক্রম যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, যিনি ১৭৪৩-১৮৫২ ও ১৮৫৩-৬৭, এই দুই খণ্ডে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন।[১১] দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা ঘোষণা করা হয় যে, ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা বইয়ের একটি গ্রন্থাগারবিদ্যা-সম্মত পঞ্জি প্রস্তুতের প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি খণ্ডে এই পঞ্জি প্রকাশ করা হবে। অদ্যাবধি কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের পর আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া এই দ্বিতীয় খণ্ডে দুটি প্রধান ত্রুটি লক্ষ করা যায়। এক, বইয়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অথবা আকৃতির কোনো উল্লেখ নেই। দুই, বইগুলি কোন গ্রন্থাগারে লভ্য (বা আদৌ লভ্য কি না) তার কোনো নির্দেশ নেই। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারে সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রতিটি গ্রন্থ আলাদাভাবে পরীক্ষা না করলে এই তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আকাদেমি সেই পথে না হেঁটে শুধুমাত্র প্রকাশিত পঞ্জি ও ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে ইতস্তত প্রেরিত আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি থেকে তাঁদের গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করেছেন বলে মনে হয়।

উপরিউক্ত পঞ্জিগুলি বাদ দিলে মূলসূত্র বলতে আর তেমন কিছু চোখে পড়ে না। পুস্তক ব্যবসায়ে বৃত অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মুদ্রক ও পুস্তকবিক্রেতা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় থ্যাকারস 'বেঙ্গল' এবং 'ক্যালকাটা' ডিরেক্টরি থেকে। গ্রেহাম শ তাঁর *প্রিন্টিং ইন ক্যালকাটা টু ১৮০০*[১২] গ্রন্থে সমসাময়িক সংবাদপত্রের সাক্ষ্য থেকে এই সময়ের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। অন্যত্র প্রিয়া জোশি বিভিন্ন সাধারণ ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পঞ্জি ও কার্যবিবরণী থেকে উনিশ শতকের পাঠাভ্যাস সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছেন। অপরদিকে, কিছু কিছু মূলসূত্র এখনও গবেষকরা তেমনভাবে ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায় না। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ফরেন অ্যান্ড বাইবেল সোসাইটির প্রকাশনাসমূহ। উইলিয়াম কেরির ১৮০০ সালের সুসমাচার থেকে শুরু করে উনিশ শতকে ভারতবর্ষে প্রকাশিত শতাধিক বাংলা বাইবেল এই সংগ্রহে লভ্য। ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের আর্কাইভসে (যা ইদানীং মাইক্রোফিল্‌ম করা হয়েছে) ওয়ার্ড-কেরি-মার্শম্যান ছাড়াও রামরাম বসু প্রমুখদের সম্বন্ধে বহু তথ্য ও নথিপত্র রয়ে গেছে যার যথোপযুক্ত সদ্‌ব্যবহার এখনও করা হয়নি বলে মনে হয়। এ ছাড়া লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে জমা পড়েছে ১৮৬৭ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে প্রেরিত সমস্ত বাংলা প্রকাশনা। এই ধরনের খণ্ড খণ্ড সূত্র থেকে বঙ্গদেশে গ্রন্থেতিহাস রচনার একটা প্রয়াস পাওয়া যেতে পারে। পাঠকরা লক্ষ করবেন, আমি বঙ্গদেশের গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্তব্য মূলসূত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মন্তব্য করিনি। এই সূত্রগুলি বঙ্গদেশে গবেষণারত বহু গবেষক ব্যবহার করেছেন ও করে চলেছেন, এবং সেগুলির উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা কমবেশি অবহিত।

এ হেন পরিস্থিতিতে কী ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব? এক, গ্রন্থেতিহাসিককে নতুন নতুন মূলসূত্র খুঁজে বার করার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। দুই, সেই মূলসূত্রগুলিকে যুগোপযোগী প্রযুক্তির দ্বারা একত্রিত করতে হবে। আজকের দিনে এই ধরনের কাজ কম্পিউটারের দৌলতে অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায়; keyword দিয়ে

অনুসন্ধান করার সুযোগ মুদ্রণের আমলে সম্ভব ছিল না। এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম সাত ও আটের দশকে থিওরির একচেটিয়া আধিপত্যের কথা উল্লেখ করে। এর ফলে মূলসূত্রের জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়েছিল। আশা করা যায়, একুশ শতকের গবেষকেরা অনেকে মিলে এই কাজে হাত লাগিয়ে গবেষণার ন্যূনতম উপাদানগুলির নিয়মিত সরবরাহ্ বজায় রাখবেন।

১. Gérard Genette, *Paratext Thresholds of Interpretation*, trans Jane Lewin (New York Cambridge University Press, 1997)
২. শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৭৭), পৃ ৬৮-৯।
৩. Priya Joshi, *In Another Country Colonialism Culture and the English Novel in India* (New York: Columbia University Press, 2002)
৪. Rimi B Chatterjee, 'History of the Trade to South Asia by Macmillan and Company and Oxford University Press 1875-1900' (D. Phil dissertation, Oxford University, 1997). *Empires of the Mind A History of Oxford University Press in India During the Raj* (Delhi: Oxford University Press, 2006)
৫. Mary Lloyd, 'Publications Proscribed by the Government of India The Collection in the British Library (IOLR & DMPB)', *South Asian Studies British Library Occasional Papers 7* (London· British Library), pp 102-5
৬. Kalpana Dasgupta, 'Overview of the National Seminar on Bibliographical Control in India', *Bibliographical Control in India· National Library Conferences 2* (Calcutta· National Library, 1988), pp 1-3
৭ Graham Shaw, *South Asia and Burma Retrospective Bibliography (SABREB) Stage 1 1556-1800* (London British Library, 1987)
৮. James Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (Calcutta Sanders, Cones and Company, 1855)
৯. John Wenger, *Selections from the Records of the Bengal Government Catalogue of Bengali and Sanskrit Publications* (Calcutta, 1865).
১০. J. F Blumhardt, *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum* (London British Museum, 1886). *Catalogue of the Library of the India Office*. vol 2, part 4 *Bengali, Oriya and Assamese Books* (London: British Museum, 1905).
১১. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা* ১৭৪৩-১৮৫২ (কলকাতা. এ. মুখার্জী, ১৯৯০); *মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি* ১৮৫৩-১৮৬৭ (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৩)।
১২. Graham Shaw, *Printing in Calcutta to 1800 A Description and Checklist of Printing in Late 18th Century Calcutta* (London· Bibliographical Society, 1981).

হাতে লেখা বই

তুষারকান্তি মহাপাত্র

পুথি, হাতে লেখা বই। ছাপা বই এসে আস্তে আস্তে তার জায়গা দখল করেছে আর সে হয়ে গেছে প্রায় প্রত্নবস্তুর মতো। তার জায়গা পুথিশালায় শুধু উৎসাহী গবেষকের তৃষ্ণা মেটাতে। সাধারণ লোকের পুথির প্রতি আগ্রহ নেই, পুথির মধ্যে ঢোকার ক্ষমতাও নেই। পুথিতে যা লেখা আছে তা যদি ছাপা অক্ষরেই পাওয়া যায় তাহলে পুথি পড়ার কষ্ট স্বীকার করার দরকার কী? পুথি নিয়ে লোকের উৎসাহ তাই কম।

চলমান হরফে প্রথম ছাপা হয় ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে—গুটেনবার্গের ছাপা লাতিন বাইবেল। পৃথিবীর প্রথম ছাপানো বই ভূমিষ্ঠ হল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই প্রথম বই হাতে এল। খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে তিন হাজার বছরেরও আগে সুমেরবাসীরা মাটির ফলক ব্যবহার করে লেখার জন্ম দেয়। তার কিছু পরে সুমেরীয় সভ্যতার সাহায্য নিয়ে অথবা না নিয়ে মিশরীয়রা তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করে প্যাপিরাস বা হোগলাজাতীয় একটি জলজ উদ্ভিদকে কাগজের কাজে ব্যবহার করে। ফরাসি পণ্ডিত শাঁপোইওঁ-কে (Champollion) চিরকাল মানুষ মনে রাখবে তাঁর পুরোনো গ্রিক লিপির সাহায্যে ডেমোটিক ও তার সাহায্যে হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্যে।

ইতিমধ্যে সুমেরের (ইরাক) উত্তরে আক্কাদ আর তার উত্তরের রাষ্ট্র আসিরিয়ায় মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। সেমাইটরা সুমের ও আক্কাদ জয় করে সেখানকার রাজা হয়ে বসল। সেমাইট-রাজ হামুরাবি (আনু. খ্রিস্টপূর্ব ১৮১০-১৭৫০) রাজ্য পরিচালনার জন্যে প্রথম আইন তৈরি করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি পাথরে খোদাই করে যে-মূর্তি রেখে গেছেন তাতে দেখা যায় হামুরাবিকে সূর্যদেবতা আইন বিষয়ক পুথি দান করছেন। তাঁর রাজধানী ব্যাবিলন থেকেই ব্যাবিলনীয় সভ্যতার নাম।

এর পর এল আসিরীয় সভ্যতার উৎকর্ষের কাল। অসুরবনিপাল (খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৯-২৬) সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় ভাষায় লেখা বহু বই সংগ্রহ করান। তিনি চাননি দেশের কৃতী ছাত্রেরা ব্যাবিলনে গিয়ে ভিনদেশে মেধা বিক্রি করুক। তাঁরই যত্নে আসিরিয়ায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র যেমন বাড়ে বইয়ের সংখ্যাও তেমনই বেড়েছিল। নিনেভে তাঁর তৈরি গ্রন্থশালা থেকে পাওয়া গেছে বাইশ হাজার মাটির ফলক বা টালি যা ছিল সেকালে বইয়ের পাতা।

সিরিয়ার একটু দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠে ফিনিসীয় সভ্যতা। এর অধিবাসীরা বই লিখিয়ে বলে তেমন খ্যাতি অর্জন করতে না পারলেও খ্রিস্টজন্মের

আনুমানিক হাজার বছর আগে মিশর ও ব্যাবিলনের লিপিকে সহজ সরল ও বর্ণলিপির কাছাকাছি করে বাণিজ্যসূত্রে উপহার দিয়েছিল নানা দেশে। গ্রিকরা সেই লিপি থেকেই বর্ণমালা ও ধ্বনিভিত্তিক লিপি তৈরি করে নেয়। এই বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংযোগও গ্রিকদের কীর্তি। রোমক লিপি, যা ইউরোপের নানা দেশের লিপির জন্মদাতা, তার সূত্রপাত ঘটে গ্রিক বর্ণমালাকে অনুসরণ করেই। সে যা-ই হোক, খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকেই গ্রিকরা বিশাল গ্রন্থাগার তৈরি করেছিল। হোমরের কাব্য প্রথম সম্পাদনা করেন জেনোদোতুস আর প্রথম গ্রন্থকার-তালিকা তৈরি করেন কালিমাখুস (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক)। এর থেকেই বোঝা যায় পুথিকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল গ্রিকরা।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইহুদি নেতা মুসাকে য়েহোবা যে-দশটি অনুশাসন দান করেন বলে বলা হয় তা লেখা ছিল সিনাইতে পাহাড়ের গায়ে। লেখার উপাদানবৈচিত্র্যে চীন পিছিয়ে ছিল না। হোয়ান প্রদেশে শাং আমলের (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০-১০৪৫) নানা বিষয়ে লেখার যে-নিদর্শন পাওয়া গেছে তা লেখা হয়েছিল হাড় ও কচ্ছপের খোলে। এই নিদর্শনগুলির লিপি এত পরিণত যে, পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন এর অনেক আগে থেকেই লিপির ব্যবহার ছিল চীন দেশে।

পড়াশোনা যে সুদূর অতীতেও এই দেশগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল তার প্রমাণ স্কুলের অস্তিত্ব। মিশরে স্কুলগুলি ছিল মন্দির সংলগ্ন। বলা বাহুল্য, পড়াশোনা করার ও লিপিকর হওয়ার অধিকার ছিল শুধু পুরোহিত সম্প্রদায়ের। এ ব্যাপারে সুমের বা ব্যাবিলন ছিল অনেক এগিয়ে। সেখানে লিপিকরদের ছিল দুটি শ্রেণি। 'জুনিয়র'দের যোগ মন্দিরের সঙ্গে আর উচ্চবর্গের লিপিকররা রাজপ্রাসাদে ঠাঁই পেতেন। এঁরা প্রায় সবাই আসতেন সমাজের অভিজাত পরিবার থেকে। দু-হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের যে-পাঁচশোজন লিপিকর তাঁদের পারিবাবিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অভিজাত পরিবারের। একটু হলেও অঘটন যে একদম ঘটেনি তা অবশ্য নয়। অন্তত একজনের কথা জানা যাচ্ছে যে কুলশীলের মর্যাদা না থাকা সত্ত্বেও স্কুলে ভরতি হতে পেরেছিল। বিদ্যাচর্চার জন্যে ব্যয়ের পরিমাণ খুব বেশি হলেও যিনি তার জন্যে এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি স্কুলে পাঠাবার আগে তার আরও একটি মহা উপকার করেছিলেন—কুকুরের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। অন্তত এতে প্রমাণিত হয়, আভিজাত্যের বাঁধে সেকালের বিদ্যা পুরোপুরি আটকে ছিল না।

যা-ই হোক, যাঁরা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ছাপা বইকে একটু বেশি মর্যাদা দেন তাঁরা আসল সত্যটার দিকে একবার দৃষ্টি দিতে পারেন—ছাপা বই মানুষকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছে মাত্র সাড়ে আটশো বছর। আর হাতে লেখা বই সেই একই কাজ করেছে প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে। লিপিবৈচিত্র্য বা লেখার উপাদানের বৈচিত্র্যেও সেকালের গৌরব বোধ হয় একালের গৌরবকে কিঞ্চিৎ ম্লান করে দিয়েছে। ফলে কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি তো সেকাল আশা করতেই পারে।

ভারতবর্ষের দিকে তাকালেও একইরকম ঘটনা দেখা যাবে। তবে একটা দুঃখের

বোঝা আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। শাঁপোইওঁ-র জন্যে নেপোলিয়নের সেনাপতি খুঁজে দিয়েছিলেন 'রসেটা স্টোন'—ত্রিভাষিক লিপি। রলিনসন-ও পেয়ে যান বেহিস্তুনে দরায়ুসের ত্রিভাষিক লিপির নিদর্শন। ফলে মিশরের হায়ারোগ্লিফিক বা সুমের-এর বাণমুখ লিপি পড়তে অনেকটা সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মহেঞ্জোদরো বা হরপ্পায় ত্রিভাষিক কেন, একটা দ্বিভাষিক লিপির নিদর্শনও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই হরপ্পার লিপি চিত্রলিপির স্তর পেরিয়ে শব্দলিপির স্তরে পৌঁছোলেও সে লিপির পাঠ আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। এ অসুবিধে কবে দূর হবে কে জানে। এই সভ্যতার প্রাচীনতম স্তর আজও আমাদের অজানা। ২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগের স্তরগুলি সম্পর্কে জানা সম্ভব হলে হয়তো আমাদের আশা পূর্ণ হবে। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পায় লিপি ছিল এটা ঠিক, কিন্তু বই লেখায় সে যুগের ভারতবাসীর আগ্রহ ছিল কি না তা জানা যায় না। ব্যাবসাসূত্রে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সুমের বা ব্যাবিলনের পুথিপ্রীতি ভারতীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এমন কোনো তথ্য আজও পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় লিপির কিছুটা পরিণত নিদর্শন মেলে অশোকের কাল থেকে। তার আগের তিনটি নিদর্শনের অন্যতম সহ্‌গোরা তাম্রলিপি যে অশোকের পূর্ববর্তী কালের তা নিয়ে সংশয় নেই। এরান মুদ্রায় ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা দেখে একে অশোক-পূর্ববর্তীকালের বলে প্রথমে মনে করা হলেও নানা কারণে সেই মত এখন গ্রহণীয় নয়। পিপরাওয়া লিপিও পরবর্তীকালের হওয়ার সম্ভাবনা। তবু অশোকের লিপির পরিণত রূপ দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে, সে লিপির সূচনা অশোকের সময়ে হয়নি, হয়েছিল আরও আগে। সহ্‌গোরা লিপি তারই নিদর্শন।

অশোকের আগে ভারতে লিপি ছিল কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই ভারতে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অশোকের দীর্ঘ শিলালেখে যে সাহিত্যের ছিটেফোঁটা ফুটে উঠেছে তা হয়তো গ্রিক ঐতিহ্যের অনুসরণ। অশোকের কাল আনুমানিক ২৭৩-৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন যুগ তখন শেষ। তার মধ্যযুগ শুরু হয়ে গেছে অন্তত আড়াইশো-তিনশো বছর আগে। এই জন্যে অশোককে তাঁর অনুশাসনগুলি তৎকালীন জনসাধারণের বোধ্য প্রাকৃত ভাষায় লেখাতে হয়েছিল। তাহলে অশোক-পূর্ববর্তী বিপুল ভারতীয় সাহিত্য কীভাবে থেকে গেল, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আর্যরা ভারতে এসে বেদ রচনা শুরু করে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে। বেদের অধিকাংশ রচনা অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। বেদ সংকলনের কাজ শুরু হয় আরও অন্তত পাঁচশো বছর পরে। লিপি তখনও সম্ভবত অনাবিষ্কৃত। তার পর মুখের ভাষা প্রাচীনতার ছাপ ছেড়ে আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষার দিকে এগিয়েছে, কিন্তু বেদের ভাষা সুরক্ষিত থেকে গেছে শ্রুতিতে, গুরুপরম্পরায় এবং ধ্বনি-সুরক্ষার বিচিত্র কৌশলে। পদপাঠ, সংহিতা পাঠ, জটাপাঠ, ক্রমপাঠ ইত্যাদি রীতি বেদের ভাষা

ও ধ্বনিকে আজও অবিকৃত রেখেছে। এমন একটা ঘটনা ভাষা বা ধ্বনিবিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধু বিরল নয়, পরম বিস্ময়কর একমাত্র উদাহরণ। তিন হাজারেরও বেশি বছরের কোনো ভাষা ও তার ধ্বনিকে যে শ্রুতিতে ধরে রাখা সম্ভব এটাই সাধারণভাবে ধারণার বাইরে ছিল। এ কৃতিত্বটা আরও বেশি চোখে পড়ে এই জন্যে যে, পরবর্তী কালে রচিত সাহিত্য, শাস্ত্র ইত্যাদি যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখনও বেদের মতো কঠিন বিষয়কে লেখার জগতের বাইরে রাখা হয়েছে। বেদ মুদ্রিত হয়েছে সবার শেষে, অথচ অন্য শাস্ত্র ও সাহিত্যের তুলনায় বেদে পাঠভেদ দেখা গেছে সবচেয়ে কম। বেদ অপৌরুষেয় নিশ্চয়ই নয়, তবে তাকে স্মৃতিতে অবিকৃতভাবে ধরে রাখাটা নিঃসন্দেহে প্রায় অপৌরুষেয় ব্যাপার।

স্মৃতিতে রাখা বইয়ের কাল শেষ হয়ে ভারতে পুথি লেখার কাল কবে শুরু হয়েছিল তা জানা যায় না। পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) 'লিপি' শব্দের উল্লেখ, নীতিবিধানের জন্যে রচিত বিভিন্ন ধর্মসূত্রে লেখার উল্লেখ দেখে মনে হয় লেখার কাজ শুরু হয়েছিল পাণিনির সমসাময়িক কোনো সময়ে। ব্রাহ্মণরা অবশ্য তাঁদের রচনা লিপিবদ্ধ করায় বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন বৌদ্ধেরা। তাঁদেরই রচিত নানা জাতকে ও অন্য রচনায় বার বার লিপি ও লেখার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, ব্যাকরণ, রামায়ণ ও মহাভারতের অসংকলিত রূপ ইত্যাদি মিলিয়ে ভারতের বিপুল সাহিত্যসম্ভার শুধু স্মৃতিনির্ভর হয়ে টিকে থেকেছে অনেক কাল। তাতে সমাজ এত নিশ্চিন্ত ছিল যে, লিপিকে অপরিহার্য মনে করা হয়নি। লিখে রাখার ব্যাপারটা না ছিল জরুরি না পছন্দের। ফলে দীর্ঘকাল বই হয়ে থেকেছে মনে লিখে রাখা।

লেখার কাল যখনই আসুক, তার নিদর্শন কিন্তু কালের কপোলতলে হারিয়ে গেল। বাদ সাধল ভারতের আবহাওয়া। আর্দ্র ও গরম জলবায়ু ক্ষণজীবী লেখার উপাদানকে গ্রাস করেছে পুরোপুরিভাবে। ভারতীয় পুথির প্রাচীন নিদর্শন তাই খুঁজতে হয় মধ্যপ্রাচ্যে ও নেপালে। অনূদিত হলে চীনে ও তিব্বতে। আদি নিদর্শন হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই খরোষ্ঠিতে লেখা ধম্মপদ বা বৌদ্ধ ধর্মপদের পুথি লেখা হয়েছিল সম্ভবত দ্বিতীয় শতকে। খোটান থেকে পাওয়ায় একে 'খোটান ধম্মপদ' বলেও উল্লেখ করা হয়। ভারতীয় প্রাচীন পুথির যে-কটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা অঞ্চল ও কাশ্মীরের উত্তরে গিলগিট থেকে তাতে ভূর্জপত্র, তালপাতা ও কাগজ লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বৃষ্টিহীন খটখটে আবহাওয়া আর গিলগিটের শৈত্য পুথিকে বাঁচিয়ে রাখার আদর্শ পরিবেশ রচনা করেছিল।

খোটান ধম্মপদ পুথিটি ভূর্জপত্রে লেখা। ভূর্জপত্র বা ভোজপাতা গাছের পাতা নয়, ছাল। ভারতের উত্তর অঞ্চলে ২১২১ মিটার থেকে ৩৬৩৬ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ভূর্জবৃক্ষ জন্মায়। গাছের উচ্চতা বেশি নয়, গাছ পত্রবহুলও নয়। প্রচণ্ড শীত থেকে

আত্মরক্ষার জন্যে গাছগুলি একগুচ্ছ পাতলা ছালের আবরণ দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে। এই পবতে পরতে জড়ানো ছাল মাপ অনুসারে কেটে প্রত্যেকটি পরত আলাদা করে তেল মাখিয়ে অথবা দুধ বা কাঠকয়লা ও জলের মিশ্রণে ফুটিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও লিখনযোগ্য করে তোলা হত। দুধ দিয়ে ফোটালে তেলতেলে ভাব আসত। কাঠকয়লার গুঁড়োর সঙ্গে ফোটালে ভূর্জপত্রের রং হত কালো। তাতে হলুদ বা সবুজ কালি দিয়ে লিখলে পুথির বাহার খুলত। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এ জাতীয় ভূর্জপত্রের পুথি পছন্দ কবতেন। চিত্রিত ও রঙিন ভূর্জপত্রে লিখিত জৈন পুথি এই মতাবলম্বীদের শিল্পচেতনার বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। লম্বা টানা চোখ শরীব ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে; পাশ থেকে দেখলেও মূর্তির দুটি চোখ দেখা যায়, নাক, কনুই বেশ লম্বা ও ছুঁচোলো—মোটামুটিভাবে এটা জৈন পুথির চিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। উৎকর্ষে না হোক রঙের উজ্জ্বলতায় চিত্রিত জৈন পুথির ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধম্মপদ ছাড়া ভূর্জপত্রে লেখা আর যে প্রাচীন পুথি পাওয়া গেছে তাব মধ্যে আছে বাখশালি পুথি, বাওয়ার পুথি ইত্যাদি।

মনে রাখা দরকার মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর পশ্চিম ভারতে পুথিগুলির প্রায় সব খণ্ডিত ও নামহীন অবস্থায় পাওয়ায় সেগুলি বিষয়েব নামে পরিচিত না হয়ে প্রাপ্তিস্থান বা আবিষ্কর্তার নামে পরিচিত হয়েছে। যেমন, লেফ্‌টেন্যান্ট বাওয়ার কাশগড়েব কুচার থেকে ৫২ পাতায় অন্তত পাঁচটি বিষয়েব খণ্ডিত আলোচনার যে-পুথিটি আবিষ্কার করেন তারই নাম হয় বাওয়াব পুথি, গিলগিটে পাওয়া পুথির নাম দেওয়া হয় গিলগিট পুথি।

ভূর্জপত্রকে কখনো কখনো তালপাতার আকারে কেটে পুথি লেখা হয়েছে। তা ছাড়া ভূর্জপত্র ভারতে মেলে শুধু হিমালয় অঞ্চলে এবং বেশ কিছুটা উচ্চতায। তাই পুথি লেখার জনপ্রিয় ও সুলভ উপাদান ভূর্জপত্র হতে পারে না। এই ধরনের নানা কারণে মনে করা হয় যে, পুথি লেখার উপাদান হিসেবে তালপাতাই প্রথম ব্যবহৃত হয়। হিমালয় অঞ্চলে না হলেও তালপাতা জন্মায় ভারতের সর্বত্র। তা সহজলভ্য। বচয়িতা বা লিপিকর নিজেই তালপাতাকে লিখনযোগ্য করে তুলতে পারতেন। অর্থাৎ লেখনসামগ্রী যদি তালপাতা হয় তবে রচয়িতা বা লিপিকরকে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার থাকে না। তা ছাড়া folio বোঝাতে পত্র বা পাতা, অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বোঝাতে কাণ্ড বা পর্ব (সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব), বইয়ের প্রতিশব্দ গ্রন্থ তো প্রমাণ করে যে, পাতাই লেখার কাজে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

তালপাতার সবচেয়ে পুরোনো যে-পুথিটি আমাদের হাতে এসেছে তা তুরফান পুথি। চতুর্থ শতকে এটি লিখিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। দ্বিতীয় প্রাচীনতম পুথি হিসেবে পবিচিত হরিউজি পুথি। জাপানের হরিউজি মঠে আছে বলে তার এই নাম। এটির অনুলিখন কাল ধরা হয় ষষ্ঠ শতক, এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আহমেদ দানির মতে এটির কাল অষ্টম শতক। এই মত গৃহীত হলে দ্বিতীয় প্রাচীনতম তালপাতার পুথি হিসেবে স্বীকার করতে হয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে

রক্ষিত 'কুব্জিকামতম্' পুথিটিকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর কাল নির্ধারণ করেছেন সপ্তম শতক। সাধারণভাবে তালপাতার পুথি ক্ষণভঙ্গুর হলেও এই পুথিটি কিন্তু আজও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে।

তালপাতা দু-ধরনের—তাল আর তেরেট। তালপাতা পুরু, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেক কম, শিরা ওঠা, মাঝখান থেকে দু-ধার ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এই তাল 'খড় তাল' নামেও পরিচিত। বেশি ভঙ্গুর ও পচনশীল বলে খুব দামি পুথি এতে লিখিত হত না। বাংলার গ্রামে গ্রামে এই তালের গাছ যত্রতত্র দেখা যায়। সহজলভ্য বলে বাংলাদেশের পুথিতে এই তালের পাতা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং দেখা যায় যে, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো পুথিও ভেঙে ও পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে।

অন্যপক্ষে তেরেট বা শ্রীতালের পাতা তুলনায় লম্বা (৯০ সে.মি. পর্যন্ত) ও একটু বেশি চওড়া, অনেক বেশি নমনীয় এবং পাতার একেবারে প্রান্তের দিকটাই যা সরু হয়ে গেছে। ওড়িশা থেকে দক্ষিণ ভারত, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জাতীয় তালপাতার গাছই দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলে তালপাতার পুথিই বেশি, অন্য লেখার উপাদানে লিখিত পুথি খুবই কম। তা ছাড়া এই অঞ্চলের পুথি কালি বুলিয়ে লেখা হত না। লোহার শলাকা পুড়িয়ে পাতার ওপর বুলিয়ে দেওয়া হত। তার ওপর কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে মুছে নিলে লেখা ফুটে উঠত।

তালপাতাকে লিখনযোগ্য করে তোলার সহজ পন্থা ছিল পাতা গোছা বেঁধে পুকুরে পচিয়ে তুলে এনে গোছাসুদ্ধ জল ঝরিয়ে আলাদা আলাদা করে ছায়ায় শুকোনো। তার পর পাতার দু-দিক শাঁখ বা তেলাপাথর দিয়ে ঘষে মসৃণ করে মাপ অনুযায়ী কেটে নিলেই লেখার উপযুক্ত হত। কিন্তু এ পাতা মোটেই টেকসই হত না, তাই পুথি নষ্ট হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। পাতাগুলিকে আলাদা করে ছায়ায় অল্প শুকিয়ে গোবর জলে ফুটিয়ে ছায়ায় শুকোলে সে পাতায় পোকার আক্রমণ হত খুব কম। পাতাও টিকত অনেক বেশি কাল। পাতাকে আরও মজবুত ও মসৃণ করতে তার ওপর তেঁতুল বিচির ক্বাথ মাখানো হত, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতে লাগানো হত হরিতালের প্রলেপ।

পুথির কাগজ হিসেবে তাল বা তেরেটের ব্যবহারের প্রাচীনতা নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। তবে হুই লির লেখা য়ুয়ান চোয়াং-এর জীবনীতে যে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের অল্প পরে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে পিটকগুলি তালপাতায় লেখা হয়—এ তথ্যের সত্যতা আজও প্রমাণ করা যায়নি। অবশ্য দশম শতকে তাল ও ভূর্জপত্র যে সুপরিচিত লেখনসামগ্রী হয়ে ওঠে তার প্রমাণ কবি ও আলংকারিক রাজশেখরের লিখিত উপদেশ। তিনি কবিদের উদ্দেশে জানিয়েছেন লেখার উপকরণ হিসেবে হাতের কাছে তালপাতা বা ভূর্জপত্র মজুত রাখতে। লক্ষণীয়, কাগজের কথা তিনি বলেননি। বোঝা যায়, এ অঞ্চলে কাগজ তখনও লেখার উপকরণ হিসেবে সুপরিচিত হয়নি।

তালপাতার পুথির আকারের কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়বে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের ১২৩১ ও ১২৩০ নং পুথি দুটিব কথা। শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই দুটি পুথির আকার যথাক্রমে ৮৮ × ৬.৫ ও ৮৫ × ৫ সে.মি.। তালপাতার এই আকারের পুথি আর আছে কি না সন্দেহ। মহাভারত বা ভাগবতের পুথি দুটিও (নং ১২৩২, ১২৩৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। ৮৪ × ৫ বা ৮৩ × ৪ সে.মি. পুথি যে-কোনো পুথিশালায় বিরল। সবচেয়ে ছোটো পুথিটিও তালপাতায় লিখিত। তুলসি কাঠের জপমালার গুটির আকারে কাটা তালপাতার ছোটো ছোটো গুটিতে গীতার অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে মালা তৈরি করা পুথিটির সন্ধান মিলবে ভুবনেশ্বরে সরকারি সংগ্রহালয়ে।

যদি চিত্রিত তালপাতার পুথির প্রসঙ্গে আসা যায় তবে প্রথমেই মনে হওয়া স্বাভাবিক অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুথিগুলির কথা। ব্রায়ান হটন হজসন নেপালে অ্যাসিসট্যান্ট রেসিডেন্ট (১৮২৫-৩৩) ও রেসিডেন্ট (১৮৩৩-৪৩) থাকাকালে সেখান থেকে প্রচুর তালপাতার পুথি সংগ্রহ করেন। তাঁর বিশাল সংগ্রহ তিনি বিশ্বের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলিকে দান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করা ছিয়াশি বাণ্ডিল পুথির মধ্যে নালন্দা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুত পুথি যেমন ছিল তেমনই ছিল নেপালে প্রস্তুত নানা পুথিও। তার মধ্যে এ ১৫ পুথিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই প্রদর্শিত পথে নেপাল থেকে পরবর্তীকালে আরও বহু পুথি সংগৃহীত হয়েছে।

পাল আমলকে বাংলার সুবর্ণযুগ বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এই সময়ে বাংলার শিল্প ও ভাস্কর্য চরম উন্নতি লাভ করে। পাল যুগের ভাস্কর্যের নানা পরিচয় মিউজিয়ামগুলিতে পাওয়া গেলেও এ যুগের চিত্ররীতির পরিচয় পুথি ছাড়া অন্য কোথাও আজও পাওয়া যায়নি। এই চিত্ররীতির সবচেয়ে পুরোনো নিদর্শন পাওয়া যায় এশিয়াটিক সোসাইটির জি ৪৭১৩ নং পুথিটিতে (৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপাবমিতার এই পুথিটি শুধু পাল যুগের চিত্ররীতির প্রথম নিদর্শন নয়, অজন্তা-ইলোরার যে অনবদ্য চিত্রশৈলী গুপ্ত যুগের পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হত তারই বিবর্তিত রূপেব সন্ধান পাওয়া গেল পালরীতির চিত্রিত পুথিতে এবং এ বিষয়ের প্রথম পুথি জি ৪৭১৩ সংখ্যক পুথিটি। আর এই চিত্ররীতিরই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় এ ১৫ (১০৭৩ খ্রিস্টাব্দ) পুথিটিতে। তুর্কি আক্রমণে নালন্দা মহাবিহার ইত্যাদি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস হওয়ায় এখানকার কিছু পুথি এবং সেই পুথিব রূপকার কিছু শিল্পী নেপালে চলে যান। নেপালে গড়ে ওঠে পূর্ব ভারতীয় শিল্পরীতির একটি পীঠস্থান। নেপালের শুকনো ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুথিগুলি ধ্বংসের হাত থেকেও রক্ষা পায়। তা ছাড়া এই পুথিগুলির পাতায় যেমন কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই কালি বা রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেঁকো বিষ, আলতা ইত্যাদি কীটনিরোধক পদার্থ। ফলে বহু পরবর্তী কালের তালপাতার পুথি পোকায় নষ্ট হলেও এই পুথিগুলি আজও অক্ষত আছে। পাল যুগের চিত্রকলাকে বলা হয় ভারতীয় ধ্রুপদি চিত্ররীতির শেষ নিদর্শন। বিশ্বের বিভিন্ন পুথিশালায় ষাটটি চিত্রিত পুথি তার সাক্ষ্য বহন করছে। এর সাতটি আছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

হজসনই প্রথম নেপালে রক্ষিত পুথিগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিও কল্পনা করতে পারেননি যে, তাঁর সংগ্রহ ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়কে এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল পর্বকে এভাবে পুনরুদ্ধার করবে।

লেখার উপরকণ হিসেবে কাগজের ব্যবহার হয় সবশেষে। কিন্তু শেষে এসেও সে ধীরে ধীরে অন্য সব লিখন উপকরণকে বাতিল করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ছাপা বই বেরোনোর পরেও বেশ কিছুকাল গ্রন্থ, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় বিষয়ে, লেখা হয়েছে তালপাতায়। সংস্কার ও ঐতিহ্য কাগজকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তুকতাক, সাপের বিষঝাড়া ইত্যাদির মন্ত্র লিখিত হয়েছে তালপাতায়। আর কবচ ইত্যাদি লেখায় বটপাতা বা ভূর্জপাতার চলই বেশি।

পুথি লেখার কাজে ব্যবহৃত কাগজের নাম তুলট কাগজ। তুলা থেকে তুলট নামটা এসেছে বটে, কিন্তু তুলা থেকে সোজাসুজি তুলট কাগজ তৈরি হত না। তুলাজাত বস্তু, গুনচট, দড়ি, জাল, ও ন্যাকড়া ইত্যাদি অবশ্য কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে। যিনি তুলট কাগজ আবিষ্কার করেন বলে বলা হয়, চীনদেশীয় সেই তি সাই লুঁ আনুমানিক ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিসি বা শণ জাতীয় উদ্ভিদের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরি করেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সে ধারাই চলে এসেছে। তার পব এল কাগজের কল। বাঁশ, চারা গাছ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে তিসি ইত্যাদির গাছ থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতিকে নির্বাসনে পাঠাল।

তিসি, শণ ইত্যাদির গাছকে পাতাহীন করে তামাকপাতা কুচোনোর মতো কুচিয়ে রোদে শুকনো করা হত। তার পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শুকনো ছাল, পাতা ইত্যাদি থেকে টুকরোগুলোকে আলাদা করা হত। এর পর এগুলো গামছা বা জ্যালজেলে কাপড়ে বেঁধে নদী বা খালে ডুবিয়ে রাখা হত। এতে টুকরোগুলো পচে যেত আর বাকি আবর্জনা জোয়ার ভাটার টানে গামছার ফাঁক দিয়ে স্রোতে মিশে যেত। পুকুরে পচালে হাত দিয়ে কচলিয়ে আবর্জনা দূর করতে হত। পচা টুকরোগুলোকে বড়ো মাটির পাত্রে রেখে পা দিয়ে ঠাসা হত ও পরে ঢেঁকিতে ফেলে অর্ধমণ্ড তৈরি করা হত। তার পর সাজিমাটি ও চুন মিশিয়ে আবার ঢেঁকিতে কোটা হত। এই অর্ধমণ্ডকে রোদ ও হাওয়া লাগানোর জন্যে কাঠের পাটাতন বা ইটের রোয়াকের ওপর রাখা হত। কতদিন রাখতে হবে তা নির্ভর করত আর্দ্র জলবায়ুর ওপর। রোদ থাকলে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে মণ্ডকে ভালো করে পচাতে ও নরম করতে হত। নদীতে ফেলে বাকি আবর্জনা পরিষ্কারের পরে ঢেঁকিতে ফেলে ভালো করে মণ্ড তৈরির পদ্ধতি আবার অনুসরণ করার পর দরকারমতো জল মিশিয়ে ঘাস, বাঁশ বা শরের ছাঁকনিতে ছেঁকে নেওয়া হত। সেই পাতলা মণ্ডকে বিছিয়ে শুকিয়ে মাপমতো কেটে নিলেই পাওয়া যেত লেখার কাগজ। পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে কাগজে মাখানো হত হরিতাল, মসৃণ করতে লাগানো হত তেঁতুল বিচির ক্বাথ। ভাতের মাড় পোকা ও জলীয় বাষ্পকে

আকর্ষণ করে বলে এবং কিছুটা ধর্মীয় কারণেও ভাতের মাড় ব্যবহৃত হয়েছে কম। পোকার আক্রমণ থেকে পাতাকে বাঁচাতে সেঁকো বিষ (white arsenic), অভ্রের গুঁড়ো ইত্যাদিও ব্যবহৃত হত।

এই কষ্টসাধ্য পদ্ধতিতে কাগজ তৈরিতে সময় লাগত অন্তত দু-তিন মাস। পরবর্তীকালে তাই এই পদ্ধতিগুলোকেই আরও সহজ করে নেওয়া হয়েছিল। তাতে ফল হল এই, প্রাচীন কাগজ পুরু ও টেকসই, পরবর্তী কালের কাগজ পাতলা ও অ-টেকসই। নেপাল বা তিব্বতে তৈরি কাগজ অবশ্য চিরকালই পুরু ও টেকসই।

চীনে আবিষ্কৃত কাগজের প্রতি অন্য দেশের আকর্ষণ গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। অষ্টম শতকের গোড়ার দিকেই সমরখন্দ কাগজ তৈরির একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে আর হারুন অল রসিদের সময়ে, অর্থাৎ অষ্টম শতকের শেষদিকে, বাগদাদে কাগজের প্রচলন শুরু হয়ে যায়। চতুর্দশ শতকে ইউরোপের বহু জায়গায় কাগজ তৈরি হতে থাকে আর মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর কাগজের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে কাগজের কল গড়ে উঠতে থাকে। উইলিয়াম ক্যাক্সটন একাই ১৪৭৬-এর কাছাকাছি সময়ে পনেরো বছরে একশোটি বই ছাপেন।

কাগজ শব্দটি পারসিক। এসেছে নাকি চীনা 'কাগ্‌জ' শব্দ থেকে। অনেকে মনে করেন দশম শতকে গজনির সুলতান মামুদের উত্তর-পশ্চিম ভারত জয়ের পরেই এ দেশে কাগজের প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে তাঁর নৌসেনাপতি নিয়ারখস সিন্ধুপ্রদেশে যে beaten cloth-এর সন্ধান পান তা কি কাগজের পূর্বসূরি কোনো কিছু নয়? গিলগিট ও গডফ্রে পুথির কাল নির্ধারিত হয়েছে সপ্তম শতক এবং এই দুই পুথিই কাগজে লিখিত। তাহলে সপ্তম শতকের আগেই যে কাগজের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু পুথিতে সে কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা অবশ্য জানা যায় না। তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষদিক থেকে এ দেশে আরব থেকে কাগজ ও নথি আমদানি যে পর্যাপ্ত পরিমাণে হতে থাকে তার প্রমাণ আছে। জৈন ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে অগ্রণী হন। জৈন পুথিতেও কাগজ ও নীল রং ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পঞ্চদশ শতকে কাশ্মীরে গড়ে ওঠে কাগজ শিল্প। মোগল আমলে দেখা গেল ভারতে হাতে তৈরি কাগজের সুবর্ণ যুগ—আক্ষরিক অর্থেও। কারণ 'আফশানি' কাগজে মেশানো হত সোনার গুঁড়ো ও সুতোর মতো সোনার সূক্ষ্ম পাত। রাজকীয় সনদ লেখার কাজেই এ কাগজ বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদ তখন কাগজ শিল্পের জন্যে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। 'বাহাদুরখানি', 'মাধাগরি' ইত্যাদি নানা নামের দামি কাগজ সেখানে তৈরি হত। ষোড়শ শতকে বাংলায় যে কাগজ তৈরি হত মুকুন্দরামের কাব্যে তার পরিচয় আছে—'কাগজ কাটিয়া নাম ধরিল কাগতী'। মিলের কাগজের বহুল প্রচার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নানা গ্রামে কাগজ তৈরি ও ব্যাবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত একদল মানুষ—তাদের নাম ছিল 'কাগজি'। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি

শ্রীরামপুরে কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭-তে গড়ে ওঠে বালিতে কাগজ কল। এর ৩৮ বছর পরে সেই যন্ত্রপাতি নিয়ে টিটাগড়ে কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমস্ত উত্তর ভারতে কাগজই হয়ে উঠেছিল পুথি লেখার মুখ্য উপকরণ। চিত্রিত কাগজের পুথিতে বিশেষভাবে স্থান পায় বজ্রযানী সম্প্রদায়ের দেবদেবী, জৈন ধর্মগুরু, মোগল দরবার ও শিকার চিত্র এবং রাজপুত চিত্রকলা। হুমায়ুন তাঁর দরবারে পারস্য থেকে শিল্পী আনিয়েছিলেন। তাঁদের সাহায্যে আকবরের আমলে পারস্য ও ভারতের চিত্রশৈলীর মিশ্রণে পুথিচিত্র আঁকা হল। জাহাঙ্গিরও এর পৃষ্ঠপোষকতা করে গেলেন। এই চিত্রধারা ধ্বংস হল আওরঙ্গজেবের আমলে। তিনি পৃষ্ঠপোষকতা না করায় শিল্পীরা দিল্লি ছেড়ে চলে গেলেন রাজন্যবর্গের আশ্রয়ে—বিশেষভাবে রাজপুতানায়। সেখানে মোগল, ভারতীয় ধ্রুপদি চিত্ররীতি ও জৈন চিত্রশৈলীর সমন্বয়ে এক বিশিষ্ট চিত্ররীতি গড়ে উঠল। চিত্রিত পুথিগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। একটা মজার ব্যাপার, মোগল চিত্রকলার নমুনা সমৃদ্ধ 'শাহনামা' ইত্যাদি পুথি যত্নে নিজের লাইব্রেরিতে স্থান দিয়েছিলেন টিপু সুলতান। তার কিছু সংগ্রহ বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত হয়েছে। পুথিতে কাগজ ব্যবহারের প্রসঙ্গে নেপালি কাগজ ও তিব্বতের xylograph-এর কথা স্বাভাবিকভাবেই আসে। তিব্বতীরা তাদের যাবতীয় ধর্মীয় পুথিকে কাঞ্জুর (বুদ্ধবচন) ও তাঞ্জুর—এই দুইভাগে ভাগ করে সংকলিত করেছিল। পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর ছাপা শুরু হয় কাঠের ব্লক তৈরি করে। নারথাং, দ্যাগে ইত্যাদি মঠ থেকে ছাপা হয়ে সেগুলি বইয়ের মতোই বিক্রি হয়েছে।

অসমে পুথি লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সাঁচিপাত বা অগুরু গাছের ছাল। মূল্যবান পুথি ও রাজকীয় তথ্য সাঁচিপাতে লিখিত হত। কবে থেকে পুথি লেখার কাজে সাঁচিপাত ব্যবহৃত হয়েছে সঠিক জানা যায় না বটে, তবে বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত'-এ এ ব্যাপারে একটি তথ্য পাওয়া যায়। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা তাঁর মিত্র হর্ষবর্ধনকে নাকি সাঁচিপাতের একগুচ্ছ পুথি উপহার দিয়েছিলেন: অগুরুবল্কলকল্পিত-সঞ্চয়ানি চ সুভাষিতাস্মি পুস্তকানি পরিণত পাটলপটোলত্বিংষি। হলদে পাতার ওপর পাকা শশার লালচে রস দিয়ে লেখায় পুথির রূপ খুলেছিল সন্দেহ নেই।

কালি নিয়ে বৈচিত্র্যসৃষ্টি অবশ্য পূর্ব ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। অসমের অহোম রাজারা রাজকীয় সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন 'বুরঞ্জী' নামে ধারাবাহিক ইতিহাসে। এই উদ্দেশ্যে প্রাসাদের কয়েকটি ঘর জুড়ে থাকত পুথিশালা—'গান্ধিয়া বড়ুয়া' উপাধিধারী লিপিকরেরা হতেন তার তত্ত্বাবধায়ক। অহোমরাজ সুখম্ফা খোরাকে (১৫৫২-১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ) কোচবিহাররাজ এমন এক চিঠি লিখেছিলেন যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না কালি দৃশ্য না হওয়ায়। বিব্রত ও লজ্জিত সুখম্ফা শেষে ঘোষণা করেন, যিনি এই চিঠি পড়তে পারবেন তাঁর পদোন্নতি হবে। দুর্গাচরণ বরকেথ চিঠিটি পড়ে দিয়ে পুরস্কার ও 'মানিকচন্দ্র' উপাধি পান। আসলে কেঁচোর রসে লেখা ছিল বলে দিনে চিঠিটা পড়া যায়নি, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তার লেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ভারতে তালপাতা ছাড়াও পুথি লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাঁশ ও মোটা কাপড়। বাঁশকে চিরে ছোটো ছোটো করে কেটে ওপরের দিকটা মসৃণ করে পুথি লেখা হত। এর্নাকুলমে এই জাতীয় পুথির নিদর্শন আছে। আর মোটা খাটো কাপড় বুনে কলপ লাগিয়ে মসৃণ করে পুথি লেখা হত। এই কাপড়কে বলা হয় 'কোডাটা'।

কালির ব্যবহারেও যত্ন কম ছিল না। প্রাচীন পুথিতে রং হিসেবে ব্যবহৃত হত উদ্ভিজ্জ, খনিজ ও শিলাজাত বস্তু। সাদা রং হিসেবে ব্যবহৃত হত শাঁখ, শামুক গুঁড়ো ও সাদা মাটি, হলুদ হিসেবে হরিতাল (বর্গী), গেরুয়া হিসেবে গিরিমাটি, লাল হিসেবে আলতা, গালা, লাল সিসা, নীল গাছ থেকে মিলত নীল রং, কালো রঙের আকর ছিল খুদ পোড়ার গুঁড়ো, হাঁড়ির নীচের কালি বা কাঠকয়লার গুঁড়ো। কালো কালিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে কলার কষ, বট, আকন্দ, গাবের আঠা, জাম গাছের ছাল, ইত্যাদির সঙ্গে সিদ্ধ করা হত। পরবর্তীকালে কালি তৈরিতেও সহজ পন্থা কাজে লাগানোয় কালি হত হালকা। সেইজন্যে পুথির বেলায় বলা হয়, কাগজ যত পুরু, কালি যত উজ্জ্বল, পুথি তত পুরোনো। হালকা কালি, পাতলা কাগজ অপেক্ষাকৃত নবীন পুথির লক্ষণ।

বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে। বাংলায় প্রথম সাহিত্য চর্যাপদ রচিত হয়েছে ওই একই সময়ে। কিন্তু তার যে-পুথিটি আমাদের হাতে এসেছে তা অনুলিখিত হয় সম্ভবত চতুর্দশ শতকে এবং তালপাতায়। পরবর্তী নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পঞ্চদশ শতকে রচিত হলেও পুথিটি ষোড়শ শতকের আগের নয়। এর কাগজে বা কালিতে প্রাচীনত্বের ছাপ কম। প্রাপ্ত অধিকাংশ বাংলা পুথিই সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকে অনুলিখিত। মূল পুথির সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তবে মধ্যযুগের বাংলা পুথি হিসেবে বৈষ্ণব পুথিগুলি যত্ন ও অলংকৃত পাটার জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি করে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলা পুথি সংগ্রহ শুরু হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। তখন পুথির মূল পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রক্ষেপের আড়ালে চলে গেছে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে প্রথম দিকে ছাপা বইতে আবার এই প্রক্ষেপকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে বেশি।

পুরোপুরি বাংলা ভাষায় ছাপা প্রথম বই *মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত* প্রকাশিত হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। তাহলে দশম শতকে যে-ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা তার প্রথম ছাপা বই দেখা দিল উনিশ শতকের গোড়ায়। সে ক্ষেত্রে ছাপা বইয়ের দুশো বছর বাদ দিলে পুথির কাল দাঁড়ায় আটশো বছর।

বিশ্ব, ভারত বা বাংলা—যারই ইতিহাস খোঁজা যাক দেখা যাবে পুথির কালটা বিশাল লম্বা, তুলনায় ছাপার কাল প্রায় নগণ্য। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল—বিদ্যার যে-শাখাই ধরা যাক পুথিতে ধরা আছে তার দীর্ঘকালীন চর্চার পরিচয়। ভারতবাসীর কাছে পুথির দাম আরও বেশি। কারণ, এই ইতিহাসবিমুখ জাতির ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে নির্ভর করতে হয়েছে বিদেশি পর্যটকের বিবরণ, শিলালেখ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, তাম্রলিপি, এবং বিশেষভাবে পুথির ওপর। এটা কিছুটা অবাক

হওয়ার ব্যাপার যে, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চায় যাঁরা এত মনোযোগী ছিলেন তাঁরাই ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখায় এতটা উদাসীন! তাই কোন বই কবে রচিত হতে পারে তার আনুমানিক সময় নির্ধারণ করতে নির্ভর করতে হয়েছে পরোক্ষ প্রমাণ ও অনুমানের ওপর। ধারাবাহিক ইতিহাসের অপূর্ণতার কথা বাদ দিলে অবশ্য ভারতীয় পুথি আমাদের জন্যে জ্ঞানের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রেখেছে তাতে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি। কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পদ্ধতিটা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে।

পুথিশালাগুলি এখন অযত্নলালিত বৃদ্ধাশ্রমের মতো। ঘর আছে, নেই পরিচ্ছন্নতা। যেখানে বাইরের চাকচিক্য আছে, সেখানেও নেই পুথির প্রতি প্রয়োজনীয় যত্নের ন্যূনতম ব্যবস্থা। শেলফে বা আলমারিতে তোলা বইয়ের পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহরা একটু মুক্ত বায়ুর জন্যে মুখ বুজে পড়ে আছে—সেটুকু দেবারও লোক নেই। কারও শরীরে ভরতি নানা কীট—দেখার কেউ নেই। অথচ একটা কথা তো ভুললে চলবে না। একটা বইয়ের একটা সংস্করণ অবিকল একই রকম। কোনোভাবে একটা বই পেলেই চলে। কিন্তু একটি পুথি মানেই সেই বিষয়ের একটি সংস্করণ। কারণ কখনও দুটি পুথি পুরোপুরি একই রকম হয় না। প্রত্যেকটিরই আছে স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্টতা—ন্যূনতমভাবে পুষ্পিকার ভাষায়, যাতে থাকে আঞ্চলিকতার পরিচয়। তা ছাড়া সব পুথি ঘেঁটে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ আজও হয়নি। সে কাজে যদি আমাদের কোনো আগ্রহ না-ও থাকে তাহলে পরবর্তী কোনো প্রজন্ম যদি এ বিষয়ে আগ্রহী হয়, অন্তত সেই আশাতেই তো পুথিগুলিকে টিকিয়ে রাখা একান্ত দরকার।

শিক্ষা ও আধুনিকতার পাঠ

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা ও সাদা বালক

এটা নিশ্চয় কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, এক বিক্ষোভের পর্বে, আঠারো শতকের শেষদিকে একের পর এক ধর্মীয় সমিতি গজিয়ে ওঠে ইংল্যান্ডে: 'দি লন্ডন মিশনারি সোসাইটি', 'দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি', 'দি রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি' ও 'ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি'। 'দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিসটিয়ান নলেজ' এরও একশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় সমিতির পর, বছর কয়েকের মধ্যে দুটি শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়: 'দি ন্যাশনাল সোসাইটি ফর প্রোমোটিং দি এডুকেশন অফ দি পুওর ইন দি প্রিন্সিপলস্ অফ দি এস্টাব্লিশড্ চার্চ থ্রুআউট ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস' এবং 'দি নন-কনফরমিস্ট ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি'। বিভিন্ন সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট ছিল। মূল লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও তাদের কর্মপন্থা অবশ্য বার বার বদলে গেছে; যেমন-যেমন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তেমন-তেমন পালটে গেছে তাদের প্রকৌশল।

১৮১৯ সালে 'দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং ক্রিসটিয়ান নলেজ'-এর আনুকূল্যে গঠিত হয় 'অ্যান্টি-ইনফাইডেল কমিটি': কমিটির নিজস্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'লন্ডন তথা উত্তর-ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শিল্পনগরীতে যে বিপজ্জনক শ্রমিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে তা ঠেকানোই তার উদ্দেশ্য'। ১৮২৩ সালে কমিটি জানায় যে, ইতিমধ্যে 'ছ-লাখ সাতাত্তর হাজার চারশো একানব্বইটি বই বিক্রি হয়েছে, এবং সমস্যা আর ততটা গুরুতর নেই'। কিন্তু ১৮৩২ সালের গণ-বিক্ষোভের পর সমিতিকে আবার নতুন করে ভাবতে হয়: নতুন পদক্ষেপ হিসেবে স্থাপিত হয় 'জেনারেল লিটারেচার কমিটি'। 'জেনারেল লিটারেচার কমিটি'-র উদ্যোগে প্রকাশিত বহু গল্পের শিরোনামের পাশে লেখা থাকত এই দুটি শব্দ: 'ভৃত্যদের জন্য'। ঘরের ধর্মবিরোধীদের সামাল দিতে যেমন, তেমনই বাইরের বিধর্মীদের জন্যেও বরাদ্দ হয়েছিল একই ব্যবস্থা।

১৮৫৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর 'দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি'র বৈঠকে এক গুরুতর প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সাহেবদের মতে যা ছিল নিছক সেপাইদের বিদ্রোহ, ভারতবর্ষের সেই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শাসক সম্প্রদায়কে কতখানি বিচলিত করে দিয়েছিল তার এক নিদর্শন সভার কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া যাবে। ভারতের সাধারণ

লোকেরাও কি খেপে উঠে সেপাইদের সঙ্গে যোগ দেবে, না কি আগের মতো বিশ্বস্ত, *নিদেনপক্ষে* নিষ্ক্রিয় থেকে যাবে—এটাই ছিল সেদিনের আলোচনার বিষয়। সে আলোচনার ফল কী দাঁড়িয়েছিল, সমিতির সদস্যেরা কোন মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন, তা-ও সভার নথিপত্র থেকে জানা যাবে। তাঁরা রায় দিয়েছিলেন, বিভিন্ন প্রটেস্টান্ট মিশনারি সমিতি ও তাদের সমর্থকেরা যদি হাত না মেলায়, উপনিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে যে ব্যাপক অশিক্ষা রয়েছে তা দূর করবার ব্রত নিয়ে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, তাহলে এতদিনের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে, হাত থেকে বেরিয়ে যাবে সাধের ভারতবর্ষ। এই আশঙ্কা থেকেই জন্ম নেয় 'ক্রিসটিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'। তাদের মনোমতো ছাঁদে দেশের ও উপনিবেশের নিম্নবর্গীয়দের ঢালাই করে নেবার পবিত্র কাজে অন্য সমিতিগুলোও অবশ্য খুব একটা পিছিয়ে ছিল না।

'রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে পঁয়তিরিশ লাখ পুস্তিকা ছাপিয়েছিল। ১৮১৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে তার একশো চব্বিশটি শাখা ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২০ সালে মুদ্রিত, সমিতির 'ছোটোদের জন্য' প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় পাওয়া যাবে জন বানিয়ানের *পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস*-এর নাম। সমিতির কর্তৃপক্ষ যে *পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস*-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কেননা, শেষ পর্যন্ত বইটি অনূদিত হয়, একটি-দুটি নয়, মোট একশো সাতচল্লিশটি ভাষায়। বিভিন্ন ধর্মীয় সোসাইটির প্রচারপুস্তিকায় থাকত ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাহিনি; সেইসঙ্গে ঈশ্বর ও সিজারকে যথোচিত মান্যতা সহ কড়ায়-গন্ডায় পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার পরামর্শ। কেবল দেশে নয়, বিভিন্ন উপনিবেশেও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পূণ্য ব্রত নিয়েছিল 'রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি'। ১৮৭৮ সালে সমিতির পক্ষ থেকে সগৌরবে জানানো হয় যে, 'তাদের সত্যের দূতেরা বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে'। অনেকদিন পর্যন্ত ওই প্রচারকার্য ভালোমতো চললেও উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বেশ বোঝা যায় যে, পুরোনো আপ্তবচনে আর তেমন কাজ হবে না; প্রয়োজন অন্য জাতের 'সত্যের দূত'। ঘরে-বাইরে চারদিকে বিপত্তি এবং এক পরিব্যাপ্ত 'নৈবাজ্যে'-র কবলে পড়ে সবকিছু ছারখার হয়ে যেতে পারে।

নতুন পরিস্থিতির সামাল দিতে উনিশ শতকের সাতের দশকে সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিবর্তিত হয়। আর যেন তাল মিলিয়ে ইংল্যান্ডের শিক্ষানীতি ও ছোটোদের জন্য রচিত সাহিত্যেরও দিকবদল হয়: ১৮৭০ সালে চালু হয় নতুন 'এডুকেশন অ্যাক্ট', ছোটোদের জন্য বই ও পত্রিকা প্রকাশের ধুম পড়ে যায়, ১৮৭৯ সালে 'রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি' বের করে *বয়েজ ওন পেপার* (১৮৭৯-১৯৬৭)। ১৮৮০ সালের মাঝামাঝি পত্রিকাটির কাটতি দশ লাখ ছাড়িয়ে যায়।[১]

প্রায় একশো বছর ধরে নানাভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তুতি করে এসেছে *বয়েজ ওন পেপার*; বিভিন্ন মোড়কে ছোটোদের হাতে তুলে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের মিশেল এক কড়া আরক। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে *বয়েজ ওন*

পেপার একটি সভার আয়োজন করে; সেই সভায় আলোচনার বিষয় ছিল 'সত্যকারের সাম্রাজ্যবাদ কাকে বলে?'। মূল বক্তৃতাটি দেন, 'রিলিজিয়াস ট্র্যাক্ট সোসাইটি'-র এক কর্মকর্তা। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'অখ্রিস্টানদের আত্মার সদ্গতি'-র ব্যবস্থা করাই সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইজরায়েল-এর প্রাচীন রাজ্যের উত্তরসূরি। ব্রিটিশ সরকারকে 'বিশ্বের কোণে-কোণে মুক্তির বাণী' ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান বক্তা। নতুন প্রয়োজনের তাগিদে সে যুগের ইংরেজি কিশোর সাহিত্যের এক বড়ো অংশে দেখা দিয়েছিল এক সাজবদল: মোদ্দা বার্তাটি মোটামুটি এক থাকলেও মিশনারিদের আলখাল্লা ছেড়ে নব্যবার্তা-বাহকেরা তাদের ভোল পালটে নেয়; *বয়েজ ওন পেপার*-এর ক্রমবিবর্তনের মধ্যে তার পবিচয় আছে। তার মানে এই নয় যে, সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়; বিশ শতকের চার-এর দশকেও প্রকাশিত হয়েছে 'জাঙ্গল ডক্টর' সিরিজের গল্প: পটভূমি আফ্রিকা; বক্তব্য খ্রিস্টের অপার করুণা ছাড়া অধঃপতিত কালোদের মুক্তি নেই। শুধু গল্পগুলো নয়, লেখকের নামটাও জানান দিচ্ছে সেই মহৎ অভিপ্রায়: পল হোয়াইট।

'প্রাজ্ঞ শিক্ষণীয়তা' ও বাংলা শিশুসাহিত্য

উপনিবেশের শিশুতুল্য বাসিন্দাদের মনে 'প্রাজ্ঞ শিক্ষণীয়তা'-র মতো সদ্‌গুণ বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্যের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সে কথা বুঝতে মিশনারি সাহেবদের অন্তত অসুবিধে হয়নি। উনিশ শতকের গোড়ায়, ১৮১৮ সালে, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার প্রথম কিশোর পত্রিকা: *দিগদর্শন*। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উইলিয়াম কেরি (ক্যারি)। কেরির নীতিশিক্ষার ধরনটা কীরকম ছিল তার কিছুটা আভাস তাঁর *ইতিহাসমালা*-র এই সতর্কোচ্চারণটি থেকে পাওয়া যাবে: 'অতএব কহি সকলে শ্রবণ কর যদি কোন অধম বংশজাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়াও কৃতবিদ্য হয় তথাও তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রকাশ পায় না।' *দিগদর্শন*-এর নামপত্রে লেখা থাকত: 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ।' পত্রিকাটির সঙ্গে, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

দিগদর্শন প্রকাশের এক বছর আগে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বছরে, স্থাপিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'। সোসাইটি গঠনের সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল ১৮১৭ সনের ৬ মে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এক বৈঠকে। সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব; তারিণীচরণ মিত্র ও মৌলবি কারাম হুসেন ছিলেন 'নেটিভ সেক্রেটারি'। সমিতির কাজ ছিল: 'Preparation, publication, and cheap or gratuitous supply of works useful in schools and seminaries of learning in English and Oriental languages, but not to furnish reli-

gious books.'[২] 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হবার কয়েক মাস পর, ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর, টাউন হলে আয়োজিত এক সভায় 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এই সমিতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ডেভিড হেয়ার; ১৮২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সমিতির শেষ দিন, অর্থাৎ ১৮৩৫, পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'স্কুল সোসাইটি'র ইয়োরোপীয় সচিব। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, *আলালের ঘরের দুলাল*-খ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষায় 'স্কুল সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটি যমজ ভ্রাতার ন্যায় ছিল'।[৩] 'স্কুল বুক সোসাইটির'-র উদ্যোগে ১৮২২ সালে বেরোয় বাংলা ভাষার দ্বিতীয় কিশোর পত্রিকা: *পশ্বাবলী*।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী ১৮১৩ থেকে ১৮৩০, এই ক-বছরে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির জন্যে যথাক্রমে মোট ২,৬৫,৮৪৭ টাকা, ১৮,৪০০ টাকা ও ৬৯,৪৩৩ টাকা শিক্ষা বাবদ ব্যয় করা হয়।[৪] এর মধ্যে ১৮২৫ সনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়, এক লাফে গিয়ে পৌঁছোয় ৫৭,১২২ টাকায়। সেই বছর বম্বে প্রেসিডেন্সির জোটে ৮৯৬১ টাকা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সাকুল্যে ৪৮০ টাকা। ওই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির একটা কারণ, সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়ে ১৮২৩ সনে স্কুল বুক সোসাইটি যে-দরখাস্ত করেছিলেন তা মঞ্জুর হয় ১৮২৫ সালের ৯ মার্চ: বাৎসরিক ছ-হাজার টাকা অনুমোদন করেন কম্পানির পরিচালক সমিতি।[৫] সুতরাং স্কুল বুক সোসাইটি যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই, ১৯২৮-৯-এর সপ্তম রিপোর্টে সানন্দে জানাবে—'In this language (বাংলা) the society's labours have been most productive and it now posesses publications on almost every subject of elemenatry instruction'[৬]—তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ১৮৩০ সালে সমিতির সদস্যপদে বৃত হন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ওই বছরের রিপোর্টে, অর্থাৎ অষ্টম রিপোর্টে, সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়: '(We) desire to afford books, the perusal of which may be the means of advance in the scale of civilisation of all the inhabitants of the British territories in India.'[৭] কিন্তু কোন্ পদ্ধতি ধরে এগোলে কার্যসিদ্ধি হবে? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে অষ্টম রিপোর্টে জানানো হয়: 'that while the society pursues a noble object, it pursues it by a method which is possible to all, whether English, Mussulmans, or Hindus. It insults no opinions, it attacks no religious prejudices, but seeks only to impart general knowledge leaving that to work its own way.'[৮] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপ্তম রেগুলেশান, 'হপ্তাম'-এর বিধি প্রণয়ন করে যিনি প্রশাসনিক কুশলতার এক অমর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন,[৯] সেই হোল্ট ম্যাকেন্‌জি স্কুল বুক সোসাইটির এক বার্ষিক অধিবেশনে বলেছিলেন: লোকে যত বাংলার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, তত উৎসভাষা, অর্থাৎ ইংরেজি সম্পর্কে তাদের কৌতূহল বাড়বে; প্রাদেশিক

ভাষাকে উপলক্ষ করে ভারতীয়দের ইংরেজির কূলে পৌঁছিয়ে দেওয়াই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।[১০]

১৮২০ সালে 'লোকেদের হিত প্রবোধের জন্যে' স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশ করে *হিতোপদেশ*। 'শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরান্তর্গত পাঠশালা নিবন্ধকর্ত্তারদের কর্তৃক সংগৃহীত' সেই বই 'মো. শ্রীরামপুরে'র ছাপাখানা থেকে বের হয়। সংকলনের ভূমিকায় জানানো হয়: 'স্কুল বুক সোসাইটি নিযুক্ত হইল, কলিকাতার শ্রী শ্রীযুত বড়সাহেব ও তাঁহার পত্নী ও কলিকাতার ভাগ্যবান অনেক ইংলণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালী ভাগ্যবান লোক এই সোসায়িটির সাহায্য করিয়াছেন...এই সম্প্রদায় বাঙ্গালি লোকদের শিক্ষার্থে অনেক আনুকূল্য করিতেছেন, এই দেশের বিদ্যা সাহায্যের জন্য ইংলণ্ডীয় ও বাঙ্গালী লোক মিলিয়া যে আয়োজন করিতেছেন তাহা মনে উদিত হইলে অত্যন্ত আমোদ জন্মে, ইংলণ্ডীয় ও বাঙ্গালী লোকেদের জ্ঞান ও পরামর্শ ও উৎসাহ এই কর্ম্মের কারণ সম্মিলিত হইয়াছে; ইহাতে অনুভব হয় এতদ্দেশের কিরূপ সৌভাগ্য উপস্থিত।'[১১] দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অবস্থা-নির্ণয়ের জন্যে গঠিত এক সরকারি কমিটির সদস্য ছিলেন রামকমল সেন; অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ট্রেভেলিয়ান ও সাদারল্যান্ড। রামকমল সেন স্বাক্ষরিত রিপোর্টটি শেষ হয়েছিল এক আকুল জিজ্ঞাসা দিয়ে: এ দেশের বাসিন্দাদের কায়িক বা নৈতিক এমন কোন অসদ্ভাব আছে যার জন্যে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড বা ওয়েলস-এর অধিবাসীদের মতো তারা ইংরেজিতে দক্ষ ও সাবলীল হয়ে উঠতে পারবে না?[১২] তবে কেবল ক্ষমতা থাকলেই হয় না, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতেও জানা চাই—প্রাজ্ঞজনদের হিতবচনে কান দিলে তবেই না মাথা খুলবে, পূর্ণ হবে মনস্কামনা। লোকের হিত প্রবোধের জন্যে রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরস্থ ধর্মপ্রচারকদের সংগৃহীত হিতকথার কয়েকটি নিদর্শন: 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয় যে আপন শক্তি ও ক্ষমতার অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম না করে'; 'রাজা যদি আপন অবস্থায় থাকিয়া প্রজারদিগের সহিত সদ্ব্যবহার ও প্রেম দ্বারা তাহারদিগকে বাধ্য না করেন আর ভাল করিবার ক্ষমতা থাকিতে পরোপকার ও দয়া প্রকাশ না করেন তবে তাহার সে ক্ষমতা যায়'; 'ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ রাখিয়াছেন সে সেইরূপ থাকুক'।[১৩] কোন কৌশলে যে সুকুমারমতি বালকদের পক্ষে সোপান বেয়ে বেয়ে 'সভ্যতার' শীর্ষ স্পর্শ করা সম্ভব হবে, তার সুলুকসন্ধান বাতলে দেয়া হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটির *নীতিকথা* (১ম ভাগ: ১৮১৮) বইটিতে। বইটি লিখেছিলেন তিনজনে: রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও রামকমল সেন। *নীতিকথা* তৃতীয় ভাগের একটি গল্প: 'বিদ্যা যত্ন করিলে পাওয়া যায় ও সাধিলে সিদ্ধ হয়। এক বালক বিদ্যাভ্যাসে যত্ন না করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে কালক্ষেপণ করিত এবং সুশিক্ষায় ও হিতবাক্যে অবহেলা করিয়া কুপথে ভ্রমণ করিত। পরে যৌবনাবস্থায় অন্নবস্ত্রের অভাবে অধিক দুঃখ পাওয়াতে সে মাসে মাসে দুই টাকা মাহিনাতে কর্ম্ম করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে বড় ক্লেশবোধ হইল, সেহেতু তাহার এক বন্ধুর নিকট যাইয়া কাতরোক্তিতে জিজ্ঞাসা করিল, হে ভাই, তুমি কিরূপে সাহেব লোকের কর্ম্ম

করিয়া প্রতি মাসে দশেরও অধিক টাকা পাইতেছ, কিন্তু আমি সমস্ত দিন কার্য্যে মগ্ন থাকিয়া....।'[১৪] গল্পটির নাম: 'বিদ্বান ও মুর্খের বিষয়'। হিতোপদেশটির সারকথা: 'সুশিক্ষিত' হওয়া ও সাহেবদের দপ্তরে চাকরি পাওয়ার মধ্যে আছে পারস্পরিক সম্পর্ক; ওই চাকরি পেলেই পরমার্থ লাভ হয় বাঙালির; এর চেয়ে বেশি উচ্চাভিলাষী হলে, আরও আরোহনের আকাঙ্ক্ষা থাকলে, পতন অবশ্যম্ভাবী।

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে খ্রিস্টীয় সদাচারের মিশেল ঘটলে তো আর কথাই নেই। সদাচারের সেই আদর্শকে পরিস্ফুট করে তুলতে ১৮২১ সালে বেরোয় জন বানিয়ান-এর *পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস*-এর বাংলা অনুবাদ, *যাত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ*; তরজমা করেছিলেন ফেলিক্স কেরি (ক্যারি)। ১৮৩৬ সালে, 'ক্রিসটিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি' খ্রিস্টমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে *সদাচারদীপক* নামে একটি নীতিগ্রন্থ প্রকাশ করে; বইটি অতীব জনপ্রিয় হয়। তবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে 'ইংরেজি শিক্ষা'-র ক্রমবিকাশ ও 'সভ্যতা'-র প্রসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগটিকে 'স্কুল বুক সোসাইটি যুগ' আখ্যা দিলে খুব একটা ভুল হয় না।

স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ছ-বছর পরে ১৮২৩ সালে কলকাতায় এক অন্য ধাঁচের সমিতি স্থাপিত হয়—'গৌড়ীয় সমাজ'; প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল দেশীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অনুশীলন। একেবারে গোড়া থেকে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের একটি সংশ্লেষ তৈরি হয়ে উঠছিল সেটা মনে রাখবার মতো বিষয়। সেই 'সমন্বয়' রচনার আপ্রাণ চেষ্টায় অনেকে অদ্ভুত কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন। তার একটি উদাহরণ: *ক্যালকাটা গেজেট*-এর ১৮৩১ সালের ১৩ জুনের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার নিমিত্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির কর্নেল সদ্যপ্রয়াত জোসেফ বোডেন তাঁর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে গেছেন; উদ্দেশ্য, হিন্দু দর্শনের খণ্ডন ও সেই সূত্রে খ্রিস্টধর্মের প্রচার।[১৫] গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি স্থাপিত হয় 'ট্র্যাক্ট সোসাইটি', 'ক্রিসটিয়ান নলেজ সোসাইটি', ও 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। এর কয়েক বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গ ভাষানুবাদক সমাজ: 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি', কমিটিতে তিনজন মাত্র বাঙালি সদস্য ছিলেন—জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদক সমাজের উদ্দেশ্য ছিল: 'ট্র্যাক্ট সোসাইটি কিম্বা খ্রিস্টান নলেজ সোসাইটি কি ইস্কুল বুক সোসাইটি কিম্বা এশিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার নিয়মমতে সর্ব্ব-সাধারণের পাঠ্য উত্তম২ যে সকল পুস্তক করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটি প্রকাশ করিবেন'।[১৬] প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল 'গার্হস্থ্য বাঙলা পুস্তক সংগ্রহ—বেঙ্গলি ফ্যামিলি লাইব্রেরি'। 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'-র প্রথম প্রকাশিত বই (আনুমানিক ১৮৫২-৩) *রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। ভারতীয় ম্যান ফ্রাইডেদের কথা ভেবেই বোধ হয় উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন আর এক রবিনসন, রেভারেন্ড জন রবিনসন। *রবিনসন*

ক্রুসো-র অনুবাদের প্রথম সংস্করণ অবশ্য নিছক অনুবাদ ছিল না। পাঠকেরা পাছে সাংস্কৃতিক দূরত্বের ফলে মূল পাঠের ভাব ও অনুষঙ্গ ধরতে না পারে, সেই জন্য স্থান-কাল-পাত্র বদলে কাহিনিটিকে যুক্ত করা হয় পরিচিত আবহের সঙ্গে, সাজিয়ে নেওয়া হয় দেশীয় প্রচ্ছদে: রবিনসন ক্রুসো পরিণত হন কলকাতানিবাসী আর্মেনীয় বণিকে, জাহাজডুবির পর সে আশ্রয় পায় পূর্বদ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে। রবিনসন-কৃত রবিনসনের ওই রূপান্তর যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও চতুর্থ সংস্করণে ক্রুসো ফিরে পান তাঁর নাম-ধাম, অধিষ্ঠিত হন স্বমহিমায়।[১৭] বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের পরিচালকদের হয়তো তখন মনে হয়েছিল, তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় অনেকখানি কমিয়ে আনা গেছে ইংরেজ ও বাঙালির 'সাংস্কৃতিক দূরত্ব', মূলের স্বাদ গ্রহণ করবার মতো ক্ষমতা জন্মেছে বঙ্গীয় পাঠকের। অনুবাদগ্রন্থ ছাড়াও সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থে' মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান* ও অন্যান্য বই।

১৮৫৪ সালে 'ক্যালকাটা ক্রিসটিয়ান বুক সোসাইটি' বের করে *বঙ্গীয় পাঠাবলী*। বইয়ের গোড়াতে পাঠকের প্রতি উপদেশ ছিল: 'হে পাঠক, তুমি পাপি ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যত দোষ হয় সেই সকল দোষ হইতে এবং অন্তঃকরণস্থ দুষ্টতা হইতে তোমার মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থে পাপ এবং মুক্তি বিষয়ক বিশেষতঃ মনুষ্যের যে যীশুখৃষ্ট তাঁহার দয়া বিষয়ক অনেক কথা লিখিত হইয়াছে'।[১৮]

শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়

১৮৪৯-এ প্রকাশিত হয় এক নতুন স্বাদের বই: মদনমোহন তর্কালংকারের *শিশুশিক্ষা* (১ম ভাগ); অল্প সময়ের ব্যবধানে আরও দুটি ভাগ লেখেন মদনমোহন। সহজ ভঙ্গিতে লেখা *শিশুশিক্ষা*-র সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটি ও মিশনারি পাদ্রিদের নীরস বইগুলোর কোনো তুলনাই চলে না। মদনমোহন ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক, ড্রিংকওয়াটার বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয়ের (প্রতিষ্ঠা: ১৮৪৯) সোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। প্রধানত মেয়েদের শিক্ষাদানের তাগিদ থেকেই *শিশুশিক্ষা*-র রচনা। বেথুনকে উৎসর্গীকৃত *শিশুশিক্ষা*-র প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে মদনমোহন লিখেছিলেন: 'অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।'[১৯] কেবল বেথুনের সহযোগী নন, মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহাধ্যায়ী ও সহকর্মী। চার বছরেরও বেশি সংস্কৃত কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন ১৮৪৭-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'সংস্কৃত যন্ত্র'। তাঁদের বন্ধুত্ব অবশ্য চিরকাল অটুট থাকেনি; প্রথমে মতান্তর পরে মনান্তর—একে অপরের থেকে সরে যান দুজনে। মদনমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর জামাই

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ *শিশুশিক্ষা* উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের ওপর পরস্বাপহরণের অভিযোগ আনলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিদ্যাসাগর লেখেন *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস*। নিষ্কৃতিলাভের সে প্রয়াস কতখানি সফল হয়েছিল বলা শক্ত, তবে মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা* ও বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, যে-কোনো ঐতিহাসিক বা সমালোচকের পক্ষে সে বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া বেশ দুষ্কর। *বর্ণপরিচয়*-এর অভাবিত সাফল্যের পেছনে *শিশুশিক্ষা*-র কম অবদান ছিল না।

অনেকদিন পর্যন্ত, *শিশুশিক্ষা* ২য় ভাগ-এর কিছু অংশ স্থান পেয়েছে *বর্ণপরিচয়* ২য় ভাগ-এ। *বর্ণপরিচয়* ২য় ভাগ-এর ৬২তম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর জানান: '...পুস্তকের শেষভাগে, শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।'[২০] উলটো দিকে, *শিশুশিক্ষা* বইটিকে কেবলই সংশোধিত, পরিমার্জিত করে চলেন বিদ্যাসাগর। মদনমোহনের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর প্রকাশিত *শিশুশিক্ষা* ৩য় ভাগ-এর ৯১তম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লেখেন: 'শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগ, সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, আদ্যোপান্ত সংশোধন হইল। অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের বোধসৌকর্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্দ্ধিত, কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে, বালকবালিকাদিগের পক্ষে, অর্থবোধ প্রভৃতি বিষয়ে, পূর্ব অপেক্ষা, অনেক অংশে, সুবিধা হইবেক, তাহার সংশয় নাই।'[২১]

বর্ণপরিচয়-এর ১ম ভাগ বেরোয় ১৮৫৫-র এপ্রিলে এবং ২য় ভাগ ওই একই সালের জুন মাসে। ১ম ভাগের কুড়ি বছরে ষাট সংস্করণ ও ২য় ভাগের মাত্র আট বছরে বাষট্টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। *শিশুশিক্ষা,* বিশেষভাবে, ১ম ভাগও বহু বছর ধরে চললেও *বর্ণপরিচয়*-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমশই পিছিয়ে পড়ে এবং অবশেষে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে। *বর্ণপরিচয়* যে বহুদিন যাবৎ শিশুমনোরাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্যে বিরাজ করেছিল তার প্রমাণ দিচ্ছে বইটির কাটতির হিসেব: বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই মোট ১৫২টি সংস্করণে পঁয়তিবিশ লক্ষেরও বেশি ছাপা হয়েছিল *বর্ণপরিচয়*। তবে জনস্মৃতিতে আজও বেঁচে আছে *শিশুশিক্ষা*-র সেই বিখ্যাত কবিতাটি: 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'। পয়ার-ছাঁদে বারো লাইনের অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাটির অনেকগুলো পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে অন্তর্মিল; 'সব-রব', 'কলি-সকলি', 'গণ-মন', 'নিশির-শিশির' ইত্যাদি। মদনমোহনের কাব্যপ্রতিভা যে নিতান্ত কম ছিল না তার সাক্ষী দিচ্ছে কবিতাটির বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি। যেমন, 'শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর'-এর পরের ছত্রটি—'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'; পরস্পরযুক্ত হয়েছে একটি সাদামাটা ও বিস্ময়কর পঙ্‌ক্তি। বিদ্যাসাগরের 'আদ্যোপান্ত সংশোধন' সত্ত্বেও মদনমোহনের কবিত্বশক্তির পরিচয় পরিমার্জিত *শিশুশিক্ষা* থেকে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি। তা ছাড়া দুই বন্ধুর মধ্যে মতের অনেক মিল থাকলেও রুচিবোধ যে আলাদা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার একটি বড়ো প্রমাণ: *শিশুশিক্ষা*-তে নিসর্গবর্ণনাকে যেখানে

যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, *বর্ণপরিচয়*-এ প্রকৃতিদৃশ্যের উল্লেখমাত্র নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের এই আক্ষেপের সঙ্গে অনেকেই হয়তো সহমত হবেন: '(মদনমোহনের) অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অমূল্য জিনিস। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না।'[২২]

শিশুশিক্ষা-র ২য় ভাগ-এর কয়েকটি বাক্য থেকে মদনমোহনের নীতিশিক্ষার ধরন কিছুটা আঁচ করা যায়। 'জাড্যদোষ দূর কর', 'আঢ্যলোক সুখে থাক', 'সদা সত্য কহা উচিত', 'পিতামাতার অবাধ্য হইও না', 'ন্যায্য কথা বলিতে ভয় কি', 'বাল্যকাল শিক্ষার সময়', 'সুশীল হওয়া অতি আবশ্যক', 'আলস্য অশেষ দোষের আকর', 'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়', 'গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত', 'পাঠের সময় গল্প করিও না',[২৩] ইত্যাকার বাক্য বা এ-জাতীয় বাক্য বিদ্যাসাগরও লিখতে পারতেন। কিন্তু 'অলৌকিক বিষয় বিস্ময়জনক', 'ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত' তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। *বর্ণপরিচয়*-এর দুটি ভাগেই ধর্ম বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে একটিও উক্তি নেই।

তবে বিদ্যাসাগর-কৃত আগাগোড়া সংশোধিত *শিশুশিক্ষা* ৩য় ভাগ-এর ৯১তম সংস্করণটিকে *বর্ণপরিচয়*-এর এক রকমফের বলেই মনে হয়। 'গোপাল-রাখাল'রাই যেন অন্য নামে ফিরে এসেছে এখানে। বইটির প্রথম রচনার শিরোনাম: 'সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে'; দ্বিতীয় রচনাটির শিরোনাম যে 'দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না', তা প্রায় না বলে দিলেও চলে। 'সুশীল শিশু'র প্রধান গুণ: 'গুরু লোকেরা তাহাকে যাহা বলেন, সে তাহাই করে, কদাচ তাঁহাদের কথার অবাধ্য হয় না। তাহাকে যে কর্ম করিতে, একবার নিষেধ করা যায়, সে তাহা কখনও করে না।'[২৪] উলটো দিকে, দুরন্ত বালকেরা কারো শাসন-বারণ মানে না, কোনোভাবেই ধাতস্থ করা যায় না তাদের। 'পরের দ্রব্যে লোভ করিও না' রচনায় একটি চমৎকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সুবোধ বালক গোপাল, সিঁড়িতে সোনার হার কুড়িয়ে পেয়ে ভাবে: 'যদি দ্বারবানের কাছে রাখিয়া যাই, কি জানি, সে ছোটলোক, সোনার লোভে পাছে অপলাপ করে।'[২৫] অর্থাৎ 'ভদ্র' ভদ্রলোকদের পক্ষে ছোটোলোকদের বিশ্বাস করা সুবিবেচনার কাজ নয়, ছোটোলোকদের যদি অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, কে তার দায় সামলাবে! 'বেণী-গোপাল-রাখাল-রাম-শ্যাম', ছেলেদের নাম যা-ই হোক, তারা সবাই যে ভদ্রঘরের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উদাহরণত, রাম-শ্যামদের গুণপনার ব্যাখ্যান করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারা এতই ভালো যে 'দাসদাসীকেও কটু কথা বলে না'।[২৬] 'দাসদাসীকে'-র পর অধিকন্তু 'ও'-র প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শিশুশিক্ষা-র এই সংস্করণে শিশুমনে বাধ্যতা নামক সদ্‌গুণসঞ্চারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে একটি অভিনব পদ্ধতি। কোনো একজনকে সরাসরি সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে শান্ত অথবা বখাটে ছেলেদের সুকৃতি বা দুষ্কৃতির বিবরণ; যেমন, 'দেখ মাধব! বেণী, কখনও, লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না; চিরকাল মূর্খ থাকিবে, ও দুঃখ পাইবে। দেখিও,

তুমি যেন বেণীর মত হইও না;'[২৭] 'রাখাল, তুমি ঘোষালদের রাম ও শ্যামকে দেখিয়াছ? ...তাহাদের গুণের কথা কি বলিব।'[২৮] যাদের দেখানো হচ্ছে এবং যাদের সু অথবা কু দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেই নিছক উপলক্ষ; কথকের ভাষ্যটাই প্রধান এখানে, একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু কাদের হয়ে সর্বভূমিকাবর্জিত, নিঃ-স্বর বালকদের অভিভাবকত্ব করছেন কথক, অবলীলাক্রমে জারি করে চলেছেন একের পর এক অনুশাসন? 'নির্দয় লোক পশুর সমান' রচনায় কতিপয় উচ্ছন্নে-যাওয়া ছোঁড়ার পাখপাখালির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ দেখে ব্যথিত হৃদয়ে 'কোমলচিত্ত' কথক বলে ওঠেন: 'ভাল, উহাদের কি মা বাপ নেই, কেহ শাসনকর্তা নাই, যে নিবারণ করে?'[২৯]

শাসনকর্তাদের সঙ্গে অবোধ বালকদের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার নিয়েছেন সর্বজ্ঞ-সর্বদর্শী কথক। 'মিথ্যা কথার অনেক দোষ' রচনায় জানানো হয়েছে: 'মিথ্যাবাদী বালককে কেহ ভালোবাসে না। শিক্ষকেরা তাহাকে ঘৃণা করেন। অধিক আর কি বলিব, সে, দ্বারে দ্বারে, কাঁদিয়া বেড়াইলেও, কাহারও দয়া হয় না।'[৩০] *বর্ণপরিচয়* ২য় ভাগ-এর ষষ্ঠ পাঠ শেষ হয়েছে এইভাবে: 'সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।'[৩১] *শিশুশিক্ষা* (৯১তম সংস্করণ) ও *বর্ণপরিচয়*-এর এই দুই পাঠের শব্দ-নির্বাচন ও বাক্য-গঠনের মিলটা নেহাত আপতিক বলে মনে হয় না। কেবল ওই দুই পাঠে কেন, দুটি বইয়ের কোথাও বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি বা মূল্যবোধের বিশেষ পার্থক্য নেই। বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এর পাশে *শিশুশিক্ষা* (৩য় ভাগ) নামধেয় *বর্ণপরিচয়*-এর আর এক সংস্করণ যে কেন দাঁড়াতে পারেনি তা সহজেই অনুমেয়। দুটি বইতেই কথকের প্রেক্ষিত কখনো পালটায় না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে তাঁর অটল গাম্ভীর্য: তাঁর প্রত্যেক কথায় ধমকের সুর। প্রতি পদে পদে কথক জানান দেন যে, ছোটোদের নিজস্ব কোনো মতামত থাকতে পারে বলে তিনি অন্তত বিশ্বাস করেন না, ছেলেমানুষি জিনিসটাই তাঁর চক্ষুশূল। শিশুদের কাজ হল কেবল শেখা, তদগত চিত্তে শেখা, চাইলে তারা পশুপক্ষীদের কাছ থেকেও শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করতে পারে: 'হে শিশুগণ, তোমরা যদি পশুদের ও পক্ষীগণের আচরণ মন দিয়া দেখ, তবে তাহা হইতে অনেক উপদেশ পাইতে পার' (*শিশুশিক্ষা* ৩য় ভাগ)।[৩২] এই বাক্যটি যে-রচনার অন্তর্গত তার শিরোনাম, 'কুকুর বড় প্রভুভক্ত'।

'প্রভুভক্তি' বাঙালি শিশু-পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের এক অতীব প্রিয় প্রসঙ্গ। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত *শিশুশিক্ষা*-র ৫ম ভাগ, অর্থাৎ উইলিয়াম ও রবার্ট চেম্বার্স-এর *দি মরাল ক্লাসবুক* অবলম্বনে লিখিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীতিবোধ* বইটিতে 'প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার' সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে: 'এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে; বিদ্যা, বুদ্ধি, চিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ...যে ব্যক্তি...মাসিক অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম্ম করে তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের

কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান ও মর্য্যাদা করে। ...প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়া থাকে।'[৩৩] 'প্রভুভক্তি' ছাড়া কমবেশি প্রায় সব নীতিগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকে যে-যে প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে আসে সেগুলি হল: 'রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ', 'গুরুজনদের সেবা', 'অধ্যয়ন ও শ্রম', 'পরোপকার' ও 'বিভিন্ন জাতির গুণাগুণ বিচার'। ওই পরস্পরসম্পৃক্ত প্রসঙ্গগুলো ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকের জীবনজিজ্ঞাসায় প্রকৃতি ও পরিধির সংকীর্ণতার এক সূচক। এদের মাধ্যমে মনু-কথিত ধর্মের সেই পাঁচ প্রকার—বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম ও নৈমিত্তিকধর্ম—যেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, নব কলেবরে ফিরে আসে, তৈরি হয়ে ওঠে সামাজিক শৃঙ্খলার এক বিধিবদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন ছবি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *সহজ রচনাশিক্ষা*-র (২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯৪, ১৮৯৬ ও ১৮৯৮) পঞ্চম পাঠের শেষে 'পরীক্ষার্থে' প্রশ্ন দিয়েছিলেন: 'নিম্নলিখিত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগপূর্ব্বক বাক্য রচনা কর।

বিষয়	বক্তব্য
পুত্র	পিতামাতার উপকার করা।
রাজা	প্রজাপালন করা।
স্ত্রী	স্বামীর সেবা করা।
বিদ্যা	অভ্যাসের অধীন।'[৩২]

প্রশ্নের ধরন থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, বঙ্কিমের মতে 'বিষয়' ও 'বক্তব্যের' মধ্যে একটা 'স্বাভাবিক' সংগতি রয়েছে। চাইলে সেই সংগতি-সূত্র সামান্য বাড়িয়ে নিয়ে পুত্র, রাজা ও স্ত্রীর সঙ্গে শূদ্রকেও বেঁধে ফেলা যায়। *সহজ রচনাশিক্ষা*-র 'পত্রলিপি' অধ্যায়ে সম্বোধনের 'সঠিক' অর্থাৎ প্রথানুগ রীতি সম্পর্কে বঙ্কিম লিখেছেন: 'শূদ্রকে পত্র লিখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শূদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্ত্তব্য।'[৩৪] তবে বঙ্কিম এটাও জানেন যে, নতুন ব্যবস্থায় কিছু কিছু পুরোনো দস্তুর বাতিল হয়ে যাচ্ছে; তাই ওই উপদেশ দেবার পরেই তাঁকে সখেদে জানাতে হয়েছে: 'কিন্তু এখন অনেক শূদ্র ইহা মানেন না।'[৩৫] অভিবাদন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য নির্দেশগুলোও লক্ষণীয়: '...ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "শ্রীযুক্ত বাবু" শিরোনাম এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় না। ...যাঁহাদের কোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুব, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি. তাঁহাদের সে উপাধি শিরোনামে লিখিতে হইবে। যথা—"মহারাজাধিরাজ শ্রীশীলযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতপচন্দ্র বাহাদুর প্রজাপালক বরেষু", "মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল সর আশ্‌লী ইডেন্, K.C.S.I. বরাবরেষু।"'[৩৬] মোট কথা, থাকবন্দি সমাজের কে কোন স্তরে অবস্থিত, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই, সম্ভাষণে নিয়মের খেলাপ করা মহা অন্যায়। কোন ধরনের বাগ্‌রীতির প্রয়োগ ও শব্দ ব্যবহার শিক্ষিত বাঙালিদের শোভা দেয় সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের

অভিমত: 'অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। ..."ছড়ি" কলিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।...কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না।'[৩৭] ভদ্রলোকদের সর্বগ্রাসী আধিপত্য থেকে বাঙালিজীবনের কোনো কিছু বাদ যাবার জো নেই। শহুরে 'শিক্ষিত' লোকদের ভাষা শিষ্ট ও তথাকথিত ইতর বা গ্রাম্য লোকদের ভাষা অশিষ্ট— ভদ্রলোকদের আত্মশনাক্তকরণের এক মাধ্যম ওই পার্থক্যনির্দেশ। তবে বেশ কিছু সদ্‌গুণের অধিকারী না হলে যথার্থ ভদ্রলোক হওয়া যায় না, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পরিচয়টাই যথেষ্ট নয়। হতচেতন বাঙালিদের উদ্‌বুদ্ধ করতেই যেন বইয়ের পর বই, পাতার পর পাতা জুড়ে চলেছে শ্রমমাহাত্ম্যের কীর্তন। ১৮৫০ সাল নাগাদ প্রকাশিত প্যারীচরণ সরকারের সেই অতি-বিখ্যাত *ফার্স্ট বুক অফ রিডিং*-এর কয়েকটি বাক্য: 'A bad boy does not go to school or learn his tasks... How will he earn his bread?' '...take care of him and...teach him to work, then he would not beg from door to door';[৩৮] *শিশুশিক্ষা* (৩য় ভাগ, ৯১তম সংস্করণ): 'হে শিশুগণ, তোমরা পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার পরিশ্রম দেখিলে, বুঝিতে পারিবে, অলস হইয়া, বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'[৩৯] কঠিন শ্রমের কোনো বিকল্প নেই, নিরলস অধ্যবসায় ছাড়া উন্নতি অসম্ভব— এটাই হল বিভিন্ন নীতিগ্রন্থ লেখকদের আপ্তবচন-সম্ভারের শ্রেষ্ঠ রত্ন। শ্রমক্ষমতাই আবার বিভিন্ন জাতির গুণাবলি নির্ণয়ের চূড়ান্ত নিরিখ, কারা 'সভ্য', কারা 'সভ্য' নয় তা যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি। *শিশুশিক্ষা*-র ৫ম ভাগে ('নীতিবোধ') রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন: 'যে দেশের লোক পরিশ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসিলোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যপি এই অবস্থায় আছে।...পৃথিবীর মধ্যে জর্ম্মন্, সুইস্, ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইংরেজ এই কয়েকজাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী; এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'[৪০] শ্রম ও বিদ্যালাভের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। অক্ষয়কুমার দত্তের তিন ভাগে বিন্যস্ত (যথাক্রমে ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) *চারুপাঠ*-এর প্রথম ভাগে আছে সেই ঘনিষ্ঠ যোগের বিশদ ব্যাখ্যা: 'পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য লোকদিগের ও সর্ব্বদেশীয় ইতর লোকদিগের অবস্থা যে এত মন্দ, বিদ্যা শিক্ষা না করাই তাহার প্রধান কারণ।...দেখ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয়েরা বিদ্যাবলে আপনাদের অবস্থা কত উন্নতি করিয়াছেন।'[৪১] আর বিদ্যা না থাকলেও বুদ্ধি যাদের আছে তারা অন্তত বিদ্বানদের কাছ থেকে পাঠ নিতে পারে। বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে হয় প্রেরক-প্রাপকের, অর্পণ-গ্রহণের সম্পর্ক আছে সেটা বুঝিয়ে দিতেই কি বঙ্কিমচন্দ্র *সহজ রচনাশিক্ষা*-য় লিখেছিলেন: 'বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে। ইংরেজের বিদ্যা আছে।'[৪২] ওই বিশ্বাস থেকেই চালিত হয়ে কি 'বালকদিগের' লেখাপড়ায় 'অনুরাগ' ও 'উৎসাহবৃদ্ধি'র জন্যে বিদ্যাসাগর *চরিতাবলী*-তে লিখেছেন, 'কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেত সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অশ্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর

অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বহুতর দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই'।[৩৫] সে কথা বোঝাতেই কি *জীবনচরিত* লিখেছিলেন, এই দুটিকে কেবল ইউরোপীয় মনীষীদের জীবন-বৃত্তান্তে ভরিয়ে তুলেছিলেন? মোট কথা, ক্ষমতার অসম বন্ধনে বিভিন্ন জাতির মানুষ জড়িয়ে আছে কি না, এক তরফের সমৃদ্ধি ও অগ্রসরতাব সঙ্গে দারিদ্র ও অনগ্রসরতার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সে সব আদৌ বিবেচ্য নয়, আলস্য ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াতে পারলেই আপনা থেকেই 'মায়াবলে' সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। নবসংহিতার প্রণেতাদের, ভদ্রলোকপুরাণ নির্মাতাদের কি একবারও মনে হয়নি যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ দিনরাত প্রাণপাত পরিশ্রম করেও দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোটাতে পারে কি না সন্দেহ, আর সেই দুর্দশাব পেছনে রয়েছে 'কর্মঠ', 'ধীশক্তিসম্পন্ন' ভদ্রলোকদের বেশ খানিকটা অবদান? অন্তত অক্ষয়কুমার দত্ত এই গুরুতর প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে পারেননি; *চারুপাঠ* ২য় ভাগ-এ তিনি লিখেছেন: 'ন্যায় পথাশ্রমী সরল স্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী অপেক্ষা সহস্র গুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। ...ধনশালী মহাশয়েরা যে, স্বীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, একি তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অতিমাত্রা উত্তেজনারই কার্য্য।'[৩৬]

'পরিশ্রম'-এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'সম্পদ' ও 'পরোপকারে'র প্রসঙ্গ। শ্রমার্জিত ধনের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেমন দরকার, সম্পত্তিরক্ষা ও বৃদ্ধি যেমন কর্তব্য, তেমনই অর্থ উদ্‌বৃত্ত থেকে অভাবী লোকদের মাঝেমধ্যে সাহায্য করাও উচিত: এরই নাম লোকহিত, সমাজসেবা। তাই, 'চুবি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে' (*বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ*), 'পরেব দ্রব্যে লোভ করিও না' (*শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ*), 'To steal is a sin and a crime', 'Seize the thief' (*ফার্স্ট বুক অফ রিডিং*), 'অপব্যয় করিলে, লক্ষীছাড়া হয়' (*শিশুশিক্ষা* ২য় ভাগ), 'Sweet is the bread that one earns by one's sweat', 'Thank God we are not in want' (*ফার্স্ট বুক অফ রিডিং*), 'We ought to be kind to those who are in want', 'Deign to hear what the poor man says. Do not feign to be deaf. His tears are the sure signs of his grief.' (*ফার্স্ট বুক অফ রিডিং*)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বাঙালিদের লেখা নীতিগ্রন্থে ও স্যামুয়েল স্মাইলস-এর *সেলফ-হেল্প* (১৮৫৯)-এর মতো বইতে একই আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু মধ্যবিত্ত গৌণতার গণ্ডিতে বদ্ধ বাঙালিদের আত্মশক্তি অর্জনের সম্ভাবনা ছিল নেহাতই সীমিত। তাঁরা যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল, ঔপনিবেশিক দুর্গতি সত্ত্বেও, সামান্য হোক, স্বল্প হোক, দেশে যে সামাজিক সচলতা সম্ভব হয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে, হতে হবে যোগ্য কর্মচারী, বাধ্য আজ্ঞাবহতার জন্যে বেন্থামের প্যানপটিকন্ সদৃশ গারদে ছেলেদের পুরে দিলে ক্ষতি নেই। অনুগত কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশার বিশেষ কিছু নেই, তাদের চোখে বাস্তবতা সামাজিক প্রয়োগ বা

প্রক্রিয়া নয়, নেহাতই 'a thing out there'। এর চেয়ে বেশি জানবার দায় বা দরকার তাদের নেই, নিয়মিত নির্দেশ নিঃসাড়ে মেনে চলতে পারলেই কৃতার্থ হবে তারা। ওই নির্মম আদর্শের শ্রেষ্ঠ বাহন, কর্মচারী জীবনচরিতে প্রবেশের শ্রেষ্ঠ উপক্রমণিকা—ঋজু এবং নির্মেদ ভাষায় লিখিত বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*। ঔপনিবেশিক প্রতিশ্রুতিতে অকুণ্ঠ আস্থার প্রমাণ রয়েছে বইটির ছত্রে-ছত্রে, বর্ণে-বর্ণে, তবে তা যে কত অলীক ছিল তা আগের তুলনায় আরও স্পষ্ট হয়ে যায় *বর্ণপরিচয়* প্রকাশের দু-বছরের মধ্যে ১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থানের পর বেশ খানিকটা পালটে যায় পরিস্থিতি, শুরু হয় এক উলটো প্রবর্তনা।

'সিপাহি বিদ্রোহ' ও শিশুসাহিত্য

তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহ ইংল্যান্ডের ধর্মীয় সমিতিগুলোর কর্তৃপক্ষদের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবতীয়দের মন থেকে 'অস্থিরতা' ও 'অশিক্ষা' দূর করবার সদুদ্দেশ্যে 'দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি'-র উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'ক্রিসটিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'। ১৮৬০ সালে ওই সোসাইটি প্রকাশ করে একটি বাংলা শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা: *সত্যপ্রদীপ*। ১৮৬৯ সালে কলিকাতা ট্র্যাক্ট সোসাইটি বের করে 'স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের নিমিত্ত' *জ্যোতিরিঙ্গণ* নামে একটি মাসিক পত্রিকা। শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে কী ধরনের 'সত্য' তখন পরিবেশিত হচ্ছিল, জ্ঞানের 'জ্যোতি' জ্বালানো হচ্ছিল, তার একটি চমকপ্রদ নমুনা 'সিপাহি বিদ্রোহের' দশ বছর পরে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন রায়ের *চরিতমঞ্জরী*। বইটির শুরুতে বলা হয়েছে: 'যে মহানুভব ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল পত্তন করেন, তাঁহার নাম রবার্ট ক্লাইভ।' লেখকের বক্তব্য, সেপাইরা ভুলবশত ইংরেজ নরনারীর প্রতি চরম নৃশংস ব্যবহার করে। 'বাঙলা বিদ্যালয় সকলের উপযোগী' করে লেখা বইটি নির্লজ্জ ও নির্জলা ইংরেজ স্তুতিতে ভরতি। *চরিতমঞ্জরী*-র কিছু অংশ সরাসরি ইংরেজি থেকে অনূদিত, অনুবাদের কোনো কোনো জায়গায় লেখককে সাহায্য করেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত *অবোধবন্ধু* পত্রিকার লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

উনিশ শতকের শেষ দিকে শিশুসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে; ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত তাঁর *আর্য্যপাঠ*-এর ভূমিকা থেকে জানা যায়: 'আজিকালি আমাদের বালকবৃন্দের নীতিজ্ঞানের বড় অভাব হইয়াছে। ...সকল অভিভাবকই এই অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়াছেন। সুদূর ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত এই মহানিষ্টের সংবাদ উপস্থিত হইযাছে। ...সেইজন্য এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন সরকার বাহাদুরকে পরামর্শ দেন যে, ভারতের ছাত্রবৃন্দকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য, সরকার বাহাদুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।' বীরেশ্বর পাঁড়ে সরকারি অনুরোধে, বলা চলে অভিভাবকত্বে, ভারতীয় পুরাণের আদর্শ পুরুষদের চরিতকথা লেখেন *আর্য্যপাঠ*-এ। একই উদ্দেশ্যে কলম ধরেন

সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন: 'বাংলার এখনকার শিশুসাহিত্যকে পরিকল্পনা মতো নীতির নিগড়ে শৃঙ্খলিত করা হয় এবং খাদ্য এবং বস্ত্রের মতো তার উৎপাদনও সরকারি পরামর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়।'[৪৫]

ক্রমবর্ধমান 'শিক্ষা'র সঙ্গে পাল্লা রেখে চারদিকে যে নৈরাজ্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮৮৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকারি প্রশাসকদের একটি জরুরি বার্তা পাঠান স্বরাষ্ট্র দপ্তর। 'কর্তৃপক্ষের প্রতি অশ্রদ্ধা', 'কর্তৃত্বের অবমাননা' রোধ করতে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৮৮৯ সালের ১৭ অগাস্ট, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের (শিক্ষা) এক বৈঠকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রস্তাব হল: এমনভাবে শাস্তি দিতে হবে যাতে অপরাধীকে সমুচিত শিক্ষা দেয়া যায়; শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কেউ অভিযুক্ত হলে, প্রথমে তার বিশেষ সুযোগসুবিধে কেড়ে নিতে হবে, অল্পবয়সী ছেলেদের ওপর মাত্রা রেখে বেত্রপ্রহারও চলতে পারে, কিন্তু এত করেও যদি দেখা যায় যে, ছাত্রটিকে শোধরানো যাচ্ছে না তাহলে তাকে স্কুল বা কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়; ছাত্রদের আচরণ-ব্যবহারের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার; প্রধান শিক্ষকের সুচিন্তিত অভিমত-সহ প্রতিটি ছাত্রের নৈতিক রিপোর্ট তাদের অভিভাবকদের কাছে নিয়মিতভাবে পাঠাতে হবে, সেইসঙ্গে সৎ আচরণের জন্যে বার্ষিক পুরস্কার চালু করা উচিত; উঁচু শ্রেণির ছাত্রদের ওপর স্কুলের ভেতর এবং যতদূর সম্ভব বাইরেও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার ভার দেয়া যেতে পারে; স্কুলের বাইরে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া ও একটি কার্যকর নীতিগ্রন্থ প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজনীয়।[৪৬] প্রস্তাব-গ্রহণের আগে অনেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও দেশের মান্যগণ্য লোকদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর। উত্তরে স্কুল-পরিদর্শক ই. ম্যাসডেন মাদ্রাজের 'পাবলিক ইন্সট্রাকশন'-এর প্রধানকে লেখেন: ছাত্রদের সহবতশিক্ষার ওপর দৃষ্টি দেওয়া দরকার; মুসলমান এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্ররা ইউরোপীয়দের মতো মার্জিতস্বভাব হলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বেশ পিছিয়ে আছে; যেসব স্কুলে ইংরেজি শেখানো হয় বিশেষভাবে সেসব স্কুলে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।[৪৭] উদ্দেশ্য পরিষ্কার: ওই উরদি একদিকে ইংরেজি-জানা ছেলেদের একই দলের আওতায় নিয়ে আসবে, অন্যদিকে ইংরেজি-অজ্ঞদের ভিড়ের বাইরে তাদের সরিয়ে রাখবে। উরদি কেবল পরিধেয় বস্ত্র নয়, কতকগুলো নির্দিষ্ট চিহ্নের আধারও: একইসঙ্গে সংযুক্ত ও বিযুক্ত, সম্পৃক্ত ও স্বতন্ত্র করে দেয় উরদি। এখানেও সেই ভেদ-অভেদের লীলা। বাংলা সরকারের সচিব পি. নোলান উদ্‌বেগের সঙ্গে জানান: এখন দেখা যাচ্ছে একমাত্র সরকারি স্কুল ও কলেজের অনুশাসনই ছাত্রদের বাগে রাখতে পারে; তা রাখা গেলেও অবাধ্যতার অনাচার পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না, কেননা স্কুল-চত্বরের বাইরে থেকে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে ছাত্রদের।[৪৮] ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের বিশেষ কোনো উপকার হবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বাবু পিয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায়।[৪৯] ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ: ছাত্রবিশৃঙ্খলা দমনের

মহৎ উদ্দেশ্যে স্যামুয়েল স্মাইলস-এর *ক্যারেক্টাব* এবং *সেল্ফ-হেল্প* কলেজের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হোক।'[৮] স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তাবে আমির আলি পূর্ণ সম্মতি জানালেও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। আবদুল লতিফই ১৮৭৭ সালের ২৮ জুন লর্ড লিটনের ব্যক্তিগত সচিবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে ওয়ালটার স্কট-এর *দি ট্যালিসম্যান* উপন্যাসটি অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হোক; যে-উপন্যাসে মুসলমান-চরিত্রে অন্যায় ও উৎকটভাবে কালিমালেপন করা হয়েছে তা পড়বার জন্যে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবে না, পাঠাবার কোনো কারণও নেই; এমনিতেই পশ্চিমি সাহিত্য যথেষ্ট 'de-orientalizing', 'de-nationalizing', তার ওপরে ওই ধরনের বই যদি পড়ানো হয তাহলে বিচ্ছেদ বাড়বে বই কমবে না, মুসলমানদের পশ্চিমি জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা বিফল হবে।'[৯] তবে মন্তব্যের চমৎকারিত্বে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, বাংলার 'পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এব প্রধান সার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্ K.C.I.E। তাঁর মতে, ছাত্রদের অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে রয়েছে একটি মারাত্মক অনুবাদপ্রমাদ: যবে থেকে 'জেন্টলম্যান'-এর প্রতিশব্দরূপে 'ভদ্রলোক'-এর ব্যবহাব আরম্ভ হয়েছে তবে থেকেই বাঙালিদের মনে একটি ভুল ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে, কোনো গুণ না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের তারা ইংরেজদেব সমকক্ষ হিসেবে ভাবতে শিখেছে। ফলে বংশমর্যাদা ও স্বোপার্জিত ক্ষমতার জোরে ইংল্যান্ডের ছাত্রেরা যে-সম্মান ও অধিকা'ব পায়, 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্ররাও এখন তাই চায়; বোঝে না যে, তাদের প্রত্যাশা ও যোগ্যতার মধ্যে সংগতি নেই। বৈধ কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত বা বয়োবৃদ্ধদেব বিচাব-বিবেচনাব প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওযাব মধ্যে যে অপমানের কিছু নেই, সেটা ভারতীয় ছাত্রদের মনে ভালোভাবে মুদ্রিত কবে দেওয়া দরকার।'[১০] সাঙ্গীকরণের প্রচেষ্টাটা কি একটু বেশি মাত্রায় সফল হয়ে গেছে? ওই বিপজ্জনক নৈকট্য এড়াতেই কি 'অনুশাসন' ও 'নৈতিক প্রশিক্ষণ' সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি আমলারা এতখানি উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, ভারতীয় স্কুল-কলেজে 'শিক্ষার সুস্থ পবিবেশ' ফিরিয়ে আনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন[১১] ১৮৫৭ সালের ক্রান্তিমুহূর্তের পরে অনেক বাঙালিও যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিলেন তাতে কোনো সংশয়ই নেই। কেবল বীরেশ্বর পাঁড়ে কেন, অনেকেই তখন হয় সরাসরি সরকারি মদতে নয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিশুদেব ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনি শোনাতে শুরু করেছিলেন। তার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত: বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ সংকলিত অতীব জনপ্রিয় নীতিকথা *সুনীতিসন্দর্ভ* (১৮৯১)। বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হয়েছিল *হোপ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, অমৃত বাজাব* ইত্যাদি পত্রিকায়। 'বিজ্ঞাপনে' সংকলক লিখেছিলেন: 'বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহোদয় আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিয়া পুস্তকখানি আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন'। আশ্চর্য কী যে, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য *সুনীতিসন্দর্ভ* সম্পর্কে বলেছিলেন, গোঁড়া পুনরুত্থানবাদীদের কাছে বইটি নিশ্চয়ই মান্যতা পাবে।'[১২] তা পাক বা

না পাক, ইংরেজ অনুরক্তরা যে লেখককে প্রচুর সাধুবাদ জানিয়েছিলেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। রাজার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের উপদেশ: 'রাজার ভ্রমের কথা, বিশেষ চিন্তা করিয়া, তাহার সত্যাসত্যতার বিষয় অবগত হইয়া, অতি সাবধানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যদি রাজা প্রকৃতপক্ষেই অত্যাচারী হন, প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিজে ভোগবিলাসে ব্যাপৃত থাকেন, তথাপি হঠাৎ রাজার নিন্দা না করিয়া বা প্রতিকূলতাচরণে সংকল্প না করিয়া, বন্ধুর মত তাঁহাকে শত সহস্রবার তাঁহার ত্রুটি বুঝাইয়া দিবে। রাজদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা একই কথা; কাহারও ঐ পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।'[৫৪] এর আগে ১২৯৬ সালে প্রকাশিত রজনীকান্ত গুপ্তের *আর্য্যকীর্ত্তি*-তেও 'সিপাহি বিদ্রোহ' সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'উল্লিখিত ভয়ঙ্কর সময়ে' ইত্যাদি। কিন্তু তাও বইটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই প্রথম ভারতীয় চরিত্রদের অবলম্বন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চবিতকথা রচিত হয়; অন্তত আক্ষরিক অর্থে বর্জিত হয় বিলিতি মডেল। 'বিজ্ঞাপনে' লেখক জানিয়েছিলেন: 'বিদেশীয় লোকের আখ্যানপাঠ অপেক্ষা, স্বদেশীয় লোকের আখ্যানপাঠে...আত্মসম্মান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান দৃঢ়তর হয়।'[৫৫] *আর্য্যকীর্ত্তি*-তেই প্রথম উল্লেখযোগ্য স্থান পান ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই।

সামান্য হলেও এর আগে ছোটোদের জন্যে লেখা কিছু প্রবন্ধে বা বইয়ে স্বাজাত্যভিমান ও জাতীয়তাবাদের একটা অস্ফুট প্রকাশ লক্ষ করা যাবে। উদাহরণত, ১৮৩৮ সালে গোপাললাল মিত্রের *জ্ঞানচন্দ্রিকা* বইয়ের 'স্বকীয় দেশ প্রতি স্নেহ' প্রবন্ধটি: 'স্বদেশস্থ যদ্যপি নীচ ও নিন্দনীয় হয় তথাপি তাহাকে আদর করিবে এবং স্বদেশ যদি মরুভূমি হয় তথাপি তাহাকে প্রশংসা কবিবে।' 'সিপাহি বিদ্রোহে'র পর ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত *সখা* পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় 'সুবেন্দ্রবাবুব কারাবাস' নামে একটি প্রবন্ধ বের হয়; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাস প্রসঙ্গে লিখিত ওই প্রবন্ধের উপসংহারে আছে: 'পাঠক। পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য জন্মভূমির জন্য এককোঁটা চোখের জল ফেলিতে শেখ! একদিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, একদিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে। একদিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে।'[৫৬] প্রাবন্ধিকের নাম বিপিনচন্দ্র পাল। অন্যদিকে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত *বালক* পত্রিকায় বাংলা শিশুসাহিত্যের দিক পবিবর্তনের একটা আভাস পাওয়া যায়: 'শিক্ষা' এবং চাকরির ব্যূহজালের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, অন্তত থাকা উচিত, সেই বিশ্বাস থেকে চালিত হয়ে গল্পের সঙ্গে হিতৈষণার সন্ধিস্থাপনের চেষ্টাটা প্রায় পুরোপুরি বর্জিত হয় সেখানে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের জন্যে লেখা গোড়ার দিকের বেশ-কিছু গল্প-কবিতা-নাটক *বালক* পত্রিকায় ছাপা হয়। বাঙালি ভদ্রলোক জীবনে তখন যে একটা উলটো প্রবর্তনা দেখা দিচ্ছিল, তার সাক্ষ্য হিসেবে *বালক* পত্রিকার একটা লেখার একটি টুকরো উদ্ধৃত করা যাক: 'অর্থাৎ বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মা প্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র. ভারি বুদ্ধিমান, কোন বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা

পাশ করিব, রোজকার করিব ও আমরা খাইব।'' কিন্তু যারা বাতিকগ্রস্ত, বেমানান, ভদ্র নয়, তুখোড়বুদ্ধি নয়, সমাজ কি তাদের ছেড়ে কথা কইবে?

১ বব ডিক্‌সন, *ক্যাচিং দেম ইয়ং*, ২য় খণ্ড (লন্ডন, ১৯৭৮), পৃ ৭৫ ১১৯।
২ প্যারীচাঁদ মিত্র, *এ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার*, গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৭৯), পৃ ৪৪ ও ৫৪।
৩ এইচ শার্প (সম্পাদিত), *সিলেকশন্‌স ফ্রম এডুকেশন রেকর্ডস*, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯২০), পৃ ২৯।
৪ ওই, পৃ ১৮৫।
৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১৮১৮-১৯৬০* (কলকাতা ১৯৬৭), পৃ ৩৩।
৬ ওই, পৃ ৫৩।
৭ প্যারীচাঁদ মিত্র, *বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার*, পৃ ৫৪।
৮. সি ই. বাকল্যান্ড, *ডিকশনারি অফ ইন্ডিয়ান বায়োগ্রাফি* (বেনারস, ১৯৭১), পৃ ২৬৩।
৯ প্যারীচাঁদ মিত্র, *বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ অফ ডেভিড হেয়ার*, পৃ ৬৬।
১০. রামকমল সেন ও শ্রীরামপুরান্তর্গত নিবন্ধকর্ত্তাগণ, 'ভূমিকা', *হিতোপদেশ* (কলকাতা, ১৮২০)।
১১ চার্লস এডোয়ার্ড ট্রেভেলিয়ান, *অন দি এডুকেশন অফ দি পিপল অফ ইন্ডিয়া* (লন্ডন, ১৮৩৮)।
১২ রামকমল সেন ও অন্যান্য, *হিতোপদেশ*, পৃ ১, ৮, ৩০।
১৩. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য*, পৃ ৩৪।
১৪ অনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, *দি ডেজ অফ জন কম্পানি: সিলেকশন্‌স ফ্রম ক্যালকাটা গেজেট, ১৮২৪-১৮৩২* (কলকাতা, ১৯৫৯), পৃ ৬১৫-১৬।
১৫ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য*, পৃ ৬৪।
১৬. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা, ১৩৬৮), পৃ ৭৬-৭।
১৭ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য*, পৃ ৭৭।
১৮ প্রবোধচন্দ্র সেন, 'শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', *বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ*, আজহারউদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (মেদিনীপুর, ১৯৭৪), পৃ ৩।
১৯ ওই, পৃ ২৩।
২০ মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, 'বিজ্ঞাপন', *শিশুশিক্ষা*, ৩য় ভাগ (কলকাতা, ১৯০০)।
২১ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, ১ম পর্যায় (কলকাতা), পৃ ৫৩-৪।
২২. মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, 'বিজ্ঞাপন', *শিশুশিক্ষা*, ২য় ভাগ (কলকাতা ১৮৯৯), পৃ ৬-১৫।
২৩. মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, 'বিজ্ঞাপন', *শিশুশিক্ষা*, ৩য় ভাগ, পৃ ৫।
২৪ ওই, পৃ ৭।
২৫. ওই, পৃ ১০।
২৬. ওই, পৃ ৭।
২৭. ওই, পৃ ৯।
২৮. ওই, পৃ ১৩।
২৯. ওই, পৃ ১৪।
৩০ মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, *শিশুশিক্ষা*, ৩য় ভাগ, পৃ ২২।

৩১. ওই, পৃ ২২।
৩২. রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিশুশিক্ষা*, ৫ম ভাগ ('নীতিবোধ') (কলকাতা, ১৮৫১), পৃ ১১।
৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সহজ রচনাশিক্ষা*, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ*, প্রবন্ধ খণ্ড, গোপাল হালদার সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৭৩), পৃ ১১৮৮।
৩৪. ওই, পৃ ১১৯৯।
৩৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সহজ রচনাশিক্ষা*, পৃ ১১৯৯।
৩৬. ওই, পৃ ১১৯৮-১১৯৯।
৩৭. ওই, পৃ ১১৯৯।
৩৮. প্যারীচরণ সরকার, *দি ফার্স্ট বুক অফ রিডিং*, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ ৫৬-৭।
৩৯. মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংশোধিত, *শিশুশিক্ষা* ৩য় ভাগ, পৃ ২১।
৪০. রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিশুশিক্ষা*, ৫ম ভাগ ('নীতিবোধ'), পৃ ১৬।
৪১. অক্ষয়কুমার দত্ত, *চারুপাঠ*, ১ম ভাগ (কলকাতা, ১৮৭৬), পৃ ১।
৪২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সহজ বচনাশিক্ষা*, পৃ ১১৮৭।
৪৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *জীবনচরিত*, *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ ১২৯।
৪৪. অক্ষয়কুমার দত্ত, *চারুপাঠ*, পৃ ৩৯, ৪৩।
৪৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য*, পৃ ১১৫।
৪৬. 'পেপারস রিলেটিং টু ডিসিপ্লিন অ্যান্ড মরাল ট্রেনিং ইন স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস ইন ইন্ডিয়া', *সিলেকশন্‌স ফ্রম দি রেকর্ডস অফ দি গর্ভনমেন্ট অফ ইন্ডিয়া — হোম ডিপার্টমেন্ট, CCLXV*, ক্রমিক সংখ্যা ৮ (কলকাতা, ১৮৯০), পৃ ১-২।
৪৭. ওই, পৃ ৫৭-৮।
৪৮. ওই, পৃ ১২২।
৪৯. ওই, পৃ ১২৫।
৫০. ওই, পৃ ১৩১।
৫১. ওই, পৃ ১৩৭।
৫২. ওই, পৃ ১৪৪।
৫৩ চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, *সুনীতিসন্দর্ভ* (কলকাতা, ১৮৯৩)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি বইয়ের গোড়ায় মুদ্রিত।
৫৪. ওই, পৃ ৯১।
৫৫. রজনীকান্ত গুপ্ত, 'বিজ্ঞাপন', *আর্য্যকীর্ত্তি* (কলকাতা, ১২৯৬)।
৫৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য*, পৃ ১৬।
৫৭. ওই, পৃ ১৯।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১) গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বাজার

আশিস খাস্তগীর

এক

লেখক বই লিখছেন আব সে বই বাজাবে বিক্রি হচ্ছে, এমনটি উনিশ শতকের আগে ভাবা যায়নি। ১৭৪৩ সালের পর ছাপার অক্ষবে বাংলা দেখা গেলেও বাঙালির জন্য বাংলা বই এসেছে ১৮০০ সালের পর। আঠারো শতকেব শেষেব দিকে সাহেবি পাড়ায় যেসব প্রেস ছিল (যেমন, হিকির প্রেস, অনারেবল কোম্পানির প্রেস, ইন্ডিয়া গেজেট প্রেস, ক্যালকাটা গেজেট প্রেস, ক্রনিকল প্রেস, গ্লাডউইনের প্রেস, ওয়ার্ল্ড প্রেস, বেঙ্গল হরকরা প্রেস, ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজার প্রেস, মর্নিং পোস্ট প্রেস, মিরব এশিয়াটিক প্রেস, টমসন অ্যান্ড ফেরিসের প্রেস, টেলিগ্রাফ প্রেস, ওবিয়েন্টাল স্টার প্রেস ইত্যাদি), সেখানে ছাপা হত ব্যাকরণ-অভিধান বা আইনের বই। ক্রেতা ছিলেন মূলত ইউরোপীযরা। দেশীয ক্রেতা বলতে হাতে গোনা দু-চারজন।

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের ছাপাখানায় ছাপা হত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ। মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচাব। সাধাবণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে গেলে চাই তাদের ভাষায় লেখা বই। বুদ্ধিমান মিশনারিরা বিনে পয়সায় বঙ্গানুবাদগুলি বিলিয়ে দিতেন। সুতরাং খ্রিস্টধর্মের বইয়ের বিক্রির বাজার ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ান ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকগুলিও বাজারে বিক্রির জন্য ভাবা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষই বইগুলির অনেক কপি কিনে নিতেন। বাংলা বইয়ের বাজার তৈরি হয়েছে আরও পরে।

যতদিন না প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা তার ডালপালা মেলেছে, ততদিন বাংলা বইয়ের বাজার থিতু হয়ে বসতে পারেনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পেরিয়ে ১৮১৮-তে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হবার পর তাদের অধীনে স্থাপিত হল বেশ কিছু স্কুল। এর এক বছর আগেই কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে কম খবচে বই জোগান দেবার সংস্থা ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। তবে তাঁরা যে ব্যাবসা করার উদ্দেশ্যেই সোসাইটি খুলেছিলেন, এমন নয়। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা ও ছাপানোর পর তাঁরা স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে তা বিতরণ করতেন। এদিক দিয়ে স্কুল বুক সোসাইটিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মুদ্রক, প্রকাশক ও বিক্রেতা। স্কুল বুক সোসাইটি প্রথম চার বছরে শুধু বাংলা ভাষাতেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়েছেন। সেকালে সংখ্যাটা বড়ো কম নয়।

ওদিকে কলকাতায় তখন স্ত্রী-শিক্ষা নিয়েও সোরগোল উঠেছে। স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কেব ঝড়। সে সুযোগে ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি বা ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি (লেডিস সোসাইটি) এবং আরও অনেক মিশনারি সোসাইটি স্ত্রী-শিক্ষা ও ধর্মান্তরকরণের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করে চলেছেন অসংখ্য স্কুল। আর অন্যদিকে ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ পাঠশালা (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা (১৮৪০), ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা বেথুন স্কুল (১৮৪৯)।

দিন বদল হল। দেখা গেল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের ক্রমবর্ধমান হার ছাড়াও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একের পর এক কলেজ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) ছিল উচ্চশিক্ষায় বাঙালির যুগ্ম গন্তব্যস্থল। পরের পঞ্চাশ বছরে উচ্চশিক্ষার নানা দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। একে একে দেখা দিল ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৪), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭), সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (১৮৬২), সেন্ট পল্‌স কলেজ (১৮৬৫), মেট্রোপলিটন কলেজ (১৮৭২), সিটি কলেজ (১৮৭৮), বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৮০), রিপন কলেজ (১৮৮৪), বঙ্গবাসী কলেজ (১৮৮৭), বেথুন কলেজ (১৮৮২) ইত্যাদির মতো বিখ্যাত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

বুনিয়াদি থেকে উচ্চশিক্ষা—এই বিশাল পরিধির ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা পূরণ করতে ১৮১৭-তে গঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, এ কথা আগেই বলেছি। এর পর ক্যালকাটা ক্রিস্টিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটি (১৮২৩), ক্যালকাটা ক্রিস্টিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি (১৮৩৯), ভার্নাকুলার লিটারেচাব সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০) ইত্যাদি সংস্থাগুলিও গঠিত হয় একই উদ্দেশ্যে। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা ও সরবরাহই ছিল তাদের লক্ষ্য। মিশনারি সোসাইটিগুলি অবশ্য তাদের বই প্রায়ই বিনে পয়সায় বিলি করত।

এত স্কুল-কলেজের জন্য বই ছাপাতে নেমে পড়ল বহু প্রেস। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস তো ছিলই, সঙ্গী হল স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস, বটতলা এবং কলকাতার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিগত মালিকানার অসংখ্য প্রেস, সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রেস ইত্যাদি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাঠ্যপুস্তকের বাজার ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে। বাংলা বই বিক্রির বাজার প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের পিঠে চেপে।

পাঠ্যপুস্তক বলতে প্রথমেই আসে প্রাইমারের কথা। এর কারণ, যে-হারে বুনিয়াদি স্তরে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্যই বই ব্যাবসার সেদিকটি তখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। ১৮২৩-এর মধ্যে মিশনারিরা দেড়শোর বেশি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করে ফেলেছিলেন। ওদিকে তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও স্কুল স্থাপন করে চলেছেন। স্কুল বাড়ছে, ছাত্রও বাড়ছে। কিন্তু দেখার ব্যাপার এই, প্রাতিষ্ঠানিক

স্কুলগুলিতে সেই সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারই চলত। যেমন, স্কুল বুক সোসাইটির স্কুলগুলিতে পাঠ্য ছিল তাদের *বর্ণমালা* (স্টুয়ার্ট, ১৮১৮)। হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে পড়ানো হত নিজস্ব *বর্ণমালা*। হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রাইমারের নাম ছিল *শিশুসেবধি*। ১৮৪৬-এ সোসাইটি নতুনভাবে বার করলেন *বর্ণমালা*। পরের সাত বছরে সাতটি সংস্করণে ৩৩৫০০ কপি ছাপা হয়। কিন্তু এই সংখ্যক কপি বিক্রিকে 'বাজার' বলা যাবে না। কারণ, তখনও এমন কোনো প্রাইমার মুখ দেখায়নি যার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

দিনটি এল ১৮৪৯-এ। সে বছর বেরোল মদনমোহন তর্কালংকারের *শিশুশিক্ষা*-১। বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ঘরে ঘরে শোনা গেল 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'। পরের বছর ২য় ও ৩য় ভাগ, ১৮৫১-তে ৪র্থ ভাগ (*বোধোদয*, বিদ্যাসাগর) এবং ৫ম ভাগ (*নীতিবোধ*, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৮৫৫-তে বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*। বাংলা প্রাইমারকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। *শিশুশিক্ষা* এবং *বর্ণপরিচয়*-এর হাতে চলে এল গোটা বাজার। সামনে পাশে প্রতিযোগী বলতে দুটি বই—*শিশুবোধক* আর *বাল্যশিক্ষা*। *শিশুবোধক* কবে প্রথম রচিত হয়, তার হদিশ পাইনি। তবে মূলত গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত পদ্যাশ্রিত *শিশুবোধক* উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছিল। *শিশুবোধক* ছাপানো হত ১০০০ থেকে ১০০০০ কপি পর্যন্ত। রামসুন্দর বসাকের *বাল্যশিক্ষা* প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৮৭৭-এর জুন মাসে। পরে কলকাতা থেকেও বইটি ছাপা হতে শুরু করে। ১৮৯৫-এ বেরোল ৬৩তম সংস্করণ। তখন ছাপা হচ্ছে ২৫০০০ কপি করে। আর *শিশুশিক্ষা*-র ১ম ভাগের ৫০তম সংস্করণ ১৮৭০ সালে, শততম সংস্করণ ১৮৮০-র অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সংস্করণে ১০০০০ কপি। পাশাপাশি *বর্ণপরিচয়* ১ম ও ২য় ভাগের ৫০তম সংস্করণ ১৮৭৪-এ, ১০০তম সংস্করণ ১৮৮৯-এর সেপ্টেম্বরে ছাপা হয়। তখন সংস্করণ পিছু ৫০০০০ কপি! ১৮৬৯ থেকে ১৮৮০—এই ১২ বছরে মোট ৪১,০০,৩০০ কপি প্রাইমার ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে *বর্ণপরিচয়* ১৭,৯০,০০০ কপি, *শিশুশিক্ষা* ১২,৫১,০০০ কপি, *শিশুবোধক* ৩,৪০,৫০০ কপি এবং অন্যান্য ৭,১৮,৮০০ কপি। পুরো উনিশ শতক জুড়ে ৫০০-র বেশি প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।[১] তার আশি শতাংশই ১৮৫৫-র পর বেরিয়েছে।

প্রাইমারের ব্যাবসায় লাভের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছিলেন বহু মানুষ। ব্যাবসার বাড়-বাড়ন্ত দেখা গেল উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে। এপার-ওপার দু-বাংলাতেই তখন প্রাইমারের ব্যাবসার রমরমা। ওপার বাংলাতে সবে কয়েকটি প্রেস বসেছে (১৮৪৭ থেকে শুরু)। কলকাতায় অলিতে গলিতে ষাটের দশকে শোনা যাচ্ছে যন্ত্র-ধ্বনি। সেসব ছোটো-বড়ো প্রেসে প্রাইমার ছাপার কাজ চলছে। এমন ব্যাবসার সুযোগ আর কোথায়?

প্রাইমারের পর নীতিশিক্ষামূলক বই। শুধু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নয়,

পরবর্তীকালে স্কুল-কলেজে নীতিশিক্ষা অবশ্যপাঠ্য হওয়ায় তারও বাজার তৈরি হয়। চাহিদা ছিল বলেই উনিশ শতকে *হিতোপদেশ* শুধু গদ্যেই অন্তত ১৯টি অনুবাদ হয়েছে। সমান জনপ্রিয় ছিল *বত্রিশ সিংহাসন*, *তোতা ইতিহাস*, *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র অনুবাদ। স্কুলে স্কুলে পড়ানো হত স্কুল বুক সোসাইটির *নীতিকথা*, *মনোরঞ্জনেতিহাস*। *নীতিকথা* পড়েননি এমন মানুষ সেকালে কমই ছিলেন। প্রথম বছরেই (১৮১৮) ৩টি সংস্করণ। ১৮৫৫-তে ১৪শ সংস্করণ। মোট মুদ্রণসংখ্যা লাখের ওপর। *মনোরঞ্জনেতিহাস* (১৮১৯) -এর ১১শ সংস্করণ ১৮৫৮-তে। এ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল *বোধোদয়*, *কথামালা*, *নীতিবোধ*, *চারুপাঠ*, *নীতিসার*, *সদাচারদীপক*, *সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস*। *বোধোদয়*-এর ৮০তম সংস্করণ বেরিয়েছে ১৮৮৩-র মার্চে (প্রতি মুদ্রণ ১০০০০ কপি)। ১৮৫৭ সালে প্রায় ৪০০০০ কপি নীতিশিক্ষামূলক বই ছাপা হয়। ১৮৫৬-তে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির প্রকাশনায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় নীতিশিক্ষামূলক বইয়ের জগতে এক নতুন ধারার আমদানি করলেন। হান্স অ্যান্ডারসেনের কাহিনি তিনি অনুবাদ করলেন বাংলায়। সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বইগুলি। পরের দশকগুলিতে নীতিশিক্ষামূলক বইয়ের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু গদ্যে নয়, পদ্যেও তখন নীতিশিক্ষার চাহিদা প্রচুর। এ ধরনের বই ছাপতেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, মাদারিপুরের নানা প্রেস। আর কলকাতার তো কথাই নেই। সংস্কৃত প্রেস থেকে শুরু করে অগুনতি প্রেস এ কাজে নেমে পড়ে। ভালো আয় না দিলে এই দিকে তাঁরা নজর দিতেন না নিশ্চয়ই।

এর পর বলতে হয় বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থের কথা। পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হবার আগে পর্যন্ত সে বিষয়ে বই রচনায় দেশীয় মানুষের আগ্রহ তেমন একটা দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ মিশনারিরা। তাঁদের দেখানো পথে দেশীয় মানুষদের আনাগোনা শুরু হয় মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। তখন পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি সকল দিকেই বাঙালি লেখকদের পদচারণা। বিশেষত ১৮৫২-তে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যাপারটি সরকারিভাবে স্বীকৃত হবার পর চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর বাংলা বই রচনায় জোয়ার আসে। সাধারণভাবে অ্যালোপ্যাথি শিক্ষার বই, সার্জারি, ধাত্রীবিদ্যা, নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা, সাপের কামড়ের চিকিৎসা, শিশুপালন, বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহারের পদ্ধতি এমনকী যৌনবিজ্ঞান নিয়েও প্রচুর বই লেখা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের বই তখন বাঙালি সাগ্রহে পড়ছে। অনেক বইয়েরই একাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। এমনকী ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত। জনপ্রিয়তার টানে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে বই লিখেছেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (*শরীরসাধনীবিদ্যার গুণোৎকীর্তন*, ১৮৬০, স্ট্যানহোপ প্রেস)। রঙ্গলালের বইটি ১৮৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল। অ্যালোপ্যাথিকে জনপ্রিয় করতে লেখকরা কতখানি সচেষ্ট ছিলেন দুটি বই তার প্রমাণ।

প্রথমটি *পকেট ট্রিটমেন্ট* (১৮৯৩, শশিভূষণ দে), দ্বিতীয়টি *পদ্যে মাত্রা শিক্ষা* (১৮৯৬, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

শুধু অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি শিক্ষার বইয়েরও খুব ভালো চাহিদা ছিল। চন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছিলেন যে, হোমিওপ্যাথি বইয়ের বড়ো অংশ 'may be regarded in the light of a very important and suggestive fact.' তুলনামূলকভাবে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যা বেশি। চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য ধারার মধ্যে আয়ুর্বেদশাস্ত্র, চরক ও সুশ্রুত সংহিতার বঙ্গানুবাদ, কবিরাজি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি সব দিক নিয়েও বাংলায় বই লেখা হয়েছে। এমনকী যোগাসনেরও বই বেরিয়েছে তখন। দেশীয় চিকিৎসা যে খুবই জনপ্রিয় তা বোঝা যায় হলধর সেনের *চিকিৎসার্ণব* বইটির বিক্রি দেখে। সে বইয়ের নাকি ১,২০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। বেঙ্গল লাইব্রেরির হিসেব অনুযায়ী ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে হাজারখানেক চিকিৎসাশাস্ত্রের বই ছাপা হয়েছে। সেকালে সংখ্যাটা বড়ো কম নয়। শুধুমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের বই ছাপাতে প্রেস বসল। নাম চিকিৎসাপ্রকাশ প্রেস এবং চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের ৬.৫ শতাংশ বিজ্ঞান বিষয়ক। ব্যাবসার কারণটি সহজবোধ্য।

এবার বলি ইতিহাস-ভূগোল বিষয়ক বইয়ের কথা। বাঙালির ইতিহাসচেতনার অভাব তো ছিলই। উপরন্তু এই দুটি বিষয় পাঠ্যও ছিল না। সে কারণে বাঙালির আগ্রহও জাগেনি। পাঠ্য বিষয় হিসেবে ইতিহাস-ভূগোল চালু হবার পর বাঙালি এদিকে উৎসাহী হল। সামনে আদর্শ বলতে মিশনারিদের লেখা ইতিহাসের বই। তাঁদের আদর্শে দেশীয় লেখকদের মধ্যে বাংলার ইতিহাস থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশ এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা দেখা গেল। তাদের গুণগত মান যেমনই হোক না কেন, শিক্ষাবিস্তারের ফলেই সেসব বইয়ের চাহিদা তৈরি হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মধ্যেই গ্রিস, রোম, ইংল্যান্ড, মিশর ইত্যাদি দেশের ইতিহাস নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লেখা হয়েছে। বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বই। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রকাশিত মোট বইয়ের শতকরা ৩ ভাগ ইতিহাস-ভূগোল বিষয়ক বই। বহু প্রেস ইতিহাসের বই ছাপিয়েছেন। কিছু কিছু বই ৫০০ বা ৩০০০ কপি ছাপা হলেও মোটামুটিভাবে সব বই-ই ১০০০ কপি করে ছাপা হত।

পাঠ্যপুস্তকের কথা সাঙ্গের আগে বলতে হয় নোট বইয়ের কথা।[৩] একালের মতো সেকালেও যে নোট বই ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়-মন জয় করেছিল, সেটি ব্যাবসার রমরমা দেখলেই বোঝা যায়। নোট বইয়ের বাজারের শুরু ১৮৫০-এর পর থেকে। প্রথমে ইংরেজি, এর পর বাংলা বইয়ের নোট। ছাত্র-মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে দিতে আগে চাই ছোটোদের নোট বই। এই আপ্তবাক্যটি স্মরণে রেখে আগে বেরোল কচিকাঁচাদের নোট। তার পর বড়োদের। পাঠশালা থেকে ওপরে উঠতে উঠতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত

পৌঁছোল নোট বই। নোট বইয়ের কদর বাড়ল। তখন যিনি পারছেন তিনিই নোট বইয়ের ব্যাবসায় নেমে পড়ছেন। এমনকী, পাছে অন্য কেউ ব্যাবসায় ভাগ বসায় সে ভয়ে নিজের লেখা পাঠ্যবইয়ের নোট নিজেই লিখেছেন কেউ কেউ। ব্যাবসার বাড়বাড়ন্ত এমন হল যে, ১৮৭৮ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান উইলিয়াম ললার তীক্ষ্ণ মন্তব্য করলেন: 'No other language deals with keys in this style and number.' কিন্তু সে কথা শোনে কে! বাজার ছেয়ে গেছে নোট বইয়ে। এই নোট বইয়ের মূল জোগান আসছে ঢাকা থেকে। মোট নোটের শতকরা ৬০ ভাগ। আর ঢাকাতে যত বই ছাপা হচ্ছে তার শতকরা ৭৫ ভাগই নোট বই।

পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতে এত বিষয়ের এত বই ধরা পড়েছে যে, সবার খতিয়ান দেওয়া এই পরিসরে সম্ভব নয়। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত ৩০৪টি বইয়ের মধ্যে (সংবাদ-সাময়িকপত্র বাদে) পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ৪৬টি। ৩০৪টি বইয়ের মোট ছাপার পরিমাণ ৫,৬০,৭২০ কপির মধ্যে (লঙের মতে প্রকৃত সংখ্যাটি এর থেকে অনেক বেশি) পাঠ্যপুস্তকের অংশ ১,৪৫,৩০০ কপি। অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ।

দুই

উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের বিক্রির বাজার দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে পাঠ্যপুস্তক আর অন্যদিকে পাঠ্য-বহির্ভূত বই। পাঠ্য-বহির্ভূত (যেমন, আইন, অভিধান, ব্যাকরণ, ধর্ম, জীবনী, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ও বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক) গ্রন্থের বিক্রিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে। সে সময়ে পাঠ্য-বহির্ভূত গ্রন্থের মোট বিক্রি চোখে পড়ার মতো।

শতক শুরুর সময় বাংলা বইয়ের বিষয় তেমন ব্যাপ্তি পায়নি। ধর্ম, আইন, জ্যোতিষ, আদিরস, নীতিকথা, সংগীত, অভিধান, উপাখ্যান ইত্যাদির মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে বাংলা বই। শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালি চোখ ফেরাল নতুন নতুন বিষয়ের দিকে। তখন তাব চাহিদা বেড়েছে। তাই আনকোরা বিষয়ে সমৃদ্ধ হল বাংলা বই। তালিকায় উঠে এল খাওয়া-দাওয়া, চাষবাস, খেলাধুলা, চিত্রশিল্প, সংগীতবিদ্যা, ভূমিপরিমাপ, সমসাময়িক ঘটনা—এমন আরও কত। কোন বিষয় নিয়ে লিখলে 'পাবলিক খাবে' তা অনেক বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে শিখেছেন। তাই অনেক লেখক একাধিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন। *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া*-র হিসেবমতে ১৮১০ থেকে ১৮২১-এর মধ্যে মোট ১৬ হাজার কপি বই দেশীয় লোকদের কাছে বিক্রি হয়েছিল। শতক শেষে সাহিত্যের মতোই জনগণেশের চাহিদার টানে দেখা গেল বিচিত্র বিষয়ের বই। শুধু বিষয় নয়, মুদ্রণসংখ্যা ও বিক্রির দিক দিয়েও বাংলা বই তখন তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

পাঠ্য-বহির্ভূত বাংলা বই ব্যবসায়িক কারণেই প্রথমদিকে ছাপা শুরু হয়নি। একে

তো পাঠকের অভাব, অন্যদিকে শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবের কারণেই পাঠক তৈরি হতে সময় লেগেছে। পাঠক তৈরি হওয়া এবং বাংলা বই বিক্রির বাজারের সূত্রপাত—এই সহজ সমীকরণে পর্বটির সমাধা হয়নি। এর আড়ালে কাজ করেছে রাজনৈতিক-সামাজিক চাহিদাপূরণের তত্ত্ব। বই ছাপালেই হবে না। তার পাঠক চাই। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এ কাজে মিশনারিরা বেশ দ্রুত এগিয়েছিলেন। বাংলার নানা স্থানে গড়ে উঠল স্কুল। সে স্কুলে বাইবেলের মাধ্যমে বাঙালি শিক্ষিত হতে শুরু করে। বিনে পয়সায় তাদের হাতে আসে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ। একে অবশ্যই 'বাজার' বলা যাবে না। তবে বাজার তৈরির জমিটুকু পরিষ্কার হয়েছিল।

ইংরেজরা এ দেশে আসার আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনো অভিধান ছিল না। কারণ তার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ধর্মপ্রচার ও শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ইংরেজরাই অভিধানের প্রয়োজন সর্বপ্রথম অনুভব করলেন। এখানে কাজ করেছে ঔপনিবেশিক স্বার্থ। উপনিবেশ গড়ে তুলতে হলে উপনিবেশের ভাষা যেমন নিজেদের জানা দরকার, তেমনই নিজেদের ভাষাও তাদের জানানো দরকার। চতুর ইংরেজের এ কথা বুঝতে দেরি হবার কথা নয়। অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্যগুলিতে প্রমাণিত হয় উনিশ শতকে বাঙালি ও ইংরেজদের মধ্যে যোগাযোগের সেতু তৈরি করতে সাহায্য করেছে অভিধান। তখন বাঙালি ও ইংরেজ উভয়েই নিজের গরজে উভয় ভাষা শিখতে চেয়েছে। কারণ তখন যে-বাঙালিবাবু (অবশ্যই ধনী) ভালো ইংরেজি জানতেন, তিনি ইংরেজদের কাছে বেশি কলকে পেতেন। এর ফল সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। অন্য দল মিশে যেতে চেয়েছে বাঙালির সামাজিক স্রোতে। সমাজধারার সঙ্গে না মিশলে শাসনের মূল খুঁটিই যে থাকবে নড়বড়ে। এ কারণে দ্বিভাষিক অভিধানের এত বহুলতা। তুলনায় বাঙালির জন্য বাংলা অভিধান নিতান্তই স্বল্প। কোনো কোনো অভিধানের সঙ্গে প্রকাশিত হত তার গ্রাহক তালিকা। তাতে মাত্র কয়েকজন ধনী বাঙালির নাম দেখা গেছে। অভিধানগুলির দাম হত খুব চড়া, যা ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অভিধানকে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত করার জন্য অবশ্য কোম্পানি সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিধান বিতরণ করতেন। তাতেও অভিধান যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এমনটি বলা যাবে না।

অভিধানের তুলনায় উনিশ শতকে বাংলা জীবনীগ্রন্থের চাহিদা কিছুটা বেশিই ছিল। গুণগত দিক দিয়েও চরিতগ্রন্থের মান ছিল উন্নততর। যদিও সংখ্যাগত দিক দিয়ে জীবনীগ্রন্থ খুব বেশি ছিল না। বেঙ্গল লাইব্রেরির রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সে কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বাংলার মতো ভারতের আর কোনো প্রদেশে এত বেশি সংখ্যক ভালো জীবনী দেখা যায় না। বেঙ্গল লাইব্রেরির হিসেব অনুযায়ী ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০-র মতো জীবনীগ্রন্থ ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ধর্মীয় জীবনচরিত (চৈতন্য, যিশু, দয়ানন্দ সরস্বতী, লোকনাথ, রামকৃষ্ণ, প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রমুখ), ঐতিহাসিক জীবনচরিত (বাবর, আকবর, শিবাজি, জাহানারা, নূরজাহান,

অহল্যা বাই ইত্যাদি), স্বদেশীয় রাজা বা জমিদারের জীবনচরিত (কৃষ্ণচন্দ্র, প্রতাপাদিত্য, পীতাম্বর সিংহ, মহতাবচন্দ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ), স্বদেশীয় কবি-সাহিত্যিক-মনীষীর জীবনচরিত (কৃত্তিবাস, জয়দেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ঘনরাম, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ), বিদেশীয় শাসক-বীর-লেখক-সমাজসেবীর জীবনচরিত (গ্যারিবল্ডি, হানিম্যান, মেটকাফ, পার্কার, ডেভিড হেয়ার, লিংকন, ফ্র্যাংকলিন, ম্যাতসিনি, স্টুয়ার্ট মিল, ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন প্রমুখ), নারীচরিত (কুমুদিনী, স্বর্ণময়ী, ভবানী, রাসমণি, শরৎসুন্দরী ইত্যাদি)।

এইসব বই ছাপা হত ৫০০ থেকে ২০০০ কপি পর্যন্ত। জীবনীগ্রন্থ ছাপতে উৎসাহী ছিল বহু প্রেস। যেমন, অমৃতপ্রবাহিণী, আশুতোষ, ইন্ডিয়ান মিরর, গিরিশ বিদ্যারত্ন, জি. পি. রায়, দ্বৈপায়ন, নব্য ভারত, নিউ আর্য, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, বরাট, বিডন, বিধান, বুধোদয়, ব্রাহ্ম মিশন, ভারতী, ভিক্টোরিয়া, মোহন, রাধারমণ রায়, সাম্য, সাহিত্য, সুচারু, হরি—এমনই আরও কত প্রেস। নির্দিষ্ট বাজার ছিল বলেই এত প্রেস এই বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিল।

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ধর্মীয় গ্রন্থের বিক্রির বাজার উনিশ শতকের প্রথম দিকে না থাকলেও শেষ পঞ্চাশ বছরে এসব বইয়ের কাটতি ছিল চোখে পড়ার মতো। খ্রিস্টীয় মিশনগুলি ধর্মপ্রচার করার অনুমতি লাভ করে ১৮১৩ সালে। তখন তারা বাইবেলের অনুবাদ ও প্রচারপুস্তিকার লক্ষ লক্ষ কপি বিনে পয়সাতেই সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করত—এ কথা আগেই বলেছি। ১৮১৫ থেকে ১৮২০-র মধ্যে রামমোহন রায় যে-কটি ধর্ম-দর্শন বিষয়ক বই লিখেছিলেন, তাতে বাজার তৈরি হয়নি। ১৮২৬ পর্যন্ত গতানুগতিক ঢেউ। হাতে গোনা গুটিকতক কৃষ্ণ-রাধা-বিষ্ণু-দুর্গা বিষয়ক বই।

এর পর পুরো ছবিটাই পালটে গেল। আলেকজান্ডার ডাফের কর্মকাণ্ড, ব্রাহ্মসমাজের ক্রিয়াকলাপ, ইয়ং বেঙ্গল দলের আত্মপ্রকাশ, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষার প্রয়াস—সব মিলিয়ে বাংলার সমাজ তখন সরগরম। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত ও নানা শাস্ত্রের অনুবাদের ঢেউ উঠল। তখন সকল মতের ও পথের মানুষজন বই লিখতে নেমে পড়েছেন। সেসব বই ছাপাতে ব্যস্ত কলকাতার অধিকাংশ ছাপাখানা। শুধুমাত্র ১৮৫৭ সালে মোট ছাপা এক লাখ কপি বইয়ের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই ছিল ধর্মীয় প্রচারমূলক। আর ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের এক চতুর্থাংশই ধর্মীয় বই।

ধর্মীয় বইয়ের যেমন চাহিদা ছিল, তেমনই চাহিদা ছিল কোনো বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা বইয়ের। সেসব বইয়ের বিক্রির বাজার ছিল ঈর্ষণীয়। ১৮৭৫ সালের শেষে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে আসেন। তাঁর আগমন বাঙালি লেখকদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা ফেলে দেয়। যুবরাজের জীবনী, প্রশস্তি, বন্দনাগান, স্তুতি, প্রার্থনা, জয়ধ্বনি কিছুই বাদ যায়নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রসন্নময়ী দেবীর মতো খ্যাতনামাদের সঙ্গে

ছিলেন অনামা অখ্যাত বহু লেখক। বইগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮ থেকে ৬০। দাম ২ পাই থেকে ৮ আনা পর্যন্ত। ছাপানো হয়েছিল ৫০ কপি থেকে ৫০০০ কপি পর্যন্ত। প্রসন্নময়ী দেবীর বইটি বিনে পয়সায় বিলি করা হয়। যুবরাজের পর ১৮৮৭ সালে ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব পালন উপলক্ষেও একই ঘটনা ঘটে। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও অনেক লেখক।

তিন

'বটতলার বই' বলতে আমরা যে-ধরনের বইকে বুঝে থাকি, তার মধ্যে বড়ো অংশ হল ব্যভিচার, দুর্ঘটনা, চমকপ্রদ কোনো ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক উৎসব, শিল্প বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, হরেকরকম দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী, রান্নাবান্না, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক বই। ১৮৭৫-এ মাছের মড়ক, ১৮৬৪-র আশ্বিনে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়, ১৮৬৭-র নভেম্বর, ১৮৭৬-এর অক্টোবর, ১৮৮৮-র এপ্রিল এবং ১৮৯৭-র জুন মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর প্রচুর বই বেরিয়েছে। তার কাটতিও ছিল বেশ ভালো।

১৮৭৩-এ বাংলার সমাজজীবনকে আলোড়িত করেছিল তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর ব্যভিচারেব বৃত্তান্ত। সে ঘটনা নিয়ে যে কত বই লেখা হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে একটি বইয়ের (*এলোকেশী মহন্ত পাঁচালী*, নন্দলাল রায়) ১১টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। প্রত্যেক সংস্করণে ২০০০ কপি। কলকাতায় একইরকম আলোড়ন তুলেছিল উপেন্দ্র বসু ও তাঁর ভাগনি ক্ষেত্রমণির কেচ্ছা (১৮৭৮) এবং কুসুমকুমারীর হত্যাকাণ্ডের জেরে তিনকড়ি পালের ফাঁসি (১৮৮৫)। এইসব ব্যভিচারের বৃত্তান্ত রসিয়ে রসিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির করার মতো লেখক সেকালে কম ছিলেন না। এক শ্রেণির পাঠকও তার সমাদর কবতে কার্পণ্য করেননি।

হাওড়া থেকে রেল চলাচলের সূচনা (১৮৫৪), কলকাতায় ট্রাম (১৮৭৩), টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সূচনা, হাওড়া ব্রিজ (১৮৭৪), হাওড়া ব্রিজে আলো (১৮৭৯), বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ (১৮৯১) ইত্যাদির পাশাপাশি ১৮৭৫-এ কালীঘাটে চুরি, ১৮৯৭-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৮৯৯-এ কলকাতায় প্লেগ, টালা সরকারবাগানে হত্যাকাণ্ড, সোনাগাছিতে নারীহত্যা, শরতের বর্ষায় কলকাতায় বন্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাতেও সেকালের পাঠককুল আলস্য প্রকাশ করেননি। আর তাতে সমানে রসদ জুগিয়েছেন ভুঁইফোড় কিছু লেখক।

বটতলার বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্যের কোনো তুলনা নেই। মেসমেরিজম, গুপ্তবিদ্যা, গোপাল ভাঁড়, ধাঁধাঁ, ম্যাজিক, তাস-দাবা-পাশা খেলা, শিষ্টাচার-পদ্ধতি, দেশি ও বিলেতি আচার-ব্যবহার শিক্ষা, রবার স্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী, ব্যাবসা শিক্ষা, ব্যায়াম শিক্ষা, ঘড়ি-সারানো শিক্ষা, ফোটগ্রাফি-শিক্ষা, রাস্তা ও বাড়ি তৈরি শিক্ষা, আতসবাজি তৈরি শিক্ষা, শবদাহ পদ্ধতি, শুদ্ধভাবে নাম লেখার শিক্ষা, অদৃশ্যলিপিলিখন পদ্ধতি,

অপঘাত-মৃত্যু নিবারণ পদ্ধতি, প্ল্যানচেট শিক্ষা, চাকরি পাবার পদ্ধতি, ছাত্র-ঠকানো প্রশ্নোত্তর, আই কিউ টেস্ট, রেডি রেকনার, ক্যালকাটা স্ট্রিট গাইড, বেশ্যা গাইড, এমনকী 'অদ্ভুত জুয়াচুরি শিক্ষা'।

সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রধান শারদোৎসব। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে পুজো সাহিত্যের কাটতি চোখে পড়ার মতো। নকশা, কবিতা, গল্প, গদ্য ইত্যাদিতে শারদ উপচার সাজানো হত। বইগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা হত ৭ থেকে ৫৪, মুদ্রণসংখ্যা ১০০ থেকে ৩০০০, দাম ৩ পাই থেকে ৫ আনা পর্যন্ত।

এত রকম বইয়ের মধ্যে এক ধরনের বিলাপ-কাব্য বাজার জাঁকিয়ে বসেছিল। রাম-সীতা-থেকে শুরু করে বারবিলাসিনী বিলাপ পর্যন্ত যত রকম বিলাপ হওয়া সম্ভব, সবই ছিল। সব কাব্যগুলিকে করুণ রসের কাব্য মনে কবার কোনো কারণ নেই। কিছু কিছু বই আদতে ছিল জীবনীগ্রন্থ। চাহিদা ছিল বলেই ৫০০ থেকে ২৫০০ কপি ছাপানো হত এসব বই।

দিন যত এগিয়েছে, বাংলা বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্যও তত বেড়েছে। সে সময় ভালো বিক্রি হত রান্নাবান্নার বই। বিশ্বেশ্বর তর্কালংকারের *পাকরাজেশ্বর* বইটির চারটি সংস্করণ (১৮৩১-৭৯) প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের 'বেলা দে' বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় *পাকপ্রণালী* নামে একটি রান্নাবান্নার পত্রিকাই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। লিখেছেন হরেকরকম রান্নাবান্নার বই। তাঁর *মিষ্টান্নপাক* বইটি সেকালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ ছাড়া রান্নাবান্নার বই লিখে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল ঘোষ, শ্যামাচরণ হড়, রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র দাস প্রমুখ।

শতকের মাঝামাঝি দেখা গেল কৃষিবিদ্যার বই। সাধারণ কৃষিবিদ্যা, সবজি চাষের পদ্ধতি, মাছের চাষ, চা-শিল্প, ফল-ফুলের চাষ, রেশম শিল্প, আচার প্রস্তুত প্রণালী, জঞ্জালকে সার হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি নানা দিক নিয়ে বই লেখা হয়েছে। গড়ে ১০০০ কপি করে বইগুলি ছাপা হত। খুব একটা খারাপ বলা যাবে না।

চার

এবার আসি গানের কথায়। বাঙালি গানের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের ভুবনটি দেখেছে। মধ্যযুগের গান আধুনিক যুগে এসে যখন ছাপার অক্ষরে দেখা দিল, তখন তার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি বাড়ল কয়েকগুণ। শতক-সূচনায় খ্রিস্টধর্মের আগ্রাসী মনোভাব, হিন্দুধর্মের নানা পথ ও মতের আত্মরক্ষার তাগিদ এবং নতুন গড়ে ওঠা ব্রাহ্মধর্ম গানকে নিষ্ঠাভরে আশ্রয় করল। গান হয়ে উঠল ধর্মপ্রচারের বাহন। একের পর এক গীতসংকলন সেই কথাটি প্রমাণ করে। দিনে দিনে প্রচার যত বেড়েছে, সংকলনগ্রন্থগুলির আয়তনও পৃথুলাকৃতি হয়েছে। একটি বইয়ের উদাহরণ দিই। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)

বৈষ্ণবচন্দ্র বসাকের সঙ্গে ১৮৮৭-এর নভেম্বরে যুগ্মভাবে সংকলন করলেন *সঙ্গীত কল্পতরু*। ৪৭৯ পৃষ্ঠার বই। দাম দেড় টাকা। ২য় সংস্করণ ১৮৮৮-র মার্চে। দাম আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা ৫৮৪। ১১০০ কপি নিঃশেষিত হল চার মাসে। ৩য় সংস্করণ ওই বছর জুলাইয়ে ছাপা হল আরও ১০০০ কপি।

ধর্মমূলক গানের সংকলনের পাশাপাশি তখন বইয়ের বাজারে এসে গেছে থিয়েটারের গানের সংকলন। উনিশ শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৮১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের *বাল্মীকি প্রতিভা*, *কালমৃগয়া*, *প্রকৃতির প্রতিশোধ*, *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী*, *মায়ার খেলা*, *রাজা ও রাণী*, *বিসর্জন* প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক মহলে তিনি 'রবিবাবু' বলে পরিচিত হতে শুরু করেছেন। তাঁর নাটকের গানও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই কোনো কোনো থিয়েটারের গানের সংকলনে তাঁর গান দেখা গেল।

এ ছাড়া ছিল প্রেমের গানের অসংখ্য সংকলন। প্রেমের গানের উৎস হল সেকালের বাইজিরা। তখন তাঁদের নাম 'বেশ্যা'। বইগুলির নাম হত তাদেরই নামে। যেমন, *কলিকাতার বেশ্যাসঙ্গীত*, *খ্যামটা সঙ্গীত*, *প্রেম সঙ্গীত*, *সোহাগ সঙ্গীত* ইত্যাদি। এ ধরনের চটুল বইয়ের ক্রেতার সংখ্যা খুব কম ছিল না। বলা বাহুল্য, এসব বইয়ের মুদ্রক ও প্রকাশক সকলেই বটতলার। নামীদামি প্রেস বার করত মর্যাদাসম্পন্ন গানের বই। আর ছিল লোকগানের সংকলন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে দেখছি শতক-উপান্তে লোকগান সংকলনের ঢেউ।

উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে জাতীয়তাবাদী বা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানবাদী চিন্তাভাবনার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। আর ছিল আর্যবোধের উদ্দীপন। তার ছোঁয়া লেগেছিল গানের সংকলনেও। এ কারণে *ভারতগান*, *স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক সঙ্গীত*, *আর্য্যসঙ্গীত*, *জাতীয় সঙ্গীত* ধরনের বইয়ের বাহুল্য।

শুধু গানের বই নয়, হরেক রকম বাদ্যযন্ত্র শেখার বই, গান শেখার বইয়ের কাটতিও উল্লেখযোগ্য। গান-বাজনার বই ছাপা হত ৫০০ থেকে ২০০০ কপি পর্যন্ত। চটি বইয়ের দাম ? আনা থেকে ১ আনা ৬ পাই।

পাঁচ

উনিশ শতকে একটি বই বাঙালি দেখতে এবং পড়তে ভুল করত না। তার নাম পঞ্জিকা। কখনো-কখনো পঞ্জিকা ছিল বইয়ের পরিপূরক। বাঙালির জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম উৎস ছিল পঞ্জিকা। পঞ্জিকা সেকালের অন্যতম নির্দেশিকা, অন্যতম বার্তাবহ। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের হাতে লেখা পঞ্জিকার পরিবর্তে যখন ছাপানো পঞ্জিকা জনপ্রিয়তা পেল, তখন পঞ্জিকা-শিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠল অসংখ্য মানুষের অন্নসংস্থান। পঞ্জিকা ছাপা, সম্পাদনা ও বিক্রিতে যুক্ত হলেন বহু মানুষ। লং বলেছেন যেখানে বই পৌঁছোয়নি, সেখানেও পঞ্জিকা শোভা পেত। কারণ বাঙালি পান তামাকের মতোই

পঞ্জিকাকে অপরিহার্য মনে করত। তাঁর হিসেবমতে বছরে আড়াই লাখ পঞ্জিকা বিক্রি হত। ছাপার পরিমাণ ছিল ২০০০ থেকে ১২০০০ কপি। বিক্রির বাজারটা ভাবার মতো।

আজকের দিনে আমরা যাকে বলি 'কমার্শিয়াল আউটলুক', পঞ্জিকার দৃষ্টি সেদিকে প্রথমাবধি ছিল প্রখর। চিত্রশোভিত পঞ্জিকার ছবি ও অলংকরণের এমন এক বিশেষত্ব ছিল যাতে এক নজরেই তাকে পঞ্জিকার ছবি বলে চেনা যায়। দেবদেবীর ছবি দিয়ে শুরু করে ক্রমশ বিজ্ঞাপনের ছবি, পৌরাণিক-সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার ছবি, ব্যক্তির ছবি, ব্যঙ্গচিত্র, যানবাহন ইত্যাদির ছবিও যুক্ত হতে থাকে। পঞ্জিকা প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল তিথি, পর্ব, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ জানানো। কিন্তু জনগণেশের চাহিদা মেটাতে পঞ্জিকায় দেখা গেল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, আইন-আদালত সংক্রান্ত খবরাখবর, ছুটির তালিকা, ডাকমাশুল, নীতিকথা, প্রবাদ-প্রবচন, তীর্থস্থানের বিবরণ, টোটকা চিকিৎসা, টাইম টেবল—আরও কত কী।

পঞ্জিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা হত ১৭ থেকে ৩১২। সবচেয়ে দামি পঞ্জিকা ১৮২৫-এ ছাপা হয় বিশ্বনাথ দেবের প্রেস থেকে। দাম ১ টাকা। আর সবচেয়ে কম দামি পঞ্জিকা বার করেছিল গুপ্ত প্রেস এবং কলম্বিয়ান প্রেস ১৮৭১ সালে। দাম ৩ পাই। সাধারণত দাম হত ২ থেকে ৮ আনার মধ্যে। পঞ্জিকার বিক্রিবাটা এতটাই ভালো ছিল যে, একই প্রেস থেকে একাধিক পঞ্জিকা একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে, আবার একই ব্যক্তির সম্পাদনায় একাধিক পঞ্জিকা বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ম্যাজিক, তাবিজ-কবজ, সম্মোহন, গুপ্তবিদ্যা, গুপ্তরোগের ওষুধ বাতলানোর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকা আদিরসাত্মক বইয়ের খবরাখবরও জানাত। আদিরসাত্মক বইয়ের বিক্রিব সংবাদ দেওয়াব ব্যাপারে অনেকেরই উন্নাসিক মনোবৃত্তি কাজ করেছে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ এ ধরনের বই নথিভুক্ত প্রায় করেনি বলতে গেলে। অথচ গোপনে গোপনে এইসব বই যে ভালোই বিক্রি হত, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। লঙের হিসেবমতে ১৮৫৭ সালেই আদিরসাত্মক বই ১৪২৫০ কপি বিক্রির জন্য ছাপা হয়েছিল।

ছয়

পাঠ্য এবং পাঠ্য-বহির্ভূত বাংলা বইয়ের বিক্রি প্রসঙ্গে অবশ্যই আসে সাহিত্যের কথা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হতে পারে, সাহিত্যের বইয়ের কাটতি তখন সম্ভবত বেশ ভালোই ছিল। আসল ছবিটা কিন্তু একেবারেই উলটো। বটতলার সঙ্গে সেকালে নির্ভেজাল সাহিত্যসৃষ্টি বিক্রির দিক দিয়ে পাল্লা দিতে পারেনি। সাহিত্যের বইয়ের ছাপার পরিধি ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ কপি। *বিষবৃক্ষ, স্বর্ণলতা, জমিদার দর্পণ, বঙ্গ বিজেতা, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, স্বপ্নপ্রয়াণ. রাজসিংহ* ইত্যাদি বই প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি করে। পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও মুদ্রণসংখ্যা একই ছিল।

আবার *হিন্দুমেলার বিবরণ, কিঞ্চিৎ জলযোগ, সে কাল আর এ কাল, প্রণয়পরীক্ষা নাটক, কর্ণার্জুন কাব্য, অবসর সরোজিনী, আশা কানন, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মেজ বৌ* প্রথম সংস্করণে ৫০০ কপি করে ছাপা হয়েছিল।

তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের কাটতি সবক্ষেত্রে সমান নয়। যেমন, *দুর্গেশনন্দিনী*-র ৫ম, *কপালকুণ্ডলা*-র ৩য় ও *মৃণালিনী*-র ৩য় সংস্করণ ১৮৭৪-এ, *চন্দ্রশেখর*-এর ২য় সংস্করণ ১৮৮৪-তে প্রকাশিত হয়। *কপালকুণ্ডলা*-র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রকাশের চার বছর পর। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে *দেবী চৌধুরাণী*-র ৪র্থ সংস্করণ, *রজনী*-র ৩য় সংস্করণ ১৮৮৭-তে, *আনন্দমঠ*-এর ৪র্থ সংস্করণ ১৮৮৬-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যান্যদের মধ্যে মনোমোহন বসুর *রামাভিষেক নাটক* (১ম সং ১৮৬৭, ২য় সং ১৮৭০), *প্রণয়পরীক্ষা নাটক* (১ম সং ১৮৬৯, ২য় সং ১৮৭৫), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বৃত্র-সংহার* (১ম সং ১৮৭৫, ২য় সং ১৮৭৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পুরুবিক্রম* (১ম সং ১৮৭৪, ২য় সং ১৮৭৯) ইত্যাদি বইগুলি জনপ্রিয়তায় তেমন উঁচুতে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা করে কিছুটা বলতে হয়। ১৯০০-র মধ্যে ২য় সংস্করণ হয়েছে শুধুমাত্র *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮৬), *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৯২), *প্রভাত-সঙ্গীত* (১৮৯২), *কড়ি ও কোমল* (১৮৯৪), *রাজর্ষি* (১৮৯৯), *রাজা ও রাণী* (১৮৯৪), *বিসর্জন* (১৮৯৯), *মানসী* (১৮৯৩), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯৪), ও *গোড়ায় গলদ* (১৮৯৯) গ্রন্থের। ৩য় সংস্করণ বেরিয়েছে একমাত্র *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট* (২য় সং ১৮৮৭, ৩য় সং ১৮৯৪) উপন্যাসটির।

ছাপা হয়েছে ন্যূনতম ২২০ (*মানসী*), সর্বাধিক ২০৫০ (*নদী*) কপি। ২৫০ কপি ছাপা হয়েছে *কালমৃগয়া, সোনার তরী*-র; ৫০০ কপি *কবি-কাহিনী, কড়ি ও কোমল, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, কাহিনী*-র। এ ছাড়া *কণিকা* ৫৫০, *কথা* এবং *কল্পনা* ৬০০, *ক্ষণিকা* ৬৫০ কপি। দাম ন্যূনতম ৪ আনা (*বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, নলিনী, চিঠিপত্র*), সর্বাধিক ৫ টাকা (*চিত্রাঙ্গদা*)। কিন্তু ২য় সংস্করণ ১ টাকা। ৬ আনা দাম ছিল *কবি-কাহিনী, নদী, বৈকুণ্ঠের খাতা*-র। ৮ আনা *বনফুল, রুদ্রচণ্ড, প্রভাত-সঙ্গীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মায়ার খেলা, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, কণিকা* ইত্যাদি বইয়ের।

উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের দাম কেমন ছিল তা বোঝাতে কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম ও দাম উল্লেখ করছি। *হিন্দুমেলার বিবরণ* ৮ আনা, *কিঞ্চিৎ জলযোগ* ৬ আনা, *সেকালের দারোগার কাহিনী* (গিরিশচন্দ্র বসু) ১ টাকা, *জমিদার দর্পণ* ৮ আনা, *স্বপ্নপ্রয়াণ* ১ টাকা ৪ আনা, *পলাশীর যুদ্ধ* ১ টাকা ৪ আনা, *নীলদর্পণ* ১ টাকা, *প্রভাত চিন্তা* (কালীপ্রসন্ন ঘোষ) ১ টাকা, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস* ৮ আনা, *অশ্রুমতী* ১ টাকা ৮ আনা, *রাজসিংহ* ৮ আনা, *হঠাৎ নবাব* ৮ আনা, *কৃষ্ণচরিত্র* ১ টাকা ৮ আনা, *বোম্বাই চিত্র* (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৮৯) ৮ টাকা, *প্রফুল্ল* ১ টাকা ইত্যাদি।

সাহিত্যের বই ছাপানোর ক্ষেত্রে বাছবিচার ছিল। বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকের বই নির্দিষ্ট প্রেসে ছাপানো হত। দেখা গেছে হয়তো প্রেসটি তাঁরই মালিকানাধীন। যেমন বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রেস, রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা প্রেস, মনোমোহন বসুর মধ্যস্থ প্রেস, বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেস ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত সাহিত্যিকদের রচনা ছাপা হত ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ প্রেসগুলিতেই। ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। তবে তা অল্পই। যেমন, রবীন্দ্রনাথের *গল্পসল্প, বিচিত্র গল্প* (১/২), *কথা চতুষ্টয়* এবং *গল্প দশক* ছাপিয়েছে সাহিত্য প্রেস। সেকালের নামী প্রেস স্ট্যানহোপ ছাপাত নাম-করা সব সাহিত্যিকদের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের বই প্রথমে বঙ্গদর্শন প্রেস এবং পরে জনসন ও হেয়ার প্রেস থেকেও ছাপা হয়েছে।

সাত

বই লেখা আর পাঠকের হাতে তা পৌঁছোনো, এর মাঝে অনেক স্তর আছে। প্রথমেই প্রয়োজন টাকার। বই ছাপানোর টাকা কোনো লেখকের ছিল, কারো বা ছিল না। এগিয়ে এলেন কিছু মানুষ। এঁরা হলেন পৃষ্ঠপোষক। তখন পৃষ্ঠপোষক শুধু ব্যক্তি নন, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল অসহায় লেখকদের ভরসা। ব্যক্তিগতভাবে একক বা যৌথ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি বা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা দেখা গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, বিভিন্ন সভা-সমিতি, বর্ধমান রাজসভা এবং অন্যান্য অনেক রাজা-মহারাজা বাংলা বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা নানারকমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কখনো বই বেরোনোর আগেই কয়েকশো কপি কিনবেন বলে আগাম প্রতিশ্রুতি দিতেন অথবা বই বেরোনোর পর বেশ কিছু কপি কিনতেন। কখনো বই ছাপানোর পুরো খরচটাই দিতেন অথবা লেখকদের অর্থসাহায্য করতেন।

জেলায় জেলায় বিতরণের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরস্টারের অভিধান ১০০ কপি, মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধান ১০০ কপি, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকারের অভিধান ২০০ কপি কিনেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষও। বহু লেখককে অর্থসাহায্য করা ছাড়াও কলেজের জন্যও তাঁরা কয়েকশো কপি বই কিনতেন। *দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট* (১৮০৩) এবং নীলরত্ন হালদারের *বহুদর্শন* (১৮২৬) তাঁদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮০১-এ *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* লিখে রামরাম বসু এবং ১৮০২-এ *বত্রিশ সিংহাসন* লিখে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার পুরস্কারের প্রত্যাশায় কলেজের কাছে আবেদন করেন। তাঁরা পেলেন যথাক্রমে ৪০০ টাকা ও ২০০ টাকা। মৃত্যুঞ্জয়ের *প্রবোধচন্দ্রিকা*-র জন্য কেরি ৩০০ টাকা পুরস্কারের সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ বইটির

৫০ কপি কিনতে রাজি হন। কেরির সুপারিশেই কলেজ কাউন্সিল চণ্ডীচরণ মুনসিকে *তোতা ইতিহাস* রচনার জন্য নগদ ১০০ টাকা ও ১০০ কপি বই কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কলেজে ব্যবহারের জন্য তাঁরা আরও কিনেছিলেন *হিতোপদেশ* (গোলোকনাথ) ৮ টাকা করে ১০০ কপি, *পুরুষপরীক্ষা* (হরপ্রসাদ রায়) ১০ টাকা করে ১০০ কপি, *সদগুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস* (মার্শম্যান) ২ টাকা করে ৫০ কপি, *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (বিদ্যাসাগর) ৩ টাকা করে ১০০ কপি। লং মন্তব্য করেছেন যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত কেরির অভিধানের মতো বিখ্যাত বইও কখনো দিনের আলো দেখতে পেত না।

প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়েছে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির আমল থেকে। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ, স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৭ সালে। তাঁরা নিজেরা যেমন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তেমনই দেশীয় লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করতেও উৎসাহ জুগিয়েছেন। যদিও লং মন্তব্য করেছেন, সোসাইটি-প্রকাশিত বইয়ের দাম নাকি ন্যায্যমূল্যের দ্বিগুণ ধার্য করা হত। যা-ই হোক, সোসাইটি যে বহু বাংলা বই প্রকাশ করেছেন এবং অনেকগুলি বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮১৮ থেকে ১৮২১, এই চার বছরে সোসাইটি ৪৮৭৫০ কপি বাংলা বই এবং ২৮০০ কপি দ্বিভাষিক বই ছেপেছিলেন। আর ১৮১৮ থেকে ১৮৫৪, এই ক-বছরে বাংলা ভাষায় ৩,৬৩,৭৪৮ কপি ছেপেছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানটির (১৮১৭) মোট ৪০০ কপি বিতরণের জন্য তাঁরা কিনেছিলেন। আর কিনেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকারের *হিতোপদেশ*-এর ৫০ কপি। এ ছাড়া পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ৩টি বাংলা বইয়ের ৩১০০০ কপি এবং দ্বিভাষিক বইয়ের ১৫০০০ কপির।

স্কুল বুক সোসাইটির পর উল্লেখ করতে হয় ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির (১৮৫১) কথা। এই সোসাইটি যে শুধুমাত্র লেখকদের দিয়ে বই লিখিয়েছেন তা নয়, মৌলিক রচনায় উৎসাহ দেবার জন্য প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞান, আঞ্চলিক বিবরণ ও ভূগোল, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, সহজ ও ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, শিক্ষা, জীবনচরিত ও নীতিকাহিনির বিষয়ে মৌলিক রচনার জন্য ২০০ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। জমা পড়া দশটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুটি এই পুরস্কার লাভ করে। প্রথমটি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের *সুশীলার উপাখ্যান*, অপরটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মিনী উপাখ্যান*। ১৮৫৮ সালের মধ্যে তাঁরা মূলত অনুবাদগ্রন্থেরই প্রকাশ করেছেন। সোসাইটি তাঁদের অভিজ্ঞতায় বলেছেন, ভবিষ্যতে বই খুব সস্তায় প্রকাশ করতে হবে যাতে তা ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। উপরন্তু সেসব বই মনোরঞ্জক ও জনপ্রিয় হওয়া দরকার। কারণ গুরুগম্ভীর বিষয়ের বই বাজারে তেমন চলে না। সোসাইটির এই মন্তব্য আজও সমান সত্য। আর যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাঁরা

হলেন হিন্দু কলেজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, বর্ধমান রাজসভা ও কয়েকটি মিশনারি সোসাইটি।

মধ্যযুগে কবিরা কাব্য লিখতেন রাজা-মহারাজা কিংবা কোনো আমির ওমরাহের ছত্রছায়ায়। উনিশ শতকেও রাজা-মহারাজারা গুণগ্রাহিতায় আলস্য দেখাননি। এ বিষয়ে বর্ধমান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন ড. আবদুস সামাদ তাঁর *বর্ধমান রাজসভাশ্রিত সাহিত্য* গ্রন্থে। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু ধনী, সম্পন্ন, প্রতিপত্তিশালী মানুষ বা পণ্ডিত-শাসকের নাম। গ্রন্থের আখ্যাপত্র, ভূমিকা বা বিজ্ঞাপনে তাঁদের নাম লেখক যথোচিত শ্রদ্ধায় উল্লেখ করতেন। ব্যবহৃত হত 'অনুমত্যনুসারে', 'আদেশে', 'আনুকূল্যে', 'সহায়তায়' ইত্যাদি শব্দগুলি। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরেকও চোখে পড়ত। যেমন গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *আনবার সোহেলি*-র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 'এতন্মহানগরীয় পরমকারুণিক পরানুকম্পী সুধীর গভীর বুদ্ধি সদ্বিবেচক মহামান্য বদান্য ধন্যতম ইষ্ট পরায়ণ পরম যশস্বী দেশহিতৈষী সজ্জনানুরঞ্জক উদার কীর্ত্তিমান, মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ...।' ১৮৭৫-এ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের *সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত*-১ ছাপা হয় ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে। বইয়ের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখলেন: 'আমার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের চিন্তা কখনও হৃদয়ে উদয় হয় নাই।...ঢাকার সুবিখ্যাত ডিপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া, সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে...আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

কখনো একটি বইয়ের একাধিক পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া গেছে। যেমন, জ্ঞানচন্দ্র সিদ্ধান্ত শিরোমণির *হিতোপদেশ* গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক তিনজন—রাধামাধব শীল, রাধাগোবিন্দ শীল, মধুসূদন শীল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হিতোপদেশ* রচনায় 'অনুমতি' দিয়েছেন দুজন—শিবচন্দ্র রায় ও নৃসিংহচন্দ্র রায়। শিমুয়েল পির বক্স্ লিখেছিলেন *বিধবা বিরহ নাটক*। 'ভূমিকা'য় তিনি লিখেছেন: 'পরমহিতৈষী এবং মঙ্গলেচ্ছুক আমার একজন ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন, এবং কতিপয় দিবস হইল আমার প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। তিনি যে২ বিষয় একটি পুস্তক রচনা করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন...তাঁহার সেই আদেশানুসারে, সেই২ বিষয়ে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ ভাষায়...রচনা করিয়া ইহার নাম বিধবা বিরহ নাটক রাখিলাম।'

বিদেশিদের 'আদেশে', 'অভিপ্রায়ে' বা 'সহায়তায়' এদেশীয়রা অনেক বই লিখেছেন। বিদ্যাসাগর *বেতাল পঞ্চবিংশতি* লিখেছেন মার্শালের 'আদেশানুসারে', *কথামালা* লিখেছেন গর্ডন ইয়ং-এব 'অভিপ্রায়ানুসারে'। শ্যামাচরণ সরকার *বাংলা ব্যাকরণ* লিখেছেন বেথুনের 'অনুরোধে'। মুসলমান পৃষ্ঠপোষকের উদাহরণও আছে। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের *শব্দকল্পলতিকা*-র পৃষ্ঠপোষকতা করেন শ্রীমুন্সি মেনাজউদ্দিন, ভুবনমোহন মিত্র ও গোপাললাল মিত্রের *কৌতুকতরঙ্গিণী* বইযের 'আদেশ' দান করেন সেখ হৌসি জমাদার।

আট

বই প্রকাশের আগেই যিনি বই কেনার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি গ্রাহক। তখন আগাম টাকা নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না, টাকা ছাড়াই 'নাম সহি' দিতে হত। বই বেরোবার পর প্রথম প্রথম তাঁদের বাড়িতেই বই পাঠানো হত এবং গ্রাহকদের নাম কিছু কিছু বইয়ে ছাপাও হত। যেমন ফরস্টারের দ্বিভাষিক অভিধানে মুদ্রিত ২৭৫জন গ্রাহকের মধ্যে ৬জন বাঙালি। মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের অভিধানে ১৮৪জন গ্রাহকের মধ্যে বাঙালি ১৩জন। তখন গ্রাহক সংগ্রহের জন্য রীতিমতো 'অভিযান' চলত। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন তো আছেই, রাস্তার মোড়ে মোড়ে 'সহি দিউন' 'সহি দিউন' বলে হাঁকাহাঁকি। যিনি সই করবেন তাঁর জন্য রয়েছে কনসেশন। অর্থাৎ 'গ্রাহকমূল্য'। ১৮২১-এ ফেলিক্স কেরি ও রামকমল সেনের অভিধানের গ্রাহক চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে: 'যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন...সত্তরি টাকা লাগিবেক...।'

১৮২৭-এ আমড়াতলার বেণীমাধব দত্ত ১০ টাকা দামের ৮৬৮ পৃষ্ঠার *চৈতন্য চরিতামৃত* গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলেছেন: 'তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইব। গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া ঐ নিরূপিত মূল্য লওয়া যাইবেক।' ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবত* ছাপিয়েছেন ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে তুলট কাগজে। গ্রাহকমূল্য ৩২ টাকা, সাধারণ মূল্য ৫০ টাকা। আরও বলেছেন কলকাতা থেকে দশ ক্রোশের বেশি দূরে হলে বই পাঠানোর খরচ আলাদা। এখনকার ভাষায় 'ডাকমাশুল স্বতন্ত্র'। ডাকমাশুল গ্রাহকের থেকে আদায় করার প্রথম পরিকল্পনা সম্ভবত ভবানীচরণের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ ১৮২৭-এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনের আগে এমন বিজ্ঞাপন চোখে পড়েনি। ১৮৬৪ সালে ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *শব্দদীধিতি* অভিধানের বিজ্ঞাপনে বলেছেন : 'মূল্য স্বাক্ষরকারির প্রতি (ডাকমাশুল সমেত) ৩।৷৹ টাকা এবং বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ৪ টাকা। ...স্বাক্ষরকারিরা দুই মাসের মধ্যে পুস্তক গ্রহণ না করিলে বিনা স্বাক্ষরকারির মধ্যে গণনীয় হইবেন।' রামচন্দ্র চক্রবর্তীর *শূর জীবনী* (১৮৮১)-র বিজ্ঞাপন বেরোল *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায়। ঢাকা স্কুলের হেড মাস্টার কৃষ্ণদাস রায় লিখলেন: 'শূর জীবনী অর্থাৎ ইতিহাস প্রখ্যাত কতিপয় প্রধান২ যুদ্ধবীরের জীবনচরিত্র মুদ্রিত হইতেছে। অগ্রিম গ্রাহকের জন্য ১ রূপি ৮ আনা ও পশ্চাৎদেয় মূল্য ১ রূপি ১২ আনা নিরূপিত হইল। ২ মাস পর্যন্ত অগ্রীম মূল্য গৃহীত হইবে।'

কখনো কখনো একজনের বইয়ে অপর একজনের বইয়ের বিজ্ঞাপন থাকত। যেমন ১৮৬২ সালে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের *জ্যোতিষসার সংগ্রহ* বইয়ে গোপীনাথ শীলের *শব্দার্থ রত্নমালা*-র বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বইটি ছাপা হয় ১৮৬৫-তে।

প্রসন্নচন্দ্র গুহ *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ*-এ ১৮৬৯ সালে বিজ্ঞাপন দিলেন: 'অনেকে জ্ঞাত আছেন কলিকাতার বেশ্যাগণের জন্য ১৪ আইন জারি হওয়াতে সকল স্থানে তোলপাড়

হইতেছে। এতদুপলক্ষে তথায় 'বদমায়েস জব্দ' নামে একখানা গদ্য পদ্যময় (নাটক) মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৵ মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে /০ মাসুল প্রদান করিতে হইবে।'

কেবল বই নয়, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যেত। ১৮১৯-এ সংবাদ বেরোল: 'এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক আমারদের নিকট পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।' ১৮২৭-এ নবপঞ্জিকার বিজ্ঞাপন: '...১২৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক চন্দ্রিকা যন্ত্রে নির্ম্মিত পঞ্জিকা যে প্রকার হইয়া থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন...।' ১৮৩৮-এ পঞ্জিকার খবর: 'বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রে বর্ত্তমান বার্ষিকী যত পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদ্বন্মোদ মুদ্রাযন্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিত হয় তাহা অত্যুত্তমা হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহা২ লিখনের আবশ্যকতা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পঞ্জিকাতে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে...।'

ছাপার মান ও কাগজের মান সম্বন্ধে গ্রাহক বা ক্রেতাদের আশ্বস্ত করার জন্য 'উত্তম ছাপা ও বাঁধাই', 'উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা', 'অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে উত্তম কাগজে ছাপা', 'শ্রীরামপুরের কাগজ ও বিলায়তি মসীতে উত্তম দেবনাগর অক্ষরেতে ছাপা' ইত্যাদি বাক্যাংশগুলি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হত।

'বাজার' তৈরি বা পাঠক টানতে গেলে প্রথমেই আসে বইয়ের দামের কথা। 'বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি' বলে মুজতবা আলি মন্তব্য করলেও বইয়ের দাম দেখে বিমুখ পাঠককে সন্তুষ্ট করার জন্য সেকালেও কতই-না সাধ্যসাধনা চলেছে। পাঠকের হাতের নাগালে বইয়ের দাম কিছুটা হলেও এসেছে স্কুল বুক সোসাইটির সময় থেকে। যদিও সে সময় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাপা বহু বই, এমনকী মিশনারিদের বইয়ের দামও ছিল আকাশছোঁয়া। যেমন, *বিদ্যাহারাবলী* ১১২ টাকা, কেরির অভিধান ১২০ টাকা। এর পাশে রামকমলের অভিধান ৫০ টাকা, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকারের *মিতাক্ষরা* ১৬ টাকা ইত্যাদি।

দিন যত এগোতে লাগল, ছাপাখানার প্রসার ও প্রতিযোগিতার বাজারে বইয়ের দামও কমতে লাগল। ১৮২০ সালে ইংরেজি-বাংলা ব্যাকরণ বিক্রি হত ২ টাকায়। ১৮২৫ সালে নিকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত *বিদ্যাসুন্দর*-এর দাম ১ টাকা। আর ১৮৫৭-তে সেই *বিদ্যাসুন্দর* উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা হয়ে দাম দাঁড়াল ২ আনায়। ১৮২৫-এ *শিশুবোধ*-এর দাম ৮ আনা, ১৮৫৭-তে তার দাম হল ৩ পয়সা। বইয়ের দাম কমানোর ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল বটতলা। তখন যেন কম দামে ছাপানোর প্রতিযোগিতা চলছে। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন: 'বটতলা ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের দাম অসম্ভাবিত রকমে কমিয়া গিয়াছিল পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যে। ...বটতলার বই সর্বদা মুদ্রিত মূল্যের কমে বিক্রয় হইত।' তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্বীকার করে নিতে হবে।

বটতলার বইয়ে ছাপার গুণগত মান প্রায়শই রক্ষা করা হত না। উপরন্তু কপিরাইটহীন বই-ই বটতলায় ছাপা হত বেশি। অর্থাৎ লেখককে নিয়মিত টাকা দেওয়ার কোনো দায় প্রকাশকের ছিল না। ফলে তাদের পক্ষে বইয়ের দাম কম রাখা সম্ভব হত। লং মন্তব্য করেছেন: 'The new works published by the Natives are generally rather high-priced, when they are copy-right, as various natives now find the composing of books profitable and some authors draw a regular income from them.'

এর পর আসে 'কমিশন'-এর কথা। এখন প্রতি বইয়েই কমিশন পাওয়া যায়। তখন কয়েকটি বই একসঙ্গে কিনলে তবেই কমিশন দেওয়া হত। ঠিক কবে থেকে এই প্রথা চালু হয়, তা জানা যাচ্ছে না। ১৮৭১ সালে *এডুকেশন গেজেট*-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি স্কুল বুক সোসাইটির নিয়ম ছিল একসঙ্গে বেশি বই কিনলে শতকরা ১৫ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হত। গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই নিয়ম অনুসরণ করে গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *মাতৃশিক্ষা* বইয়ের বিজ্ঞাপনে বললেন: '৫ খান একত্র লইলে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১৫ টাকা শতকরা হিসাবে কমিশন।' বটতলাও একই পথ অনুসরণ করেছে।

একালের মতো সেকালেও আখ্যাপত্রে লেখকের আত্মপরিচয় দেবার চল ছিল। কারণ পাঠকের কাছে বই বিক্রির ক্ষেত্রে শুধু কমিশন নয়, লেখকের পরিচয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২১-এ রাধাকান্ত দেব *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ*-এ আত্মপরিচয় দিলেন: 'Radhacant Deb / A member of Committee, C.S.B.S., C.S.S. & H.C.' রাধাকান্ত দেবকে ডিঙিয়ে গেছেন তাঁরই সমসাময়িক রামকমল সেন। তাঁর দ্বিভাষিক অভিধানে (১৮৩৪) আত্মপরিচয় হল: 'Native Secretary to the Asiatick, and Agriculture and Horticulture Societies, Member A.S.A. & H.S. and M. & P.S. of Bengal'. ১৮৫২-তে মধুসূদন মল্লিকের পরিচয়: 'A Teacher of the School Society School'. ১৮৬২-তে 'জেলা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার' লিখেছেন *জীবতত্ত্ব*। ১৮৬৬-তে *হাইকোর্ট আদালত কর্তৃক করসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার* লিখলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় সভার বর্তমান অনুবাদক' নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল গদ্যে নয়, পদ্যেও আত্মপরিচয় দিয়েছেন কোনো কোনো লেখক। যেমন *শব্দসিন্ধু*-র (প্রথম সং ১৮০৯) গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়েছেন পদ্যে:

উত্তরপাড়া গ্রামবাসী বিপ্রবংশে জাত।
অকিঞ্চন পীতাম্বর মুখুটীতে খ্যাত॥...
সুরগুরু তুল্য বুদ্ধি স্থিতি দিবা গ্রাম।
শ্রীতর্কভূষণে খ্যাত চণ্ডীবর নাম॥

তথা মম তাতানুজ বাস নিজ ধাম।
খ্যাত বিদ্যাভূষণে শ্রীযুত শিবরাম॥

লেখক যদি আত্মপরিচয় দিতে পারেন, তবে প্রকাশকই বা নন কেন? সে উদাহরণও আছে। ১৮৫৫-তে চণ্ডীচরণের *তোতা ইতিহাস*-কে সংশোধন করে *শুকোপাখ্যান* নামে প্রকাশ করেছিলেন দ্বারকানাথ রায়। বইটির প্রকাশকও আত্মপরিচয় দিয়েছেন পদ্যে।

ক্রেতার কাছে বইয়ের ওজন ভারী করার জন্য সেকালে বইয়ের আখ্যাপত্রে বাংলা প্রবাদ বা সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া হত। পঞ্জিকার আখ্যানপত্রেও সংস্কৃত শ্লোক দেখা যায়। হালেদ তাঁর বাংলা ব্যাকরণের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেছিলেন। উইলিয়াম মর্টনও ১৮২৮-এ তাঁর অভিধানের আখ্যাপত্রে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন।

অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥

একই উদ্ধৃতি দিয়েছেন *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*-সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য তাঁর *শব্দাম্বুধি*-র আখ্যাপত্রে। এই প্রবণতা দেখা গেছে মধুসূদন দত্তের মধ্যেও। *একেই কি বলে সভ্যতা*-র আখ্যাপত্রে *কিরাতার্জুনীয়* থেকে উদ্ধার করেছেন: 'ন প্রিয়ং প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষাঃ হিতৈষিণঃ'।

ইংরেজদের লেখা বইয়ে অবশ্য অন্য কথা লেখা থাকত: 'conceal if you come to an error, cast not reproach, for no mortal can be free from fault.' ১৮৪১-এ মুনসি দেবীপ্রসাদ রায় এর অনুসরণে আখ্যাপত্রে লিখলেন: 'Whenever there shall occur an omission or error, cover it with the mantle of generosity, and hold the pen of correction running over it.' ১৮৬৬-তে নবীনচন্দ্র দত্ত *খগোল বিবরণ*-এর আখ্যাপত্রে লিখেছেন: 'The heavens declare the glory of God; and the firmament / sheweth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night / unto night sheweth knowledge.'

আত্মপরিচয় দিতে ইংরেজরাও পিছিয়ে ছিলেন না। উইলিয়াম কেরি তাঁর পরিচয় দিতেন 'Professor of the Sungskrita, and Bengalee Languages, in the College of Fort William' বলে। ফরস্টার লিখেছেন 'Senior Merchant on the Bengal Establishment' আত্মপরিচয় হিসেবে। গ্রেভ্স্ হ্টন্-এর পরিচয় : 'KNT., K.H., M.A., F.R.S., M.R.A.S., R.T.A. etc.'। এইচ. এইচ. উইলসন নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন: 'M.A., F.R.S., Librarian to the East India Company, and Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford, etc., etc., etc.'

সেকালে বাংলা বইয়ের নামপত্রে লেখকের আরাধ্য দেব-দেবীর নাম শিরোধার্য করা হত। ধর্মীয় বই তো বটেই, সাধারণ বই, এমনকী রসায়ন শাস্ত্রের বইয়ের নামপত্রেও দেব-দেবীর উল্লেখ দেখা গেছে। 'শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ জীউ চরণভরসা', 'শ্রীশ্রী হরি শরণং', 'শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং', 'শ্রীশ্রী জগদীশ্বরায় নমঃ', 'গুরবে নমঃ', 'শ্রীশ্রী আদি পুরুষায় নমঃ', 'পরমেশ্বরো', ইত্যাদি স্তববাক্য বিভিন্ন বইয়ের নামপত্রে লেখা থাকত।

আজ যাকে আমরা 'ভূমিকা' বা 'নিবেদন' অংশ বলে জানি, একসময় তার নাম ছিল 'বিজ্ঞাপন'। বাংলা বইয়ের সূচনাপর্বে এই বিজ্ঞাপন অংশটুকু থাকত না। বইয়ের আখ্যাপত্রটি হত দীর্ঘ। সেখানেই লেখক মোটামুটিভাবে বইয়ের উদ্দেশ্যটি বলে নিতেন। যেমন, ১৮০৩-এ তারিণীচরণ মিত্র *দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট* গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বলেছেন: *THE / ORIENTAL FABULIST / OR / POLYGLOT TRANSLATIONS / OF / ESOP'S AND OTHER / ANCIENT FABLES / FROM / THE ENGLISH LANGUAGE, / INTO / HINDOOSTANEE, PERSIAN, ARABIC, / BRIF B,HAK,HA BONGLA, / AND / SUNSKRIT, / IN THE / ROMAN CHARACTER, / BY / VARIOUS HANDS / UNDER / THE DIRECTION AND SUPERINTENDENCE / OF / JOHN GILCHRIST, / FOR THE USE OF / THE COLLEGE OF FORT WILLIAM.* ঠিক কবে থেকে পৃথকভাবে 'বিজ্ঞাপন' বইয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে, সব বই হাতে না পাওয়ায় তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে দেখছি *হিতোপদেশ* (১৮২৩) গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: 'এই গ্রন্থ মতে কর্ম্ম করিলে লোকের ইহকালে ও পরকালে কোন দোষ স্পর্শে না...।' গৌরমোহন বিদ্যালংকার *কবিতামৃতকূপ* (১৮২৬) বইতে লিখেছেন: 'বালক সকলের জ্ঞান সুনীতি বৃদ্ধির কারণ'। কেউ বলেছেন তাঁরা 'অতি সরল ভাষায়' বা 'অতি কোমল ভাষায়' বা 'অতি প্রাঞ্জল ভাষায়' বিষয়টি বর্ণনা করেছেন যাতে পাঠক প্রথমেই বিমুখ না হন।

১৮৪৭-এ যখন বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি* প্রকাশিত হয়, তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়ানো হত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের *হিতোপদেশ*। নিজের বইকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্য করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করে বসলেন: 'কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের প্রথম পাঠার্থে বাঙ্গালা ভাষায় হিতোপদেশ নামে যে পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল তাহার রচনা অতি কদর্য্য বিশেষতঃ কোন কোন অংশ এমত দুরূহ ও অসংলগ্ন যে কোনক্রমেই অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হইবার বিষয় নহে।' মৃত্যুঞ্জয়ের সৌভাগ্য যে, তিনি তাঁর এই হেনস্তা দেখে যাননি।

১৮৭৯-এ একজন প্রাইমার রচয়িতা মুখবন্ধে বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য হল শিশুদের শিক্ষার ব্যয়ভার কমানো। সাধারণত শিশুদের একটি প্রাইমারের অনেকগুলি করে কপি দরকার হয়। কারণ তারা তাড়াতাড়ি বই ছিঁড়ে ফেলে। সেসব বইয়ের দামও এক আনার কম নয়। সেজন্য তিনি আট পাতার এই বইয়ের দাম রেখেছেন মাত্র তিন পাই। আবার আর একজন প্রাইমার রচয়িতা দেখেছিলেন শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা অনুযায়ী

একটাও প্রাইমার বাংলাদেশে নেই। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে প্রাইমার সহজে পাওয়া যায় না। সে কারণেই তিনি প্রাইমার লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন।

মনোরম্য পাঠ-১-এর (১৮৫৫) ভূমিকায় রামচন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে।...ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অনুপ্রাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই।' 'চলিত ভাষা'র একটু নমুনা শুনুন: 'একদা মেসিদোনিয়া দেশস্থ কোন সেনা সেকেন্দর শাহ ভূপতির ব্যবহারার্থে একভার কাঞ্চন একটা অশ্বতরীর পৃষ্ঠে দিয়া ঐ রাজসন্নিধানে লইয়া যাইতেছিল। সে পথিমধ্যে ঐ খচ্চরীকে অতিশয় ভারাক্রান্ত ও চলিতে অসমর্থ দেখিয়া স্বর্ণভার স্বয়ং মস্তকোপরি ধারণপূর্ব্বক অতি ক্লেশে অনেক দূর লইয়া গেল।'

এবাব একটি বইয়ের স্বাদে-গন্ধে সম্পূর্ণ আলাদা উপক্রমণিকার কিছুটা উদ্ধার করছি। শেখ আবদোস্ সোবহান ১৮৯১-এ লিখেছিলেন প্রবন্ধগ্রন্থ *হিন্দু মোসলমান*-১। ১ টাকা ৪ আনা দামেব বইটি ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি। তিনি লিখছেন 'উপস্থিত পুস্তকের ৫ম ফর্ম্মা (৬০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) ঢাকা ভাবত বান্ধব যন্ত্রে ও স্বাবস্বত [সারস্বত] প্রেসে ছাপা হইয়াছে। প্রেস অধ্যক্ষদের অসদ্ব্যবহারে অবশিষ্ট ১১শ ফর্ম্মা কলিকাতায় মুদ্রিত হইল। ইহাতে আমি যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।'

নয়

পাঠককে বইয়ের কথা জানাতে, বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট কবতে চাই প্রচাব। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন। সেকালেও সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অথবা প্রকাশিতব্য বইয়ের বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হত। তবে সেকালের বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল কিছুটা পৃথক। বইয়ের নাম-দাম, লেখক-নাম ছাড়াও থাকত গ্রন্থরচনার উপাদান পরিচিতি, গ্রন্থটি পাঠের উপকারিতা, ছাপার মান, কাগজের মান, বাঁধাই-এর মান, গ্রাহকমূল্য, সাধারণ মূল্য এবং প্রাপ্তিস্থান। সবচেয়ে পুরোনো যে-বিজ্ঞাপনটি আমাদের চোখে পড়েছে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯২ সালের ১৯ মার্চ *ক্যালকাটা ক্রনিকল* পত্রিকায়। বইটি আপজনের দ্বিভাষিক অভিধান। ছাপা হয় ক্রনিকল প্রেসে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়: 'ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারন এক বহি অতি সিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেব লোকে বাঙ্গালা কথা সিখিবেক...জে২ লোকে চাহে তাহারা মোং আবজান সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি'।

১৮১৯-এ রামকমল সেনের *ঔষধসারসংগ্রহ* বইয়ের বিজ্ঞাপনে বলা হল: '...এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে।' ১৮২১-এর ২ জুন *সমাচার দর্পণ*-এ *মুগ্ধবোধ কৌমুদী*-র কৌতুকপ্রদ বিজ্ঞাপন দিলেন লেখক কাশীনাথ শর্মা নিজেই: 'এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে

অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান।' লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালংকারের *মিতাক্ষরা* বইয়ের বিজ্ঞাপনের বয়ান: 'এই গ্রন্থ বড় উপকারী'।

উনিশ শতকে বাংলা বই সংবাদ-সাময়িকপত্র থেকেও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন যেমন বেরোত, তেমনই সংবাদ-সাময়িকপত্রে নিয়মিত খবর থাকত কোন কোন প্রেসে কী কী বই এ বছর ছাপা হয়েছে, কটা বই প্রেসে আছে, গত বছর বা গত কয়েক বছরে কত বই ছাপা হয়েছে ইত্যাদি। মাঝে মাঝে বেরোত বইয়ের প্রাপ্তি সংবাদ। সেই সঙ্গে বই সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা। সে আলোচনাও বিজ্ঞাপনের কাজ করত। যেমন, ১৮৬০-এ ঢাকার বাঙ্গালা যন্ত্রে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ নাটক*। ১২.১১.১৮৬০-এ *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় লেখা হল: 'নীলদর্পণ নাটক—এই গ্রন্থে নীলকরদিগের অত্যাচার সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। যদ্যপি ইহাতে বিশেষ কোন চাতুর্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু গ্রন্থকারের সহৃদয়তা নিবন্ধন এতৎপাঠে পাঠকেরা কথঞ্চিৎ তুষ্টিলাভ করিতে পারেন, স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ না ঘটিলে নাটকখানি উৎকৃষ্ট হইত। গ্রন্থকর্তা আপন নাম প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম না।' সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমালোচনাকে 'নিরপেক্ষ' বলা যায় না কি?

১৮৮৪-তে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস *বীরাঙ্গনা* সম্পর্কে *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় (২২.৬.১৮৮৪) বলা হল: 'আজকাল...সন্নীতিমূলক, সুরুচিপূর্ণ উপন্যাসের নিতান্ত প্রয়োজন। ...বীরাঙ্গনা(য়) এই প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্র না হইলেও অনেক স্থলেই অবস্থোচিত হইয়াছে। গ্রন্থে কবিত্ব বা কল্পনার বিকাশ অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সন্নীতিসূচক যুক্তিপূর্ণ অনেক কথা আছে। আজকাল এদেশে এইরূপ সুরুচিমূলক গ্রন্থ বহুল প্রচার হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। গ্রন্থকারে(র) যত্ন ও মনোযোগের ক্রটিতে দাড়ি, কমা, আদি চিহ্ন সর্ব্বত্র যথাস্থানে না হওয়ায় এবং অনেক স্থলে মুদ্রাঙ্কনের ক্রটিতে পাঠের অসুবিধা হইয়াছে।'

কায়কোবাদের কাব্যগ্রন্থ *অশ্রুমালা* (১৮৯৬) সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন লিখলেন: 'জাতিভেদে সকলই ভিন্ন হইতে পারে, অশ্রু অভিন্ন। যাহার অশ্রু আছে, তাহার কবিত্ব আছে।...আপনার কাব্যখানির স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে।...যে দিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গ ভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সে দিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ দেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়, আপনার *অশ্রুমালা* তাহার প্রভাত শিশির-মালা স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।' (২.৬.১৮৯৬)

এবার আসি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায়। কৈলাসবাসিনী দেবীর (গুপ্ত) বিখ্যাত বই *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*। সে বইয়ের বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম

দেওয়া হল না। *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় (১৮৬৩) তার পরিবর্তে লেখা হল: 'জনেক (জনৈক) বিদ্যাবতী হিন্দু স্ত্রী প্রণীত'। ১৯.১.১৮৬৩ এবং ২৬.১.১৮৬৩-তে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন একটি বিজ্ঞাপনে জানালেন: '১৮৬৪-র এন্ট্রেন্সের নিমিত্ত মুদ্রারাক্ষস পুনঃশোধিত হইয়া কলিকাতা মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ১ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।...প্রত্যেক পাঁচখানার ওজন এক সের।'

এমন বিজ্ঞাপন সেকালে আরও দেখা গেছে যেখানে রচয়িতা বা রচয়িত্রীর নাম সরাসরি নেই। তাঁর অপর কোনো বইয়ের নাম উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। যেমন, *নীহারিকা* কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন প্রসন্নময়ী দেবী। তাঁর *আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হল: 'শ্রীমতী "নীহারিকা" রচয়িত্রী প্রণীত'। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটি অন্য একটি কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *সঞ্জীবনী* পত্রিকায় বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। প্রশংসিত সমালোচনার অংশটুকু ১৮৯১ সালে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 'গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের রমণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন, আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভাষার লালিত্যে পাঠকদিগকেও সেই সৌন্দর্য্য উপভোগে অধিকারী করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ইটোয়া, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিস্ময়কর কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পদার্থসমূহের উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় চক্ষের সম্মুখে বর্ণনীয় বিষয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক এক স্থান পড়িয়া শরীর রোমাঞ্চিত হয়।'

কালীপ্রসন্ন ঘোষের *নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থের প্রকাশক অনাথবন্ধু মৌলিক *ঢাকাপ্রকাশ*-এ ১৮৬৯ সালে বিজ্ঞাপন দিলেন:

> নারীজাতির মঙ্গল এবং উন্নতির সহিত সমুদায় মানবজাতির মঙ্গল এবং উন্নতি কিরূপ সংসৃষ্ট রহিয়াছে, এবং সমাজের নারীভাগ কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতি লাভ করিয়া পৃথিবীর নানা দুর্গতি বিদূরিত এবং মুখচ্ছবি পরিশোধিত করিতে পারে, তাহা বহুল ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং যুক্তিসহকারে এই পুস্তকখানিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সরোজকামিনী দেবীর *বনবালা* কাব্যের প্রকাশক মণিলাল দাস *সংবাদ প্রভাকর*-এ (১৮৯২) বইটির গুণপনা ব্যাখ্যা করে বললেন:

> অনেকেই অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া বনবালা পুস্তকখানি একবার পাঠ করুন।...ইহার বিশেষ গুণ, পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুস্তক শেষ না হইলে উঠিতে ইচ্ছা হইবে না।

হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকায় ১৮৯৯-এর ১৩ ডিসেম্বর *বিষাদ সংবাদ* গ্রন্থের বিজ্ঞাপন:

> পুঠিয়া স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র দাস প্রণীত। ভাষা প্রাঞ্জল, পড়িতে বসিলে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। তমোঘ্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মানকুমারী দেবী ছিলেন *বামাবোধিনী পত্রিকা*-র নিয়মিত লেখিকা। তাঁর *কাব্য কুসুমাঞ্জলি*-র বিজ্ঞাপনে ওই পত্রিকায় (১৮৯৪) আশুতোষ ঘোষ বললেন: 'বামাবোধিনীর সুপরিচিতা লেখিকা মা'র (মানকুমারীর) কবি প্রতিভা, গভীর ধৰ্ম্মভাব ও উদার চিন্তার পরিচয় প্রতি কবিতায় লক্ষিত হইবে। ইহা রমণীমাত্রেরই বিশেষ পাঠ্য।'

বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আমাদের চোখে পড়ে দীর্ঘশ্বাসমোচনকারী এক বিজ্ঞাপন। এটি *এডুকেশন গেজেট*-এ বেরিয়েছিল ১৮৭৪ সালে।

> **মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুস্তক নিলাম**
>
> কবিবর ঁমাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে বন্ধকীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা এক্‌স্‌চেঞ্জহালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

এবার বলি বইয়ের দোকানের একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের কথা। প্রকাশিত হয়েছিল *ঢাকাপ্রকাশ*-এ ৪ এপ্রিল ১৮৮০ সালে (২৩ চৈত্র ১২৮৬)। বিজ্ঞাপনদাতার নাম মতিলাল চক্রবর্তী।

> **পূর্ব্ব বাঙ্গালা পুস্তকালয়**
> **ব্যবহারেই না জানা যায়?**
>
> আমার পুস্তকালয় প্রায় দ্বাদশ বৎসর যাবৎ সংস্থাপিত। ঈশ্বর কৃপায় বিদ্বেষ, অসূয়া, ষড়যন্ত্র ও নানা রূপ বিঘ্নবিপত্তি প্রভৃতি বাধা ইহাকে কখনই সংস্পর্শ করিতে পারে নাই। এ দীর্ঘকাল যাবত যাঁহাদের সহিত আমার কারবার চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের সকলেই জানেন যে আমার যাবতীয় কার্য্য অতীব পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও ছলনাপরিশূন্য। যদি কেহ কোন কারণে আমাদের ব্যবসায়ের অবস্থা জানিতে অভিলাষ করেন, তবে কলিকাতা থ্যাকার কোম্পানীর ক্লার্ক বাবু নন্দলাল দে, স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপোজিটারি, রায়

> প্রেস, শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় অতি প্রসিদ্ধ যাবতীয় পুস্তকালয় নিকট অনুসন্ধান করিলেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন। কেবল লোক বিরাগ ভয়ে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সহস্র ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না।
>
> বিশেষতর এখানে নানাবিধ ব্যবহার্য্য ইংরেজী, বাংলা সংস্কৃত পুস্তক পাওযা যায় এবং বিদেশীয়রা মনি অর্ডার, নোট, ও টিকিট প্রভৃতি দ্বারা কারবার করিয়া আসিতেছে এবং প্রায় গ্রন্থকারই আপন আপন পুস্তক গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেছেন।

এতক্ষণ আমরা নানা রকম বিজ্ঞাপন ও তার বৈচিত্র্য দেখেছি। সেকালে সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞাপন নিয়েও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। সাময়িকপত্রের পাঠক বিজ্ঞাপন চেয়েছেন: '...এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিকা কি রাধার সহস্র নাম তাহার একটাও না ছাড়েন। ...ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। ..ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে।'

বিজ্ঞাপনের সুফলে হোক বা না হোক, বাঙালির বই কেনার অভ্যাস গড়ে উঠছিল। কারণ ছাপা বই বাঙালির কাছে তখন এক নতুন জগৎ, নতুন নেশা। বাংলা বইয়ের ক্রমবর্ধমান কদর সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও আলোচিত হয়। ১৮১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে *সমাচার দর্পণ*-এর পৃষ্ঠায় লেখা হল.

> এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় সকল ঘর ব্যাপ্ত হইতেছে।
>
> গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

১৮৩০-এ *সমাচার দর্পণ* মন্তব্য করেছে: ' ..ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে।'

সমাচাব দর্পণ বলেছে ১৮২৯-এ 'বাঙ্গলা ভাষায় ছোট বড় ৩৭ খান পুস্তক হয়'। কিন্তু দিন দ্রুত বদলাল। লঙের হিসেবমতে ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭-র মধ্যে অন্তত ৮০ লাখ বাংলা বইয়ের কপি ছাপা ও বিক্রি হয়েছে। ছাপাখানার মানও উন্নততব হওয়ায় অধিকাংশ বাংলা বই-ই ছাপা হচ্ছে উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুস্পষ্ট হরফে। ১৮৫৭ সালে

কলকাতায় ৪৬টি প্রেস বই ছাপিয়ে চলেছে। সবার আগে সংস্কৃত প্রেস। একাই ছাপিয়েছে ৮৪২২০ কপি। এর পর যথাক্রমে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস (৫৫০০০), চৈতন্য চন্দ্রোদয় (৪৭০০০), বিদ্যারত্ন-আহিরিটোলা (৩৮০০০), সুধানিধি (২৭০০০) ইত্যাদি। বিক্রির জন্য বাংলা বই ১৮৫৩ সালে ছিল ৩ লাখ কপির কিছু বেশি। ১৮৫৭-তে তা গিয়ে দাঁড়ায় পৌনে ৬ লাখ কপিতে।

দশ

বই বিক্রি যত বাড়ছিল পাঠক বা ক্রেতাকে মাঝে মধ্যে প্রতারণা করার ঘটনাও ঘটছিল। তখন স্কুল বুক সোসাইটির বইয়ের বিক্রি ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁদের প্রকাশনা ছাপা, কাগজ, বিষয়বস্তু সব দিকেই ছিল উন্নত। বইয়ের আখ্যাপত্রে দেওয়া হত তাঁদের শিলমোহর। শিলমোহরটি পাঠকের চোখে লেগে রইল। সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে কোনো কোনো ছাপাখানা নিজেদের শিলমোহরটিকেও সোসাইটির অনুকরণে বানিয়ে ফেললেন; যাতে পাঠক বা ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়ে বইটি কেনেন। যেমন, ক্যালকাটা জ্ঞানরত্নাকর প্রেস (C.G R.P.) এবং ক্যালকাটা তিমিরারি প্রেস (C T.R.P.)। খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলে তবেই এই দুই শিলমোহরের সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির শিলমোহরের পার্থক্য ধরা পড়ে। পাঠককে প্রতারণা ছাড়া এটি আর কী?

শুধু শিলমোহর নয়, প্রতারণা ঘটছিল বইয়ের নামের ক্ষেত্রেও। যখন যে বই 'হিট' করছে, সে বইয়ের নামে আর একজন বই লিখে ফেলছেন। যেমন মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের পর বহু মানুষ *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়* লিখেছেন। পার্থক্য বলতে শুধু এ দুটি নামের আগে 'নব', 'নূতন', 'সহজ', 'সরল', 'সমুদয়' শব্দ জুড়ে দেওয়া হত। বইয়ের বাজার ধরার লক্ষ্য যে এর পিছনে কাজ করত তা লেখাই বাহুল্য। তবে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন গৌরচন্দ্র দাস। তিনি ১৯০০-র অক্টোবরে প্রকাশ করেছিলেন মদনমোহন তর্কালংকার রচিত *শিশুশিক্ষা*-৪। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের অবস্থা আরও করুণ। তখন সবে *বর্ণপরিচয়*-১-এর ১৫০তম সংস্করণ বেরিয়েছে। সে বছর (১৮৮৯) ডিসেম্বর মাসে *অনুসন্ধান* পত্রিকা জানাল:

> ৫ নং জুয়াচোর। শুনিতে পাই, দেখি নাই। উদাহরণ—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বহুসংখ্যক বিক্রীত হয়। জুয়াচোর গ্রন্থকারও বর্ণপরিচয় ছাপাইল। মলাটে লেখা হইল—
>
> **বর্ণপরিচয়**
>
> **প্রথম ভাগ**
>
> **শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**
>
> মহাশয়ের চরণকমল স্মরণ করিয়া প্রণীত
>
> 'মহাশয়ের পদকমলটী' অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত। এমনকী অণুবীক্ষণ

লইয়া দেখিতে হয়। অবোধ পাঠক বুঝে, এ গ্রন্থ বুঝি স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

১৮২৯ সালের একটি প্রতারণার ঘটনার কথা উদ্ধার করি *সমাচার দর্পণ* থেকে। এটি অবশ্য একজনের বই আর একজনের ছাপানো নিয়ে বিবাদ।

> চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশপত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে...তিনি চন্দ্রকান্ত নামক পুস্তক কোন ব্যক্তির অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত কারতে উদ্যোগ করিতেছেন অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে, ঐ পুস্তক আমারদিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয় হয় নাই যদ্যপি তিনি ঐ চন্দ্রকান্ত পুস্তক পুনর্ব্বার ছাপা করেন তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের বিক্রয়ের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ে যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন...।

সাতদিনের মধ্যেই এর প্রত্যুত্তর বেরোল *সম্বাদ তিমিরনাশক* পত্রিকায়।

> চন্দ্রকান্তনামক গ্রন্থ তৃতীয়বার হইবার অন্তে কোন ব্যক্তি উত্তম কাগজ দিয়া নূতন হরপে উত্তম করিয়া ছাপাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা কোন ব্যক্তির শৈর্য্যেদ্বারা অধৈর্য্য হইয়া আইন দর্শাইয়া স্বগুণ প্রকাশ কবিয়াছেন...কিন্তু যে ব্যক্তির অনুমতিঅনুসারে ছাপিতে আরম্ভ করিতেছি তিনি ঐ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন...।

এমনই ঘটনা ঘটল মদনমোহন তর্কালংকারের বইয়ের ক্ষেত্রে। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর। বহরমপুর নিবাসী রামদাস সেন ১৯.১.১৮৬৩ (৩ মাঘ ১২৬৯) *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় মদনমোহনের *বাসবদত্তা* বইয়ের পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিলেন:

> কবিবর ঁমদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত পদ্যময় উক্ত উৎকৃষ্ট কাব্য অতি উত্তমরূপে পুনর্মুদ্রিত করা হইতেছে, অচিরে প্রকাশিত হইবেক

> যাঁহার আবশ্যক হয় তিনি স্বীয় নাম স্বাক্ষরপূর্ব্বক বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলে পুস্তক সত্বর প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

পরের মাসে (৯ ফাল্গুন ১২৬৯) কুমিল্লা নিবাসী রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন বেরোল একই পত্রিকায়। তিনি লিখলেন:

> মৃত মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা গ্রন্থ কেহ ছাপাইতে পারিবেন না কারণ তদীয় পিতৃব্য ঁরামরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উক্ত পুস্তক তিনি দান করিয়াছেন। তৎসূত্রে আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান আছি। আমরা ভিন্ন বাসবদত্তার দান বিক্রয়ের সত্ত্বাধিকার অন্য কাহারও নাই। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয় শিথিল প্রযত্ন হউন এই আমাদিগের অনুরোধ।

রামদাস সেন এর উত্তর দিলেন ২১ ফাল্গুন ১২৬৯-এ।

> মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু.
>
> সবিনয় নিবেদন—
>
> কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত (বাসবদত্তা) অতি উত্তম গ্রন্থ বলিয়া আমার কতিপয় বন্ধু কহিয়াছিলেন যে উক্ত পুস্তক লেখকের মৃত্যু হইয়াছে, গ্রন্থকারের পুত্রাদিও কেহ নাই, আত্মীয়গণ যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত উহা মুদ্রিত করিলেন না, অতএব আপনি ঐ বহি সাহিত্য সংসারের উপকারার্থে পুনর্ব্বার ছাপাইতে পারেন, ইহাতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। আমি তাঁহাদিগের এই অনুরোধেই পুস্তক ছাপাইতে দি। ঐ পুস্তক ৫০০ শত খণ্ড মুদ্রাঙ্কনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছি ও উহার ছাপা প্রায় শেষ হইল। আমার সর্ব্ব সমেত ঐ পুস্তকের কারণ ২৪৮।।০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আপনারা আমাকে ঐ ব্যয় প্রদান করিলে সমুদয় মুদ্রিত পুস্তক আপনাদিগের নামে সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সমীপে পাঠাইব, তাহার পর আপনারা পুস্তক বিক্রয়ে যে লাভ হইবেক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন কিম্বা আপনারা যদি ঐ পুস্তকের স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি, ইহা বিদিতার্থে নিবেদনমিতি—

বই ব্যাবসায় আরও একটি প্রতারণার ঘটনা ধরা পড়ে ১৮৮৯ সালে। জনৈক কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বইয়ের আখ্যাপত্র ছিঁড়ে ভুয়ো মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের নামধাম যোগ করে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে জমা দিত। পঞ্চাশটা বই জমা দেওয়ার পর সে ধরা পড়ে। হৃদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আর একজন মাঝে মাঝে টাকা নিত। তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দুজনেই অপরাধ স্বীকার করে। অর্থদণ্ডসহ তাদের তিন মাসের কারাবাস হয়।

এগারো

বই ছাপালেই হবে না। দরকার একটি বিক্রয়কেন্দ্র, যেখান থেকে ক্রেতা নিজে এসে বই কিনতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে বই বিক্রির ব্যাবসা ইংরেজরাই এ দেশে প্রথম শুরু করে। সেটা আঠারো শতকের শেষ দিককার কথা। উনিশ শতকের প্রথম বাঙালি বই ব্যবসায়ী যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সে কথা অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপা বাংলা বই এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা বই বিক্রির জন্য ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তা ঠিক বিক্রয়কেন্দ্র বা বুক ডিপোজিটরি নয়। স্কুল বুক সোসাইটি এই ব্যবস্থার পত্তন করেন ১৮২৬-এ। তবে স্কুল বুক সোসাইটির ব্যাবসা করার জন্য বই বিক্রি করতেন না।

তখন বইয়ের আখ্যাপত্রে বা বিজ্ঞাপনে বই কোথায় পাওয়া যাবে তার স্পষ্ট নির্দেশ থাকত। বই পাওয়া যেত সেই বইয়ের মুদ্রকের বাড়িতে বা ছাপাখানায়, লেখকের বাড়িতে, কখনো বা অন্য কারোর বাড়িতে বা অফিসে। যেমন বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি* পাওয়া যেত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার তাঁর ছোটো ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কাছে। গৌরীশংকর তর্কবাগীশের *শ্রীমদ্ভাগবত* পাওয়া যেত জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রালয়ে অথবা 'যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে'। সে সময় বই বিক্রি চলছে বটতলার নানা ছাপাখানায়, বিভিন্ন বাড়িতে, বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিসে। কিন্তু এককভাবে কোনো বাঙালির বইয়ের দোকান নেই। এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। ১৮২৬-এ শুরু হয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটির বুক ডিপোজিটরি, তার কুড়ি বছর পর ১৮৪৭-এ বিদ্যাসাগর খুললেন সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি। বিদ্যাসাগরের দেখাদেখি এগিয়ে এলেন আরও মানুষ। তাঁরা কেউ পণ্ডিত, কেউ লেখক, কেউ-বা শুধুই ব্যাবসাদার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাঙালির বইয়ের ব্যাবসা বেশ জমে উঠেছে। ব্যাবসার বাড়বাড়ন্ত দেখে শিক্ষিত বহু বাঙালি বইয়ের দোকান খুলে বসেছিলেন। লং বলেছেন, জনৈক বাঙালি নাকি বইয়ের ব্যাবসা করেই মাসে ৫০০ টাকা উপার্জন করতেন।

তখনও ফেরিওয়ালার মাথায় মাথায় বই সাজানো থাকত বিক্রির জন্য। বই বিক্রির এই পদ্ধতির উদ্ভাবক বটতলা। পঞ্জিকা বিক্রির পাশাপাশি বই বিক্রিকে সমান তালে এগিয়ে নিতে পদ্ধতিটি যে খুব কাজে দিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। কলকাতার ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত ফেরিওয়ালার সংখ্যা তখন ২০০-র বেশি। তারা পাইকারি দরে

বই কিনে, মাথায় বইয়ের পাহাড় নিয়ে ফেরি করত কলকাতা বা আশেপাশের শহরতলিতে। দ্বিগুণ দামে বিক্রি করে মাসে ৬ থেকে ৮ টাকা লাভও করত। কেউ কেউ নাকি মাসে একশো টাকাও আয় করত। এগোতে লাগল বাঙালির বইয়ের ব্যাবসা। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সারা কলকাতায়, বিশেষত কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলেই গড়ে উঠল অনেক বইয়ের দোকান। এঁদের মধ্যে কেউ শুধু বিক্রেতা, কেউ বা প্রকাশক ও বিক্রেতা। উনিশ শতকেই তিনটি আলাদা ধারা চিহ্নিত হয়ে গেল বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে—মুদ্রক, প্রকাশক ও বিক্রেতা।

লঙের অভিযোগ, দেশীয় লেখকরা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত রেখে নতুন বই প্রকাশ করার সময় সাধারণত মূল্য বেশি রাখেন। কারণ বই লেখা যে লাভজনক তা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। কোনো কোনো লেখক নাকি বই লিখে সে সময় নিয়মিত উপার্জনও করতেন। লঙের এই অভিযোগ কতটা সত্যি, সেটি বোঝার উপায় নেই। কারণ সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য-প্রমাণ আমরা পাইনি।

পাঠক যে সবসময় সমূল্যে বই কিনতেন এমন নয়, বই তাঁরা বিনামূল্যেও পেতেন। বই বিনামূল্যে বিতরণের সূচনা করেছিলেন মিশনারিরা। সেসব ছিল ধর্মীয় বই। এর পর স্কুল বুক সোসাইটি বহু বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। এটি অবশ্য তাঁদের নীতির মধ্যেই পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে বই বিলিয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরচন্দ্র চৌধুরী (*শেরপুর বিবরণ*), প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস (তাঁর সব বই-ই বিনামূল্যে বিতরিত) প্রমুখ। ১৮৭৩-এ *ঢাকাপ্রকাশ* পত্রিকায় ব্রজসুন্দর মিত্র এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছেন: 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্রে বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ী লোক ব্যতীত অন্য কাহাকে বিতরণ করা যায় না।'

মুজতবা আলির সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধা স্মরণ করি: 'বই সস্তা নয় বলে লোকে কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।' বাঙালি কি আজও সেই বৃত্তে ঘুরে মরছে না?

১. বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে *মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিশুশিক্ষা*, সম্পাদক: আশিস খাস্তগীর, এবং *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি* (প্রবন্ধ: 'উনিশ শতকের বাংলা বই'), সম্পাদক: স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, গ্রন্থে।
২. বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে মৎপ্রণীত *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা* গ্রন্থে।
৩. নোট বই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বপন বসু, *দেশ* ১৮.৯.০১ সংখ্যায়।

তথ্যসূত্র

১. অরবিন্দ গুহ (সম্পাদিত), *আনপাবলিশ্‌ড্ লেটারস্ অফ বিদ্যাসাগর* (কলকাতা, ১৯৭১)।
২. ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ক্যাটালগ (১৯০৫, ১৯২৩)।
৩. স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি* (কলকাতা, ২০০৩)।

৪. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা, ১৯৮৩)।

৫ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র* (১-৯), (ঢাকা, ১৯৮৫-২০০৪)।

৬ মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা* (ঢাকা, ২০০৪)।

৭. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা, ১৯৮১)।

৮. শ্রীপান্থ, *বটতলা* (কলকাতা, ১৯৯৭)।

৯. সুকুমার সেন, 'বটতলার বেসাতি', *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৯৪৮)।

১০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলা অভিধানগ্রন্থের পরিচয়* (কলকাতা, ১৯৭০)।

১১ আশিস খাস্তগীর, *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা* (কলকাতা, ২০০৪)।

১২ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *বাংলা মুদিত গ্রন্থাদির তালিকা* (কলকাতা, ১৯৯০)।

১৩. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস* (কলকাতা, ২০০০)।

১৪ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ (১৮৬৮-১৯০০)।

১৫ ব্রিটিশ মিউজিয়ম ক্যাটালগ (১৮৮৬, ১৯১০)।

১৬ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (মূল-সংকলক), *মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থেব পঞ্জি* ১৮৫৩-১৮৬৭ (কলকাতা, ১৯৯৩)।

১৭. শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (কলকাতা, ১৯৯৬)।

১৮ লঙের গ্রন্থতালিকাসমূহ (১৮৫২, ১৮৫৫, ১৮৫৭)।

১৯. মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), (কলকাতা, ২০০৩)।

২০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (১/২), (কলকাতা, ১৩৭৭ ও ১৩৮৪)।

২১. স্বপন বসু (সম্পাদিত), *সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ* (২), (কলকাতা, ২০০৩)।

২২. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (২-৬), (কলকাতা, ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮০, ১৯৮৩)।

২৩ স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট (১৮১৮-১৮৪০)।

এ ছাড়া বহু গ্রন্থ ও রচনা এই লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সবার ঋণ স্বীকার করছি।

বইপাড়ায় বিদ্যাসাগর

অভিজিৎ নন্দী

একবার বিদ্যাসাগরের বই চুরি গেল। দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই। যিনি নিয়েছিলেন তিনি ফেরত দেননি যে, সে কথা আর স্বীকার করছেন না। বিদ্যাসাগর পড়লেন মহা মুশকিলে। বন্ধুজনকে কিছু বলতেও পারছেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বই ঘরে এল। বিদ্যাসাগরের চেনা এক বইওয়ালার কাছে সেই বন্ধুজন বেচে দিয়েছিলেন বইখানি পুরোনো বইয়ের দরে। বইওয়ালার কাছ থেকে আবার তা কিনে নিলেন বিদ্যাসাগর।[১]

বাস্তবিক বইওয়ালাদের মাধ্যমেই বই কেনাবেচার কাজ চলত আমাদের দেশে ছাপাখানা আসার দীর্ঘকাল পরও। বটতলার বহু প্রকাশক ক্যানভাসার নিয়োগ করতেন। তাঁরা বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে কলকাতার অলিগলি শহরতলি থেকে দূর গ্রামেও চলে যেতেন বই বেচতে। শুধু বই বিক্রি নয়, পয়সা দিয়ে অথবা ছাপানো বইয়ের বদলে গ্রামের লোকের কাছ থেকে এঁরা সংগ্রহ করে আনতেন প্রাচীন পুথি। তার পর সেইসব পুথি নিয়ে তাঁরা ছুটে যেতেন কলকাতার বিদ্বৎসমাজে। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা এমন বহু পুথি এভাবেই কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রহে এসেছে। ১৮৫৭-তে জেমস লং আফশোস করে বলেছিলেন, কলকাতায় বইয়ের দোকান নেই। একেবারে যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। প্রয়োজন মেটাতেন এই বইওয়ালারাই। এ ছাড়া বিভিন্ন ছাপাখানার মালিক তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকার পাতায়। ছাপাখানাই তখন ছিল বই বিক্রির স্থান। কখনো বা লেখকের বাড়িও। *সমাচার দর্পণ*-এর পাতায় এইরকম বিজ্ঞাপনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়: 'যে২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন।'[২] অথবা, 'যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।'[৩]

যুগ বদলেছে, মুদ্রণ-প্রকাশনে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। আজ কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় দাঁড়িয়ে দেড়শো-দুশো বছর আগেকার বই বিক্রির কথা ভাবতেও অবাক লাগে। কলেজ স্ট্রিটের সহস্রাধিক প্রকাশক ও অগুনতি পুস্তক বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে হয়তো অনেকের মনে হতে পারে এই অঞ্চল প্রথম থেকেই পুস্তক ব্যাবসার পীঠস্থান। কিন্তু বাংলা মুদ্রণের পা চলার শুরু অন্যত্র। তবে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার ইতিহাসও

কিছু অর্বাচীন নয়। একসঙ্গে না হোক, বিচ্ছিন্নভাবেও এ অঞ্চলে বা এর আশেপাশে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই পাই ছাপাখানার শব্দ।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক, গুজরাতি-ব্রাহ্মণ লল্লুলাল বা লাল্‌লুলাল মির্জাপুরের ব্রাহ্মণ বাবুরামের কাছ থেকে একটি প্রেস কেনেন। নাম সংস্কৃত প্রেস, ঠিকানা পটলডাঙা।[৫] এর পর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকা যন্ত্র স্থাপন করেন কলুটোলায়। ১৮২২-এর ৫ মার্চ থেকে *সমাচার চন্দ্রিকা* প্রকাশিত হতে থাকে। চন্দ্রিকা যন্ত্র থেকে সংবাদপত্র ছাড়াও অন্যান্য বই প্রকাশিত হত—ভবানীচরণের গ্রন্থ ছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেব ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্যসূচক পুরাণ বোধোদ্দীপন ভাষা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মনুসংহিতা ইত্যাদি।[৬] শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাপতে গিয়ে ভবানীচরণ ছাপার কালি গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর দিয়ে হরফ বিন্যাস করেছিলেন।[৭] আসলে ছাপা বই সে সময়ে গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য। যদিও এই মনোভাব খুব শীঘ্রই পরিবর্তিত হয়। যাঁরা আগে ছাপা বই দেখলে চোখ বুজতেন একদিন তাদেরই দেখা গেল কোনো বাবুর দরবার থেকে বিনামূল্যে ধর্মগ্রন্থ গ্রহণ করে বাবুকে আশীর্বাদ করতে। ১২ মে ১৮৩১ তারিখে *সমাচার চন্দ্রিকা*-র এক বিজ্ঞাপনে আমবা দেখি·

> ...অতএব আমারদিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুদ্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি ..[৮]

বইয়ের আকার ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে ভবানীচরণ পুরোনো পদ্ধতিই রাখতে চেয়েছিলেন, যদিও সেটি তাঁর বইয়ের পাঠক পণ্ডিতদের এতকালের অভ্যাসের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার বৈশিষ্ট্য ইউনিফরমিটি ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন।[৯] তাই পুরোনো পদ্ধতি, অভ্যাস থেকে বাঙালি মুদ্রাকর ও পাঠক উভয়েই মেনে নিতে শিখলেন এই নতুন একমাত্রিকতা। শিক্ষা ও জ্ঞানে আব মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকার থাকল না। সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকল এই নতুন দিনের আলো। প্রকাশিত হল একাধিক সংবাদপত্র। নতুন নতুন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। বর্তমানের কলেজ স্ট্রিটের আশেপাশেও দেখা দিতে থাকল কিছু কিছু ছাপাখানা। আরপুলিতে হরচন্দ্র রায়ের বাঙালি যন্ত্র,[১০] মির্জাপুরে সংবাদ তিমিরনাশক যন্ত্র, মুনানি হেদাতুল্লার ছাপাখানা, বউবাজারে লেবেন্ডার সাহেবের ছাপাখানা এবং ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা, আরপুলিতে বারাণসী আচার্যের মুদ্রণাগারের কাছেই শ্রীমন্ত রায়ের ছাপাখানা। মির্জাপুরে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে হিন্দু কলেজের বই ছাপা হত।[১১] আমহার্স্ট স্ট্রিটে ছিল রোজারিও প্রেস।[১২] ১৮৫ নং বউবাজার স্ট্রিটে ঈশ্বরচন্দ্র বসুর স্ট্যানহোপ যন্ত্র। টেমার লেনে বিশ্বপ্রকাশ প্রেস।[১৩] সুকুমার সেন এই প্রেসগুলিকে বটতলা-প্রকাশক হিসাবে

উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তিনি স্থান হিসাবে বটতলাকে গণ্য করেননি। বটতলা প্রকাশন বলতে তিনি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বুঝিয়েছেন এবং সেই বৈশিষ্ট্য যে-যে প্রকাশকের ছিল বলে তিনি মনে করতেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর 'বটতলার বই' প্রবন্ধে। কলেজ স্ট্রিটের বই প্রকাশনের কথা বলতে গিয়ে তাই অনেকসময়ই আমরা এই ছাপাখানাগুলিকে বাদ দিয়ে থাকি। কিন্তু কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া গড়ে ওঠার প্রাক্-ইতিহাসে এদের অবদান গবেষণাসাধ্য।

আজকের কলেজ স্ট্রিটে সহস্রাধিক বই বিপণন কেন্দ্র। কিন্তু ১৮২৬-এর আগে এখানে কোনো বইয়ের দোকান ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজের কাছে ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রথম একটি বইয়ের দোকান স্থাপন করে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে লেখা আছে:

> With a view to promote the purchase of books by the pupils of various institutions for native education in Calcutta, the Committee have established a retail shop near the Hindoo College.[১৪]

ছাত্রদের প্রয়োজন ও সুবিধার কথা ভেবে এই অঞ্চলে প্রথম বইয়ের দোকান খোলা হল। আজকের বইপাড়ার অজস্র বই বিক্রেতা ও প্রকাশক অনেকটা এই কথা ভেবেই এখানে ব্যাবসা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, যেসব বই প্রকাশক ও বিক্রেতা পালাবদলের দিনে কলেজ স্ট্রিটকে তাঁদের ব্যাবসার কেন্দ্র করতে পারেননি তাঁদের অনেকেরই আজ দৈন্যদশা। তার কারণ এই অঞ্চলের অসীম গুরুত্ব। ছাত্র থেকে অধ্যাপক-গবেষক, শিল্পী থেকে রাজনৈতিক নেতা, কেউই এই অঞ্চলের আশ্চর্য আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেননি। শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতির বিভিন্ন পালাবদলের, উচ্চাবচতার সাক্ষী হয়ে থেকেছে এই কলেজ স্ট্রিট। কফি হাউস, ফেভারিট কেবিন, বসন্ত কেবিন, প্যারামাউন্ট, দিলখুশা প্রভৃতি আড্ডা-নিকেতনও বার বার বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে হাতছানি দিয়েছে। ফলে এইরকম একটি জায়গা যে বাংলা গ্রন্থ বিপণন ও প্রকাশনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে তা আর আশ্চর্য কী?

কিন্তু যখন এই বিস্তৃতি, এই গৌরব এর ছিল না, দুটি-তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ ছিল কলেজ স্ট্রিটের পরিচয়, যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, অ্যালবার্ট হল বা কফি হাউস—কোনোটাই তৈরি হয়নি, তখন কী দেখে এখানে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যাসাগর? আসলে বিদ্যাসাগর এই স্থানমাহাত্ম্যকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে পড়ে নিয়েছিলেন তাঁর দূরদর্শিতায়। তাই অন্য কোথাও নয়, এই অঞ্চলেই শুরু হল তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায়।[১৫]

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিদ্যাসাগর। কলেজের পাঠন প্রণালীর উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য চরম হলে তিনি সম্ভবত ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের গোড়ায় পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ১৬ জুলাই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। রসময়বাবু আড়ালে বলতে লাগলেন: 'বিদ্যাসাগর যে চাকরিটা ছেড়ে দিলে এখন খাবে কী?' লোকমুখে কথাটা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, 'রসময়বাবুকে বলো বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে খাবে।'[১৬] আলু পটল বেচেননি বিদ্যাসাগর। তবে স্বাধীন জীবিকার প্রয়োজনে তা করতেও তাঁর আত্মসম্মানে লাগত না। যুগের পরিবর্তনের ধারাকে লক্ষ করে এবং শিক্ষা প্রসারের কথা মাথায় রেখে তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি স্থাপন করলেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, সে সময়ে মুদ্রণ প্রকাশনের ব্যাবসায় শিক্ষিত বাঙালির বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলিয়াম রস ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লিখছেন:

> In Europe, typographic printing is considered a highly respcctable profession, and youths who enter it have generally received a fair education. But this is not the case in India, where natives who have been educated in the English language prefer to work as copying clerks on small salaries rather than become compositors and earn better wages.[১৭]

বিদ্যাসাগর সেখানে শুধু প্রেস করেই ক্ষান্ত হলেন না। সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি বাংলা প্রকাশনের ইতিহাসে প্রকাশক, বই বিক্রেতা, মুদ্রক ও গ্রন্থকারকে আলাদা করে চিনতে শেখাল। বিদ্যাসাগর এর সবগুলির সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন।

বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগরের মূলধন ছিল বিদ্যা। বিদ্যাই তাঁর স্বোপার্জিত মূলধন এবং তিনি ছিলেন বিদ্যার ব্যাপারী। কিন্তু বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সাদৃশ্য কোথায়, বিশেষ করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে? বিত্ত দান করলে কমে যায়, বিদ্যা যত দান করা যায় তত বাড়তে থাকে। ...তবে তাঁর বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্যাজীবীদের বাণিজ্যের পার্থক্য ছিল। তাঁরা বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন বণিকদের মতো। বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে মূলধন করে তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।'[১৮] এখানেই আপত্তি জানিয়েছেন পরমেশ আচার্য। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর বণিকের মতো আচরণ করছেন আমরা সে কথা মেনে নিতে পারি না। বিদ্যা ও বাণিজ্য যেন সেখানে পরস্পর-বিরোধী।[১৯] আবার কোথাও আমরা বণিক বিদ্যাসাগরকে, ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরকে বই প্রকাশক বিদ্যাসাগর দিয়েও আড়াল করতে চেয়েছি। কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্যের মতো বইও যে একটা পণ্য, তাকে বাজারে আনতে গেলে, পাঠক-

ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিতে গেলে শুধু বিদ্যার মূলধনে চলে না, তা বুঝতে চাই না অনেকেই। সেখানেও প্রয়োজন ব্যাবসাবুদ্ধি, লাভ-ক্ষতির হিসেব, পাঠক-ক্রেতার মনস্তত্ত্ব পড়তে শেখা, বাজার বুঝতে শেখা। বিদ্যাসাগর এই দিকগুলিতেও নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 'বিদ্যাসাগর', 'দয়ার সাগর', 'করুণাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সেখানে বণিক বিদ্যাসাগরের কোনো যথার্থ বিরোধ নেই। বিদ্যাসাগর প্রয়োজনে প্রচুর দান করেছেন, আবার অপ্রয়োজনে হলুদবাটা শিলনোড়া ধোয়া জলটুকু ফেলতে আপত্তি জানিয়েছেন। বিনয় ঘোষই লিখেছেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চাকরি ছেড়ে সংস্কৃত কলেজে চাকরি গ্রহণের সময় বিদ্যাসাগর আবেদনপত্রে বেতন বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করতে ভোলেন না·

> ঈশ্বরচন্দ্রের যে স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির কথা আগে বলেছি, সেই বুদ্ধিও তাঁব আবেদনপত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, সহকাবী সম্পাদকেব মাসিক বেতন অতি অল্প, কাজ এবং তার অনুরূপ দায়িত্বের উপযুক্ত নয়। তাই তিনি যোগ্য কাজের যোগ্য বেতনের জন্য আবেদন করতে ভোলেননি। প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করেছেন যে বেতন না বাড়ালে তাঁর পক্ষে বর্তমান চাকরি ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের চাকরি গ্রহণ কর৷ বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পান, সংস্কৃত কলেজের সহকাবী-সম্পাদকের ধার্য বেতনও পঞ্চাশ টাকা, সুতরাং আবেদনপত্রে বেতন-বৃদ্ধির জন্য চাপ দেবার সুযোগ ছিল তাঁব। এই সুযোগ তিনি ছাড়েননি। এ তাঁর স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় যা প্রকাশ করতে কখনো তিনি সংকোচ বোধ করতেন না।[১৭]

বৈষয়িক বুদ্ধির এমন উদাহরণ কিছু কম নয়। বিদ্যাসাগরের ছাত্র নগেন্দ্রনাথ নিমতলায় কাঠের গোলা খুলেছেন। বিদ্যাসাগর ছাত্রের কাঠের গোলা দেখতে এলেন। নগেন্দ্রনাথের হাতে ইংরাজি মাসিক পত্র দেখে বিরক্ত বিদ্যাসাগর বললেন, 'ব্যবসা করতে এসেছিস, হাতে ইংরেজি মাসিক পত্র কেন? যদি একান্তই বই রাখতে হয়, ব্যবসাদারের মতো রামায়ণ-মহাভারত রাখ না।' নগেন্দ্রনাথ ধারে বেচেন শুনে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন:

—ধারে কি ভাবে বেচিস?
—আজ্ঞে, ভদ্রলোক দেখে ধার দি।
—ভদ্রলোক কি করে বুঝিস?
—চেহারা অবস্থা দেখে ভদ্রলোক বুঝি।

> —দূর মূর্খ! তোর কিছু হবে না। ব্যবহার করে-করে যখন দেখবি মানুষটি খাঁটি, তখন ধার দিবি।[২১]

উদাহরণ বাড়িয়ে কাজ নেই। আপাতত বিদ্যা ও বাণিজ্যের লড়াই দূরে সরিয়ে আমরা দেখি 'বিদ্যার ব্যাপারী' হয়ে বিদ্যাসাগর কী করলেন।

ঠিক কত তারিখে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, '১৮৪৮/৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কালেজে চাকরি করিতেন, সেই সময়ে উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। আপনাদের রচিত গ্রন্থ ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে, আপনাদের পছন্দমতো পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের যন্ত্র স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।'[২২] এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছেন, 'যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি উভয়েই সমাংশভাগী ছিলাম।'[২৩] বিদ্যাসাগর এবং চণ্ডীচরণ দুজনেই লিখছেন, সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময় প্রেস স্থাপিত হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ১৮৪৭-এর ১৬ জুলাই বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে, সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত থেকে ১৮৪৮/৪৯ খ্রিস্টাব্দে কেমন করে প্রেস সংস্থাপিত হয়? বিনয় ঘোষ অবশ্য মনে করেন, 'সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাড়বার আগেই বোধহয় বিদ্যাসাগর ''সংস্কৃত প্রেস'' ও ''ডিপোজিটরি'' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্তত তাঁর প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছিল ১৮৪৬ সালের শেষে, অথবা ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে।'[২৪] ১৮৪৬-এর ২৭ জুন মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। ১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার মারা গেলে তৎকালীন সেক্রেটারি রসময় দত্ত অ্যাসিসটান্ট সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরকেই ওই পদ গ্রহণ করতে বলেন। এতে অন্তত চল্লিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হত বিদ্যাসাগরের।[২৫] কিন্তু বিদ্যাসাগর 'বিশিষ্ট হেতু বশতঃ'[২৬] মদনমোহন তর্কালংকার যাতে এই চাকরি পান তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগরের কথায় কাজ হয়। অতএব অনুমান করা যায়, ১৮৪৬-এর ২৭ জুনের পর থেকে ১৮৪৭-এর ১৬ জুলাই-এর মধ্যবর্তী সময়েই এই প্রেস স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এপ্রিল মাসে পদত্যাগপত্র পেশ করার পরই কি এই চিন্তা বিদ্যাসাগরের মাথায় আসে? কেননা তিনি জানতেন পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে এবং পদত্যাগ করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষা সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেবের অনুরোধেও তিনি পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে রাজি হননি।

কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন তো শুধু সংকল্পে সিদ্ধ হবার নয়। প্রেস কেনার জন্য চাই টাকা। এদিকে দুজনের কারোর কাছেই টাকা নেই। অথচ কাজ চলে যেতে পারে এমন একটি কাঠের প্রেস পছন্দ হয়েছে। যন্ত্রের দাম ছ-শো টাকা। অনেক দিন অপেক্ষা করে

শেষে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ছ-শো টাকা ধার করে প্রেসটি কেনেন। যদিও শম্ভুচন্দ্রের মতে, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ঋণ করে বিদ্যাসাগর তর্কালংকারের হাতে টাকা দেন এবং তর্কালংকার প্রেসটি কেনেন। ওই টাকা নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে সময়মতো না দিতে পাবায় বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শেষে উপায়ও মিলল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন, 'আমরা একটি ছাপাখানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।' এ কথা শুনে মার্শাল বললেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিদ্যার্থী সিভিলিয়ানদের যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পড়ানো হয় তা

> অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ একশতের মূল্য ৬০০্ শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে। সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬০০্ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায় দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশঃ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।[২৭]

প্রেসের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। আয় বাড়ল যথেষ্টই কেননা ১৮৪৯ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষ হবার সময় বিদ্যাসাগরকে ৫০০০ টাকা জামিন রাখতে হয়। বিদ্যাসাগরের ছাপাখানা কেনার সংগতি ছিল না ১৮৪৭ সালে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এসে যখন তিনি প্রেসের অর্ধেক অংশের মালিক হয়েই ৫০০০ টাকা জমা দেবার ক্ষমতা রাখেন তখন বুঝতে হবে তিনি বই প্রকাশন ও বই বিক্রি দুই-ই যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছিলেন।

তবে এই সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁকে দিতে চান না কেউ কেউ। তার কারণ

এই নয় যে মদনমোহন তর্কালংকার বা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মতেঃ

> বিদ্যাসাগরের বিদ্যা-মূলধন করে ব্যবসা শুরু হয়নি। ঐ ভাষায় বলতে গেলে আসল মূলধন ছিল মুরুব্বীর জোর। ধার তাকেই দেয় লোকে, যার ধার শোধ করার ক্ষমতা থাকে। ...এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বিদ্যাসাগরের বইয়ের ব্যবসা সরকারি সহযোগিতায় বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছিল। ...শিক্ষাবিভাগে চাকরির সুবাদে কী ধরনের বই বাজারে চলবে, তা তিনি ভালোই বুঝেছিলেন। আর নিজের বই পাঠ্য করায়-ও কিছু বাড়তি সুবিধা নিশ্চয় পেয়েছিলেন। তিনি একদিকে সংস্কৃত কলেজে কী পড়ানো হবে তার সুপারিশকারী, অন্যদিকে বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্য কী ধরণের বই পাঠ্য করা দরকার তার প্রধান পরামর্শদাতা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আজীবন পাঠ্যবইয়ের ব্যবসাই করেছেন। ...১৮৫৫ সালে বাংলা স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সংস্কৃত কলেজের যে নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়, তার পাঠ্যসূচিও তিনি তৈরি করেন।[২৮]

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর *উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলন ও কাঙাল হরিনাথ* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে পরমেশ আচার্যকে সমর্থন করেছেন।

১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের মাসিক বেতন ছিল পাঁচশো টাকা। আর বইয়ের ব্যাবসা থেকে মাসিক আয় হত চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা। রাধারমণ মিত্রের তথ্য অনুযায়ী ওই আয় ছিল মাসিক তিন থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা, অর্থাৎ বার্ষিক ছত্রিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা সেকালে। ১৮৫৭ সালেব হিসাব অনুযায়ী কলকাতার ছেচল্লিশটি বাংলা প্রেস থেকে প্রকাশিত মোট ৫,৭১,৬৭০ কপি বাংলা বইয়ের মধ্যে সংস্কৃত প্রেসের বইয়ের সংখ্যা ছিল ৮৪২২০টি। অরবিন্দ গুহ শিক্ষা বিভাগের ১৮৭০-১ সালের সাধারণ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন, কলকাতা গেজেট অনুযায়ী ১৮৬৯ সালের জুলাই থেকে ১৮৭০ সালের জুন, এই বারো মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ের ২৭টি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে *ভ্রান্তিবিলাস*-এর প্রথম সংস্করণ থেকে *শিশুশিক্ষা*-র ৪৫তম সংস্করণ আছে। এই বইগুলির তিনটি চল্লিশের বেশি সংস্করণ হয়েছে, আটটির ত্রিশের বেশি সংস্করণ হয়েছে। সব মিলিয়ে ২,৫৩,০০ কপি বই প্রকাশ করা হয়েছে ওই বারো মাসে।[২৯]

অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের বইয়ের বড়ো ক্রেতা ছিল সরকার। মার্শাল সাহেব যেমন ছ-টাকা দামের *অন্নদামঙ্গল* ১০০ কপি কিনে নিয়েছিলেন ছ-শো টাকার মিনিময়ে, তেমনই পরবর্তীকালে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* ও *বাঙ্গালার ইতিহাস* ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্য

করে সরকার বহু কপি কিনে নিয়েছিল। সরকার ছ-টাকা মূল্যে ছ-শো টাকার বিনিময়ে ১০০ কপি *বাঙ্গালার ইতিহাস* কিনেছিল। ১৮৫৮ সালে সরকার বিদ্যাসাগরকে পনেরো হাজার একশো ছাপান্ন টাকা ছ-আনা (১৫১৫৬ টাকা ৩৭ পয়সা) আগাম দিয়েছিল তাঁর বই ছাপা ও কিনে নেবার খরচ বাবদ।[৩০]

শিক্ষা বিভাগে চাকরি, সরকারি সাহায্য প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের বই ব্যাবসার উন্নতি ত্বরান্বিত করেছিল কি না, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে যাবার আগে বিপরীত কতগুলি বক্তব্য সামনে রাখা ভালো। বাংলা সাহিত্য গঠন ও ছাত্রদের বাংলা শিক্ষা দেবার উপযোগী গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দান ও উৎকৃষ্ট পুস্তক নির্বাচনের জন্য সরকার সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি গঠন করে। সেই সময়ে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিনসন বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলেন, বিদ্যাসাগর যেন এই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কমিটিতে যোগ দেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর অ্যাটকিনসনকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে লেখেন:

> W. S. Atkinson, Esqr, M.A. 13th July 1873
> My dear Sir,
> In reply to yours of the 11th instant I beg to inform you that I would have gladly accepted your invitation to serve in the School Book Committee, but on two considerations I feel constrained to decline it. As an author I am directly interested in the decision of the committee, and I do not therefore think it right to take a part in their deliberations. Besides, I am inclined to think that my presence in the Committee may interfere with a free and unreserved discussion of the merits and demerits of the books. I hope you will therefore kindly excuse me if I cannot persuade myself to comply with your request.
>
> Yours sincerely
> (Sd) Iswar Chandra Sarma.[৩১]

বিদ্যাসাগর কেবল পাঠ্য বই-ই লিখেছেন ও ছেপেছেন, তাঁর রচনায় মৌলিকতা নেই, এমন অভিযোগ শুনে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন:

> কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা রচনানৈপুণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি বা মৌলিকতা (originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ,

> মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এ স্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকার অবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। ...কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিবাহবিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব সীতার বনবাস ও বহুবিবাহ বিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।[৩২]

যদিও ১৮৯১-এর কিছু পরেই বঙ্কিমযুগ শেষ হচ্ছে এবং *বিষবৃক্ষ*, *স্বর্ণলতা*, *মেঘনাদবধ কাব্য*, *কৃষ্ণকুমারী নাটক* প্রভৃতি রচিত হয়ে গেছে, তবু এ কথা বলা অর্থহীন যে, বিদ্যাসাগর কেন মৌলিক সাহিত্য রচনা করেননি। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়: উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশ্চর্য বিস্ফার দেখা গেল তখন বিদ্যাসাগর কেন তাঁর সংস্কৃত যন্ত্র থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন না?

বিদ্যাসাগরের বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ করলে দেখব যে, সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পাদনায় সেগুলিও কোথাও না কোথাও পাঠ্য:

UTTARCHARITA: A SANSKRIT DRAMA
by BHAVABHUTI
with Notes And Explanations for the use of Candidates
For
The First Examination in Arts of the Calcutta University
by ISWARCHANDRA VIDYASAGAR
1872

ABHIJANANASAKUNTALA
A SANSKRIT DRAMA
by
KALIDASA
EDITED
with notes and explanations
For the use of candidates
for
The B.A. Examinations of the Calcutta University
1871

সর্বদর্শন সংগ্রহ বইটির ক্ষেত্রে দেখি:

BIBLIOTHECA INDICA
Collection of Oriental Works.
Published under the Patronage of the
Hon. Court of Directors of the East India Company.
And the Superintendence of the Asiatic Society of Bengal
Nos. 63 and 142
SARVADARSANA SANGRAHA
or An
Epitome of the different systems of Indian Philosophy
by
Madhavacharya
Edited by
Pandita Iswara Chandra Vidyasagara

রঘুবংশ-এর বিজ্ঞাপন দেখি:

RAGH' VANSA
AN EPIC POEM
by
KALIDASA
Edited by
Eswar Chandra Vidyasagar
Principal of the Sanskrit College
Calcutta
Printed at the Sanskrit Press
1853

কিছু দিবস হইল সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মল্লিনাথপ্রণীত সঞ্জীবনীনামক সর্বপ্রধান টীকা সমেত রঘুবংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। ...তথাপি পুনর্মুদ্রিত করিতে উদ্যত হইবার তাৎপর্য এই যে সটীক মুদ্রিত গ্রন্থ যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অনেকেরই এরূপ অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত মূলমাত্র মুদ্রিত হইল। ...কোন কোন অংশ ও কোন কোন শ্লোক এরূপ আছে যে ছাত্রদিগের অধ্যয়নযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত সেই সমস্ত বর্জ্জনীয় অংশ ও বর্জ্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়,

> শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।

এ ছাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর বিদ্যাসাগর পুরোনো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বাতিল করে নিজের *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* ও *ব্যাকরণ কৌমুদী* পাঠ্য করেন। কাব্যের জন্য পাঠ্য করলেন নিজের *ঋজুপাঠ*-এর তিনটি ভাগ।[৩৪]

কয়েকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। *রঘুবংশ*-এর বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর 'Principal of the Sanskrit College' মুদ্রিত করেন। অন্যদিকে, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, যিনি সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহকর্মী এবং সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরিতে সহকর্মী/অংশীদার (বিতর্কিত) ছিলেন, তিনি যখন 'মল্লিনাথপ্রণীত সঞ্জীবনীনামক সর্বপ্রধান টীকাসমেত' *রঘুবংশ* মুদ্রিত করেছেন এবং বিদ্যাসাগরেরই কথা অনুযায়ী 'এই মহাকাব্য যেরূপে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে তাহাই হইয়াছে', তখন বিদ্যাসাগর নতুন করে *রঘুবংশ* মুদ্রিত করলেন কেন? বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রে দুটি কারণ দেখিয়েছেন: (১) কিছু অংশ ছাত্রপাঠ্য নয়, (২) বইয়ের দাম। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ যখন কিছু অংশ ছাত্রপাঠ্য নয় বলে মনে করেছেন তখন সে বই ছাত্রদের হস্তগত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু বইয়ের দাম প্রসঙ্গে ভিন্ন মত উঠে আসে। ১৮৫৬ সালে গর্ডন ইয়ং একটি কমিটি তৈরি করেন, যার কাজ বিভিন্ন ধরনের স্কুলের উন্নতির সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা। এই কমিটির সদস্যরা হলেন উড্রো, লং, চ্যাপম্যান, প্যারীচরণ সরকার, হজসন প্র্যাট প্রমুখ। এই কমিটির সম্পাদক বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠি লিখে জানান যে, কমিটি মনে করেন সাহায্যপ্রাপ্ত এবং মডেল বাংলা স্কুলের জন্য বিদ্যাসাগব যেসব পাঠ্যবই সরবরাহ করে থাকেন তার দাম বরাবরই বেশি এবং বর্তমানে তিনি তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এত দাম দিয়ে বাংলা স্কুলের পড়ুয়াদের পক্ষে বই কেনা সম্ভব নয়। বাংলা শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বইয়ের এই অতিরিক্ত দাম বাধা সৃষ্টি করছে। কাজেই তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন বইয়ের দাম কমাতে। বিদ্যাসাগর বইয়ের দাম কমাতে অপারগ হলে কমিটি সরকারকে কম দামে বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যবই ছাপতে পরামর্শ দেবে।[৩৫] লক্ষণীয়, এই ঘটনা কিন্তু ছাত্রপাঠ্য *রঘুবংশ* (১৮৫৩) প্রকাশেব পরবর্তীকালেই ঘটেছে। বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর তখন সরকারকে প্রস্তাব দেন যে, সরকার যদি বই ছাপার টাকা আগাম দেন তবে তিনি বইয়ের দাম কিছুটা কমাতে রাজি আছেন। এখানেও বিদ্যাসাগর তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন। বই ছাপার পর সরকার যাতে আর কোনো প্রশ্ন না তুলতে পারে তাই আগাম অর্থ নিয়ে রাখলেন তিনি। ফলে বইগুলির ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়ে গেল।

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী ১৮৫২ সালের এক বিজ্ঞাপন অনুসারে সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের বইয়ের বিবরণ ও দাম উল্লেখ করেছেন:[৩৬]

ব্যাকরণ:	দাম
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা	৮ আনা
বৈয়াকরণ ভূষণসার	১ টাকা ৪ আনা
ধাতুপাঠ	৪ আনা
কাব্য:	
ঋজু পাঠ ১ম ভাগ	৬ আনা
ঋজু পাঠ ২য় ভাগ	৮ আনা
ঋজু পাঠ ৩য় ভাগ	১২ আনা
কুমারসম্ভব	২ টাকা ৮ আনা
মেঘদূত	১ টাকা
কাদম্বরী	৫ টাকা
দশকুমার চরিত	১ টাকা ৮ আনা
ন্যায়:	
অনুমান চিন্তামণি	৩ টাকা
অনুমান দীধিতি	
আত্মতত্ত্ব বিবেকে—বৌদ্ধবিকার	১ টাকা ৮ আনা
কুসুমাঞ্জলি	১ টাকা
শব্দশক্তি প্রকাশিকা	২ টাকা
বেদান্ত:	
পরিভাষা	১ টাকা
খণ্ডনখণ্ড খাদ্য	২ টাকা ৮ আনা
সাঙ্খ্য:	
তত্ত্ব কৌমুদী	১ টাকা

তা ছাড়া আছে রঘুবংশ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী ইত্যাদি ও আরও আটখানি বাংলা বই:

শিশুশিক্ষা ১ম ভাগ	১০ পাই (?)
শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ	১০ পাই
শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ	৩ আনা
বোধোদয়	২ আনা
নীতিবোধ	৮ আনা

জীবন চরিত	৪ আনা
বাঙ্গালার ইতিহাস	১ টাকা
বিদ্যাসুন্দর	১ টাকা

এখানেও দেখা যাচ্ছে অধিকাংশই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবই। আরও একটি বিষয় এই তালিকা থেকে উঠে আসে। বিদ্যাসাগর *অন্নদামঙ্গল* প্রকাশ করেছিলেন; দাম ছিল ছ-টাকা। সুসম্পাদিত *অন্নদামঙ্গল* এই তালিকায় নেই। কিন্তু *বিদ্যাসুন্দর*-এর দাম দেখা যাচ্ছে এক টাকা।

পরবর্তীকালের কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের বই প্রকাশকদের লক্ষ্যও কিন্তু এই পাঠ্যপুস্তকের দিকে ছিল দীর্ঘকাল। বিদ্যাসাগর যেন তার পথনির্দেশ করলেন। পাঠ্যপুস্তক বিক্রির উপযুক্ত স্থান নির্বাচনেও তাঁর কিছুমাত্র ভুল হয়নি। ব্যাবসার কেন্দ্র কোথায় হলে ব্যাবসার উন্নতি দ্রুত হবে তা নির্ণয় করাও দূরদর্শিতারই লক্ষণ। আগে এ অঞ্চলে স্কুল বুক সোসাইটির দোকান থাকলেও তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তা ছাড়া বই বিক্রি করার বিষয়টি তখন অনেক প্রকাশকই চিন্তা করতেন না। বিদ্যাসাগর এখানেও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। অন্যান্যদের মতো শুধু প্রেস করেই থেমে থাকলেন না; মুদ্রিত বই কীভাবে বিক্রি হবে তার চিন্তাও করলেন। শুধু নিজের লেখা বা ছাপা বই-ই নয়, অন্যের বইও তিনি ডিপোজিটরিতে রাখতেন। বই বিক্রি হলে কিছু কমিশন কেটে টাকা দিয়ে দেঁওয়া হত। যথাসময়ে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেবার জন্য এবং যথাযথ হিসাব রাখার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি সকলেরই আস্থাভাজন হয়েছিল।

কিন্তু এই আস্থায় কি শেষ পর্যন্ত চিড় ধরেছিল? মদনমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তা একদিন ভেঙে গেল। চণ্ডীচরণ লিখেছেন, 'পরিশেষে প্রেস সংক্রান্ত কার্যকলাপ লইয়া বিদ্যাসাগর ও তর্কালঙ্কারের মধ্যে মনোমালিন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ উপস্থিত হইতে লাগিল।' বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছেন:

> ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে। এজন্য, উভয়ের আত্মীয় পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দে দ্বারা, তর্কালঙ্কারের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাই, হয় তিনি, আমার প্রাপ্য আমায় দিয়া, ছাপাখানার সম্পূর্ণ স্বত্ববান্ হউন, নয় তাঁহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ছাড়িয়া দিউন, অথবা উভয়ে ছাপাখানার যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া লওয়া যাউক। তদনুসারে তিনি, আপন প্রাপ্য লইয়া, ছাপাখানার সম্পর্ক ত্যাগ স্থির করেন। অনন্তর, উভয়ের সম্মতিক্রমে, বাবু শ্যামাচরণ দে, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

> এই তিন ব্যক্তি, হিসাবনিকাস ও দেনা পাওনা স্থির করিয়া দিবার নিমিত্ত, সালিস নিযুক্ত হয়েন, এবং খাতা পত্র দেখিয়া, হিসাবনিকাস ও দেনা পাওনার মীমাংসা করিয়া দেন। তাঁহাদের মীমাংসাপত্রের প্রতিলিপি তর্কালঙ্কারের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি পত্রদ্বারা শ্যামাচরণবাবুকে জানান, আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।[৩৭]

বন্ধুদের মীমাংসার ফলে বিদ্যাসাগর অর্ধাংশের মূল্য দিয়ে সমস্ত স্বত্বের অধিকারী হলেন এবং প্রেসের কাজ নিজের পছন্দমতো চালাতে লাগলেন।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন তর্কালংকার জজ পণ্ডিত হয়ে মুর্শিদাবাদে যান। ১৮৫৫-য় তিনি মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং এর এক বছর পর কান্দির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। কান্দিতে কলেরায় মৃত্যু হয় মদনমোহনের। ফলে নিজের প্রাপ্য কলকাতায় এসে বুঝে নেবার সুযোগ ঘটে না তাঁর। কী কারণে এই বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটল তা জানা যায় না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য শুধু এইটুকু বলেছেন, 'মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ কবা উচিত নহে...এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।'[৩৮] মদনমোহন শ্যামাচরণ দে-কে একটি পত্রে লিখছেন:

> ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি ম্যাজেষ্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহা সাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীনচিত্তে কর্ম্ম কাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা-মুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্যসহচর, এক-হৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।[৩৯]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য এবং মদনমোহন তর্কালংকারের পত্র থেকে মনে হয় 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ'-এর জন্য যেন মদনমোহনই দায়ী ছিলেন।[৪০] যদিও মদনমোহনের জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এই চিঠিকে অপ্রামাণিক বলেছেন।

মদনমোহনের মৃত্যুর পর মাকে নিয়ে মদনমোহনের মেজো মেয়ে কুন্দমালা কলকাতায় এলেন এবং বিদ্যাসাগরের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। বিদ্যাসাগর কুন্দমালাকে মাসে মাসে দশ টাকা দিয়ে যেতে থাকলেন। তর্কালংকারের ছোটো মেয়ে মালতীমালার সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। যোগেন্দ্রনাথ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে বলেন, 'মেজদিদি (কুন্দমালা) বলেছেন যে কাকা (বিদ্যাসাগর) দয়া করে মাসে মাসে দশ টাকা দিচ্ছেন। যদি তিনি দয়া করে *শিশুশিক্ষা*-র তিন ভাগ আমায় দেন তাহলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।' প্রসঙ্গত তিনি এ কথাও মনে করিয়ে দেন যে, 'সালিসেরা যে, মীমাংসাপত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ নাই, সুতরাং, শিশুশিক্ষা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি।'[৪১] এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন এই বিবেচনায় বিদ্যাসাগর *শিশুশিক্ষা*-র স্বত্ব বিষয়ক আলোচনা তখনই স্থগিত করলেন। এর পর বিদ্যাসাগরই লিখেছেন, 'সর্বাগ্রে সালিস মহাশয়দিগের মীমাংসাপত্র বহিষ্কৃত করিলাম; তাহাতে শিশুশিক্ষার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না।'[৪২] এ বিষয়ে কোনো কথাই যখন বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুদের মনে পড়ছে না তখন 'শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, আমার ঠিক কিছুই মনে পড়িতেছে না; তবে আপাততঃ এই মাত্র স্মরণ হইতেছে, তুমি তোমাদের রচিত পুস্তকের বিষয়ে কোনও প্রস্তাব করিয়াছিলে। মদন, সে বিষয়ে, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি সে পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বোধ করি, আর কোনও গোল থাকে না।'[৪৩]

ইতোমধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বাগবাজারের উকিল দীননাথ বসুকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠান বিদ্যাসাগরের কাছে। তাতে লেখা ছিল:[৪৪]

PUNDIT ISSWAR CHUNDER BIDYASAGAR.

My dear Sir,

The widow and children of the Late lamented Mudun mohun Turkalankar are in difficulty in consequence of your having stopped their allowance for profits in Turkalankar's works and preventing their publication by them. I hope you will please do something for them to avoid scandal and future botheration. The matter has been brought into my notice by persons interested for the family of Turkalankar and I have assured them that there will be no difficulty for them to get back their rights

Kindly try to settle the matter amicably as soon as possible lest it grows serious by delay.
Hoping you are well

I remain
Your V Sincerely
17 May 71 Dinonath Bose

দীননাথ বসুর এই চিঠি পাওয়ার 'তিন চারি দিন পরেই, তর্কালঙ্কারের পত্র হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া সমস্ত বিষয় আমার (বিদ্যাসাগরের) ও শ্যামাচরণবাবুর স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল।' যদিও বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছেন, 'তর্কালঙ্কারের পরিবার, পুস্তকের উপস্বত্ব উপলক্ষে আমার নিকট কখনও কোনও দাবি করেন নাই, এবং আমিও, পুস্তকের উপস্বত্ব বলিয়া, তাঁহাদিগকে কখনও কিছু দিই নাই।'[৪৫]

নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস-এ এর পরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্থন করে ছাপাখানার বিভাগ তিনি কীভাবে করতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করেছেন। এই অংশটি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ:

সালিস মহাশয়েরা হিসাব নিকাসে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, আপনাদিগকে দুই প্রকার হিসাব করিতে হইবেক; প্রথম এই, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায়, আমাদের উভয়ের রচিত পুস্তকের ছাপার খরচ ধরিয়া লইয়া, ছাপাখানার হিসাব করিতে হইবেক; দ্বিতীয় এই, আমাদের রচিত পুস্তকের, ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, যে মুনাফা থাকিবেক, তাহার স্বতন্ত্র হিসাব করিতে হইবেক। ছাপাখানায় মুনাফার উভয়ে তুল্যাংশভাগী হইব; এবং ছাপার ও বিক্রয়ের খরচ বাদে, কাপিরাইট হিসাবে, আমরা স্ব স্ব পুস্তকের উপস্বত্ব পাইব। শ্যামাচরণ বাবু পত্রদ্বারা তর্কালঙ্কারকে এই বিষয় এবং আর কতিপয় বিষয় জানাইলে, তর্কালঙ্কার তদুত্তরে এ বিষয়ে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান,—

'Copyright বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছে তদ্বিষয়ে কয়েক কথা বক্তব্য আছে, আমি যে পর্য্যন্ত ছাপাখানার কার্য্য করিয়াছিলাম তৎকাল পর্যন্ত কাপিরাইটের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না, এবং আমার যেন এইরূপ স্মরণ হইতেছে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন তখনি মৃত মহাত্মা বীটন সাহেব তাঁহাকে ছাপাখানার ব্যবসায় বিষয়ক কি Hint দিয়াছিলেন অথবা দত্তবংশীয়েরা তাঁহার উপর কোন কলঙ্কারোপ না করিতে পারে এই বিবেচনা করিয়া ফলে আমার সে কথা ঠিক স্মরণ পড়িতেছে না,

> বিদ্যাসাগর ভায়া ছাপাখানার অংশীদার থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি আর ছাপাখানার অংশ গ্রহণ করিবেন না, যে সকল পুস্তক তিনি রচনা করিয়া দিবেন, তাহার কাপিরাইট্ তিনি লইবেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপস্বত্বের ভাজন আমাকে করিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফলে বিদ্যাসাগরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত তোমাদিগে জানাইতে পারিবেন, অতএব উক্ত সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না।'[৪৬]

তর্কালংকারের এই চিঠির উপর ভিত্তি করেই বিদ্যাসাগরের 'সালিস মহাশয়দিগ' *শিশুশিক্ষা*-র কপিরাইট ছাপাখানার সম্পত্তির অন্তর্গত করেন। যদিও বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'তর্কালঙ্কার যেরূপ বলিতেছেন, তাহা, আমার বিবেচনায়, কোনও মতে, সঙ্গত ও ন্যায়ানুগ নহে।' যেহেতু তর্কালংকারের এই অভিপ্রায়ে আপত্তি জানাতে গেলে 'অনেক বিলম্ব ঘটিবেক', অথচ মদনমোহনের সঙ্গে যত শীঘ্র সবরকম সম্পর্ক শেষ করে দিতে চান বিদ্যাসাগর, তাই 'তর্কালঙ্কার যে সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয় বলিতেছেন, তাহার পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহার একটি ফর্দ্দ, আর তাহার পরে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ্দ' প্রস্তুত করে বিদ্যাসাগর 'সালিস মহাশয়দিগকে' দিলেন। এবং বিদ্যাসাগরের ভাষায়, 'প্রথম ফর্দ্দ নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি ছাপাখানার সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল; সুতরাং ঐ সমস্ত পুস্তকের উপস্বত্ব ছাপাখানার উপস্বত্বের অন্তর্ভূত হইয়া গেল।'[৪৭]

পববর্তীকালে কপিরাইট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে বিদ্যাসাগর কপিরাইট হস্তান্তবের যে-কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন এবং তার জন্য যে-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন এই দুটি সম্পর্কেই উত্তরকালের পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়।

প্রথমত, মদনমোহনের পত্র (যা হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল) সম্পূর্ণ প্রকাশ করা বিদ্যাসাগরের উচিত ছিল কি? তা না করায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন উঠে আসে।

১) মদনমোহন ঠিক কত তারিখে এই চিঠি লিখেছিলেন? তা জানতে না পারায় এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, চিঠিতে লিখিত মদনমোহনের কপিরাইট বিষয়ক ভাবনা ঠিক কোন সময়ের।

২) চিঠিতে মদনমোহনের স্বাক্ষর নেই। লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে বিদ্যাসাগর যখন মদনমোহনের চিঠির কিছু অংশ প্রকাশ করলেনই তখন স্বাক্ষর প্রকাশ করলে চিঠিটি আরও জোরালো হত। সম্পত্তি হস্তান্তর তো স্বাক্ষর ব্যতীত হতে পারে না।

৩) সম্পূর্ণ চিঠি না ছাপায় এ কথাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে, বিদ্যাসাগব চিঠির যে-অংশটুকু ছাপলেন তার পরের অনুচ্ছেদেই অন্য কোনো কথা ছিল না

কপিরাইট সম্পর্কে। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো মদনমোহনকে লেখা চিঠিতে 'আর কতিপয় বিষয়' সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মদনমোহন শ্যামাচরণ দে-কে লিখেছিলেন, 'আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব' (বিদ্যাসাগরই *নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস*-এ এ কথা লিখেছেন)। এখান থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, মদনমোহনকে যে-মীমাংসাপত্র পাঠানো হয়েছিল তা তাঁর সম্পূর্ণ মনঃপুত ছিল না? সেই জন্যই তিনি কলকাতায় এসে আপন প্রাপ্য বুঝে নিতে চেয়েছিলেন?

তৃতীয়ত, মদনমোহন তর্কালংকারকে যে-মীমাংসাপত্র পাঠানো হয়েছিল তাতে *শিশুশিক্ষা*-র কোনো উল্লেখ ছিল না এবং পরে তাঁর স্ত্রী যখন 'স্বামীর প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন' তখনও *শিশুশিক্ষা* বিষয়ে কোনো কথা লেখা হয়নি, বিদ্যাসাগরই তা লিখেছেন *নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস*-এ। তাহলে অপরাধী অপরাধ জানিল না অথচ তার বিচার হইয়া গেল জাতীয় একটি ঘটনা এখানে ঘটল। মীমাংসাপত্রে *শিশুশিক্ষা*-র কোনো উল্লেখ না করেই বইয়ের কপিরাইট হস্তান্তব করা যায় কি?

চতুর্থত, মীমাংসাপত্রে কিছু লেখা ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর মদনমোহনের চিঠিটিকে কপিরাইট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মদনমোহনের সম্মতির প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। চিঠির মাধ্যমে কপিরাইট হস্তান্তর সম্ভব; কিন্তু সে ক্ষেত্রে অবশ্যই লেখকের স্বাক্ষর সমেত কপিরাইট হস্তান্তর বিষয়ে স্পষ্টভাবে সমস্ত শর্ত উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর মদনমোহনের চিঠিটির শেষ অংশে গুরুত্ব দিয়েছেন যেখানে মদনমোহন লিখছেন, 'অতএব উক্ত সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না।' বিদ্যাসাগর ও তাঁর 'সালিস মহাশয়দিগ' এ কথার অর্থ করেছেন এইভাবে: যেহেতু মদনমোহন বলেছেন কপিরাইটের হিসাব বিদ্যাসাগর যবে থেকে করতে বলেছেন তবে থেকে হবে, অতএব তার আগে লিখিত বইগুলির কপিরাইট মদনমোহন চান না! এখানে একটি ব্যাপারে ধন্দ থেকে যায় যে, যদি মদনমোহনের চিঠির উদ্ধৃত অংশের শেষ ভাগকে বিদ্যাসাগর এত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তবে তার ঠিক আগেই মদনমোহন যে লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগর নিজের কপিরাইট ছাড়া সমস্ত 'উপস্বত্বের ভাজন' মদনমোহনকে করবেন—চিঠির এই অংশকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হল না কেন? মদনমোহনের মনোগত অভিপ্রায় ঠিক কী ছিল তা কি এই অংশ থেকে স্পষ্ট হয়?

পঞ্চমত, মদনমোহনের উদ্ধৃত চিঠির কোথাও এ কথা স্পষ্ট করে লেখা নেই যে, তিনি ছাপাখানার অর্ধাংশ বিক্রি করে দিতে চান এবং *শিশুশিক্ষা*-র স্বত্ব বিদ্যাসাগরকে দান করলেন।

ষষ্ঠত, মীমাংসাপত্রে, চিঠিতে বা অন্য কোথাও *শিশুশিক্ষা* কোনো অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হল, এ জাতীয় কথা নেই।

সপ্তমত, যে-বইয়ের তখনও পর্যন্ত অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত মদনমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে তা বিদ্যাসাগরকে দান করতে যাবেন কেন তা-ও সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না।[৮] প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা ভালো মদনমোহন *শিশুশিক্ষা*-র ২য় ভাগ সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রথমে ছাপাননি।

অষ্টমত, মদনমোহনের উক্ত চিঠির যে-অংশটিকে তাঁর কপিরাইট হস্তান্তরের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেখানে আদতেই কি মদনমোহন কপিরাইট ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন? মদনমোহন লিখেছেন, 'উক্ত সময় হইতে কাপিরাইটের হিসাব করা উচিত হয়', অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যে-দিন থেকে কপিবাইটের প্রসঙ্গ তুলেছেন সে দিন থেকে ছাপাখানার খরচ বাদ দিযে নিজ নিজ কপিবাইট অনুসারে অর্থ বিভাজন করা উচিত। অর্থাৎ, *শিশুশিক্ষা*-র পরবর্তী সংস্করণগুলিব কপিরাইট মদনমোহনেব প্রাপ্য। অন্যদিকে, 'পূর্ব্বে যে কথা ছিল না ও হয় নাই, সে কথার নূতন প্রসঙ্গ করা উচিত হয় না'— এ কথারও অর্থ কপিরাইট দান নয়। পূর্বের হিসাবমতো পূর্ববর্তী সংস্কবণগুলির লভ্যাংশে যেমন দুজনের অর্ধেক ভাগ ছিল তেমনই হিসাব করা উচিত। সম্ভবত এতে মদনমোহন কিছুটা বেশি লাভ করতেন। বিদ্যাসাগব এখানেই ছাপাখানার অর্ধেক স্বত্বের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে ফেলেছেন। যদিও বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বিভাজনের শর্তাবলির উপর চোখ রাখলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, বিদ্যাসাগর কপিরাইট ও প্রেস ওনারশিপ যে আলাদা জিনিস সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ ছাড়া মদনমোহনের চিঠি থেকে মনে হয় বিদ্যাসাগর বিটনের কাছ থেকেও ইংল্যান্ডের কপিরাইট আইন সম্পর্কে জেনেছিলেন।

নবমত, মদনমোহনেব চিঠির ভুল অর্থ করে যদি প্রথম ফর্দ অনুযায়ী কিছু বই (মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা* তিন ভাগ, বিদ্যাসাগরের *বেতালপঞ্চবিংশতি*, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, *জীবনচরিত*, *বোধোদয়*, *উপক্রমণিকা*, *ঋজুপাঠ*-এর তিন ভাগ) ছাপাখানার সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়, তাহলে বিদ্যাসাগর যখন ছাপাখানার দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দেন তখন এই বইগুলিরও স্বত্বের দুই-তৃতীয়াংশ ছাপাখানার সম্পত্তির অন্তর্গত বলেই বিক্রি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উইল (পরে দ্রষ্টব্য) লক্ষ করলে দেখব যদিও সংস্কৃত যন্ত্রেব শুধু তৃতীয়াংশ তার সম্পত্তির হিসাবে দেখানো হয়েছে, অন্যান্য বইয়ের স্বত্ব কিন্তু পুরোমাত্রায় বজায় আছে। তাহলে যে-যে বই ছাপাখানার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে একদিন পরিগণিত হয়েছিল এবং উল্লেখ ব্যতিরেকে ছাপাখানার অর্ধাংশের সঙ্গে কপিরাইটেরও হাতবদল ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র সম্পত্তি হয়ে গেল কেমন করে?

বিদ্যাসাগর কপিরাইট বিতর্কে যে-প্রমাণ ও সাক্ষ্য হাজির করেছেন তা থেকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যায় না। আশা করি ভবিষ্যতে আরও কোনো নতুন তথ্যপ্রমাণ এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেবে। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত *শিশুশিক্ষা* সমেত ছাপাখানার সমস্ত স্বত্ব যেমন বিদ্যাসাগরের ছিল তেমনই রইল।

কিন্তু বিতর্ক এক নয়, একাধিক। বিদ্যাসাগর 'তিনি ও আমি উভয়েই সমান অংশভাগী ছিলাম' লিখলেও আর একজন অংশীদারের কথা জানতে পারছি। তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্ন পিতার জীবনীতে লিখেছেন:

> সংস্কৃত যন্ত্র নামক একটি ছাপাখানা বিদ্যাসাগর-মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই তিনজনে একত্র হইয়া সৃষ্টি করেন...। কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ভার উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্‌সিপাল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হস্তে অনেক কার্য্যভার ছিল; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন; পিতৃদেব ঐগুলি মুদ্রিত করা, প্রুফ্ শোধন করা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ...কালক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিকসংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অতীব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক করিয়া মুদ্রাযন্ত্র চালাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, 'আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; মদনেরও এইরূপ মত হইবে; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানুন।' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পত্র লিখিয়া যখন তাঁহারও ঐরূপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও পিতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই দিলেন, এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন।[৪৯]

গিরিশচন্দ্র পরে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে লালচাঁদ বিশ্বাসের সঙ্গে গড়পারে কলিকাতা প্রেস নামে একটি ছাপাখানা খুলেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে লালচাঁদের মৃত্যু হলে প্রেস বিক্রি করে গিরিশচন্দ্র নিজের অংশের যে-আটশো টাকা পান তা দিয়ে এন্টালি অঞ্চলের এক মুসলমানের প্রেস কেনেন। তা ছাড়া তিনি অক্ষর ঢালাইয়ের কারবার খুলে তা দিয়ে ছাপাখানার কাজ চালাতে থাকেন।[৫০]

সংস্কৃত প্রেসে গিরিশচন্দ্রের অংশ ছিল কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু দীনবন্ধু

ন্যায়রত্ন সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরির স্বত্ব দাবি করলে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাক্ষী মানা হয়। গিরিশচন্দ্র প্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকলে তাকে কি এতটা গুরুত্ব দেওয়া হত? কিন্তু তিনি প্রেসের কাজ অত্যন্ত ভালো জানতেন। নাহলে প্রেস ও হরফ ঢালাইয়ের কারখানা হঠাৎ খুলে ফেলা মুখের কথা নয়। গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত প্রেস ছেড়ে দেবার পরই কি প্রেসের কাজে ও হিসাবপত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল? এবং সেই কারণেই কি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোর্ট উইলিয়ামের আশি টাকার চাকরি ছেড়ে ছ-মাসের অবসর নিয়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর ডিপোজিটরির শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে হল? বিদ্যাসাগরের পিতা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরই অনুরোধে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামের কাজ ছেড়ে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরির দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে গ্রহণ করেন। প্রেস ও ডিপোজিটরিতে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং তা লাভজনকও হয়ে ওঠে।[৫১]

কিন্তু বছর দশেক যেতে না যেতে বিদ্যাসাগর ডিপোজিটরির কর্মীদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ডিপোজিটরির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান। সেখানে উপস্থিত কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এর দায়িত্ব নিতে সম্মত হলে বিদ্যাসাগর তাঁকে ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে ডিপোজিটরি দান করেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোভাব জানা যায় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা থেকে: 'আপনি এক্ষণে ডিপজিটরীর কার্য্য রীতিমত চালাইয়া ইহার উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেরূপ হয়, করা যাইবে।' এরও পর দু-একজন লোক পাঁচ-ছয় হাজার টাকা দিয়ে ডিপোজিটরির স্বত্ব কিনতে চান। কিন্তু বিদ্যাসাগর রাজি হননি। তাঁর কথায়, 'যাহা এক জনকে একবার দিয়াছি, কোটি মুদ্রা পাইলেও তাহা ফিরাইয়া লইব না।'[৫২]

এই নিয়ে মতান্তর দেখা দিল দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সঙ্গে। দীনবন্ধুর বক্তব্য হল, যখন বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য কারণে পঞ্চাশ হাজার টাকা মতো ঋণ রয়েছে এবং কেউ কেউ যখন ত্রিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সংস্কৃত ডিপোজিটরির উমেদার তখন ব্রজনাথকে কেন বিনা পয়সায় তা দান করা হল। তাঁর মতে ওই প্রেস স্থাপনের সময় বিদ্যাসাগর দুশো টাকা ধার করে এনে দেন এবং তাতে যে 'অকর্ম্মণ্য কাষ্ঠের প্রেস' এবং 'পুরাতন অক্ষর' কেনা হয় তা দিয়ে তিনি ও মদনমোহন রোজ সকাল নটা পর্যন্ত এবং বিকেল পাঁচটার পর থেকে রাত্রি নটা-দশটা পর্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করে ছাপাখানার কাজ করতেন। অতএব দীনবন্ধুর ওই ছাপাখানা ও ডিপোজিটরিতে অংশ থাকা উচিত। যেহেতু সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি বিদ্যাসাগরের একার সম্পত্তি নয়, সেহেতু বিদ্যাসাগর ইচ্ছেমতো ডিপোজিটরি দান করতে পারেন না। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্র এবং দুর্গামোহন দাসকে মধ্যস্থ মানেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, দীনবন্ধুকে তিনি কখনো পরিশ্রম করতে দেখেননি এবং দীনবন্ধুর যে সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরিতে কোনো অংশ আছে তা তিনি মদনমোহন বা বিদ্যাসাগরের মুখে শোনেননি।[৫৩] এ ছাড়া রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের তৃতীয়ানুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং তাঁর পিতৃব্য-পুত্র

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে[৫৩ক] সাক্ষী মানা হয়। সাক্ষ্য দিতে হবে বলে শম্ভুচন্দ্র দীনবন্ধুকে ছাপাখানার দাবি ত্যাগ করতে বলেন। দীনবন্ধু দাবি ছেড়ে দেন।[৫৪] দীনবন্ধুর ভাষায়, 'সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিরোধ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবী করিয়াছিলাম আমি সে দাবী পরিত্যাগ করিলাম।'[৫৫] বিহারীলাল সরকার অবশ্য লিখেছেন, এর পর বিদ্যাসাগর 'আপনাকে লইয়া চারিভাই ও পিতা মাতা এই কয়জনের নামে ছয় ভাগে ছাপাখানার অংশ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে সালিসীতে ধার্য্য হয়, ছাপাখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্পূর্ণ স্বত্ববান্।'[৫৬]

এর পর ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বা ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ বিদ্যাসাগব তাঁর পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেসের এক-তৃতীয়াংশ চার হাজার টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চার হাজাব টাকায় বিক্রি করেন। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর ছাপাখানার অংশ বিক্রি করে তাঁর দেনা শোধ করেন।[৫৭]

সেই কারণেই ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে বিদ্যাসাগরের উইলে চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি-তে দেখি:

(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ—
(খ) আমার রচিত ও প্রচাবিত পুস্তক—
বাঙ্গালা: ১। বর্ণপরিচয় দুই ভাগ ২। কথামালা ৩। বোধোদয় ৪। চরিতাবলী ৫। আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ ৭। জীবনচরিত ৮। বেতালপঞ্চবিংশতি ৯। শকুন্তলা ১০। সীতার বনবাস ১১। ভ্রান্তিবিলাস ১২। মহাভারত ১৩। সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব ১৪। বিধবা বিবাহ বিচার ১৫। বহুবিবাহ বিচার
সংস্কৃত: ১। উপক্রমণিকা ২। ব্যাকরণ কৌমুদী ৩। ঋজুপাঠ তিনভাগ ৪। মেঘদূত ৫। শকুন্তলা ৬। উত্তরচরিত
(গ) ইঙ্গরেজী: 1. Poetical Selection 2. Selection from Goldsmith
(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।
১। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশু শিক্ষা তিন ভাগ
২। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব।
(ঘ) কাদম্বরী সটীক, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।
(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী, ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী।
(চ) কর্ম্মটারের বাঙ্গালা ও বাগান।

এ ছাড়া ২০ সংখ্যক ধারায় উল্লেখ করেছেন:

> আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয়, তবে এক্ষণে যে রূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্যনির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।[৫৮]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আরেকটি উইলের কথা জানিয়েছেন: 'তাঁহার লোকান্তর গমনের অত্যল্পকাল পূর্বে তাঁহার অভিপ্রায়মতো এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল, অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রোপলিটান কালেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়া বৃদ্ধি হয়, পরিশেষে আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই।'[৫৯]

কিন্তু এই এক-তৃতীয়াংশও বিদ্যাসাগর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বা ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৮ পৌষ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রি করে দেন। বিহারীলালের মতে, 'প্রেসের কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তিহীনতা, এ বিক্রয়ের কারণ; অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক টাকা ঋণশোধ হইয়াছিল।'[৬০]

দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে, বিচক্ষণতায় ও দূরদর্শিতায় যে-প্রেসকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পবিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন-বুঝিতেন...'[৬১]

> শেষ প্রুফ নিজে দেখে দিতেন বিদ্যাসাগর। শেষ প্রুফ দেখার পর কেউ যদি ভুল বের করে দিতে পারত, সে টাকা পেত। একেকটি সেরকম ভুল ধরার জন্য একেক টাকা করে পেত। সেরকম ভুল সুরেশ সমাজপতি ছাড়া আর কেউ কখনো ধরতে পারেননি। ছাপাখানার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বিস্তর পরিশ্রম করেছেন। টাইপকেসে কোথায় কোন বাঙলা অক্ষরটি থাকলে সুবিধা হয়, ছাপার কাজ সহজ হয়, তারও একটা নিয়ম বের করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সাট বলে তাকে।[৬২]

প্রসূন দত্ত তাঁর 'Bengali Letter-Forms: From Vidyasagar to Today' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সাট নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মদনমোহনের *শিশুশিক্ষা*-য় আমরা ৪৮টি অক্ষর পাই অথচ বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এ পাই ৫২টি। বিদ্যাসাগর লক্ষ করেছিলেন য়, ড, ড়, ঢ, ঢ় ইত্যাদির স্বতন্ত্র উচ্চারণ রয়েছে বাংলা ভাষায়। সেইজন্যই বিদ্যাসাগর তাঁর *বর্ণপরিচয়*-এর বিজ্ঞাপনে লেখেন:

> বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।...ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।[২৫]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগর শুধু বর্ণ সংযোজনই করলেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে সংযোজনের কারণও ব্যাখ্যা করলেন। শ্রী দত্ত লিখেছেন: 'There have been other reformers after Vidyasagar but it is really amazing to find that no one of them could come forward and explain the logic behind his own reforms.'[২৬]

বিদ্যাসাগর শুধু কাগজে-কলমে বর্ণ সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েই থামলেন না। তার মান নির্ধারণের জন্য শ্রীরামপুরের একটি ঢালাই কারখানা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। ১৮৫৬-র ২২ ফেব্রুয়ারি ক্রিসটিয়ান এডুকেশন সোসাইটির জন মারডক বাংলা মুদ্রণের সমস্যা, সংস্কার, ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চেয়ে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই তাঁকে হতাশ করেননি। কিন্তু আমাদের হতাশার কারণ বিদ্যাসাগরের সে চিঠির কোনো খোঁজ আমরা পাইনি। খোঁজ পেলে বাংলা হরফের সংস্কার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিজের লেখনী থেকেই আমরা আরও অনেক তথ্য জানতে পারতাম।[২৭]

১৮৪৭ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেকালের সবচেয়ে বড়ো বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা বিদ্যাসাগর এই ব্যাবসা থেকে সরে গেলেও কলেজ স্ট্রিট বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। বিদ্যাসাগরের পর ঊনবিংশ শতকের সাতের দশকে একে একে বেশ কয়েকজন বাঙালি ব্যবসায়ীর আগমন ঘটল কলেজ স্ট্রিটে। কে. এম. মুখার্জি, ৫৪ কলেজ স্ট্রিট; জি. সি. ঘোষ লাইব্রেরি, ৫৪-১ কলেজ স্ট্রিট; শেখ (Shaik) ব্রাদার্স লাইব্রেরি, ৫৫ কলেজ স্ট্রিট; জে. সি. ব্যানার্জির ক্যানিং

লাইব্রেরি, ৫৫ কলেজ স্ট্রিট; বিশ্বাস অ্যাণ্ড সন্‌স (ন্যাশনাল লাইব্রেরি), ৭০ কলেজ স্ট্রিট।[৬৬] এর আগে এ. টি. দেব ছাপার কাজ শুরু করেন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে, পরে প্রকাশনায় আসেন।[৬৭] ১৮৭৬-এ হিন্দু হোস্টেলের সরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন বউবাজারের কাছে। ১৮৮৩-তে এলেন এস. কে. লাহিড়ি, ১৮৮৬-তে বি. ব্যানার্জি, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং, শেখ মৈনুদ্দিন। আরও পরে আর. ক্যামব্রে।[৬৮] ফলে দেখা যাচ্ছে সাত ও আটের দশকে কলেজ স্ট্রিট পাড়া বই ব্যবসায়ীদের পছন্দের জায়গা হয়ে উঠছে। আসলে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল শিক্ষা ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পীঠস্থানে পরিণত হচ্ছিল সেই সময়। একে একে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যালবার্ট হল প্রভৃতি স্থাপিত হলে এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। স্বভাবতই প্রকাশকরাও এই অঞ্চলের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানেই যে, তাঁরা যুগের পরিবর্তনের ধারাকে প্রত্যক্ষ করে কলেজ স্ট্রিটে ব্যাবসা করতে এলেন, বিদ্যাসাগর যার পথ নির্দেশ করেছিলেন ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষেই। বিদ্যাসাগরের মতো কলেজ স্ট্রিটের অনেক প্রকাশক ও বিক্রেতাই প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। সেই সময় স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক প্রায় সবই বিদেশি প্রকাশকের দ্বারা মুদ্রিত হত। 'কলিকাতা পুস্তক বিক্রেতা সমিতি' বা ক্যালকাটা বুক সেলারস অ্যাসোসিয়েশন (আনুমানিক ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠা হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে আন্দোলন করে কিছু পাঠ্যপুস্তক ভারতীয় প্রকাশনার জন্য নির্বাচন করান।[৬৯] সমিতি গঠনের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল বটতলার প্রকাশন শিল্প যে-যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার ছায়া যাতে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়াতে না পড়ে তার দিকে দৃষ্টি রাখা।

বটতলার প্রকাশকদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু পুরাণ, মুসলিম কিস্‌সা, কখনো কেচ্ছা বা আদিরসাত্মক কাহিনি, রহস্যকাহিনি, মহাকাব্য, লোকায়ত পুরাণ ইত্যাদি প্রকাশ। অন্যদিকে, কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের বিদ্যাসাগর এবং তাঁর পরবর্তী প্রকাশকরা মন দিলেন পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দিকে। বটতলার প্রকাশকরা দেশজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন ছিলেন। তাঁদের হাতেই মূলত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সংরক্ষিত হচ্ছিল। জনসাহিত্যের নির্যাস খুঁজতেও আমাদের বটতলায় ফিরে যেতে হয়। কিন্তু বটতলার সমৃদ্ধির যুগেই (১৮৪০-৭০) বিদ্যাসাগর যখন বই প্রকাশনে এলেন, তিনি বেছে নিলেন কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলকে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ধারাকে মাথায় রেখে এবং কলেজ স্ট্রিটের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরবর্তীকালে যেসব প্রকাশক এলেন তাঁরা বটতলার প্রকাশন ধারার বাইরে এক স্বতন্ত্র প্রকাশন ধারা সৃষ্টি করলেন। নবজাগরণের ফলে বাঙালি অভিজাতদের চিন্তা চেতনায় যে আকস্মিক ও গভীর পরিবর্তন দেখা দিল, কলেজ স্ট্রিটের বই ব্যাপারীরা তাকে স্বাগত জানালেন। এই এলিট সমাজের, শিক্ষিত সমাজের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা পুস্তক সম্ভার সাজাতে শুরু করলেন। জনসাহিত্য ক্রমশ প্রান্তিক হতে থাকল। বটতলার গায়ে পড়ল কেবল আদিরসের ছাপ। বই বিক্রির সম্ভাবনা ও আভিজাত্য এই দুই-ই বজায় রাখতে বটতলার সংস্রব ছাড়লেন বহু প্রকাশক। কলেজ স্ট্রিটে শুরু হল বাংলা মুদ্রণের আর এক অধ্যায়।

১ ইন্দ্রমিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, (১৯৬৯, কলকাতা আনন্দ, ১৯৯৭), পৃ ৫৭৩।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংকলিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড (কলকাতা· বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৮), পৃ ৬৯।

৩ ওই, পৃ ৬৬।

৪ শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (১৯৭৭, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬), পৃ ২৭।

৫ অতুল সুর *বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর* (কলকাতা জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫), পৃ ৪৪।

৬ *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, পৃ ৮৮।

৭ *যখন ছাপাখানা এল*, পৃ ৩০।

৮ *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ২য় খণ্ড (১৩৪০, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৪০১), পৃ ৬৬৯।

৯ এই 'ইউনিফর্বমিটি' ও 'স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন' মুদ্রণের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কখনো কখনো কোথাও মনে হয় না কি যে, যে-মানকে আমরা কোনো বইকে বিচার করি তার বাইরেও অন্যকিছু হতে পারত? ভবানীচরণের 'প্রাচীন পুস্তকের মত' ছাপা তারই এক ক্ষুদ্র অসচেতন প্রয়াস। কোনো কোনো প্রকাশক হয়তো বইয়ের বাঁধাই, কভার ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা আনতে চেয়েছেন, কিন্তু একমাত্রিকতার প্রচণ্ড বুরুশ তাঁদের বেশিদিন টিকতে দেয়নি। কিছুদিন আগেই এক বিক্রেতার (যিনি প্রকাশকও) খেদোক্তি শুনছিলাম বইয়ের আকার সম্পর্কে। অন্য এক প্রকাশক বইয়ের এত বিচিত্র আকার করেন যে, তাদের বইয়ের র‍্যাকে হিসেবমতো রাখতে হিমসিম খেতে হয়। কত ছোটো জায়গাতেও এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও ইউনিফর্মিটি আঘাত হেনেছে এটি তার দৃষ্টান্ত। অথচ বইয়ের আকারের এই ভিন্নতা উক্ত প্রকাশক ইচ্ছেমতো করেননি, বরং বইয়ের বিষয় তা দাবি করছিল।

১০ সুকুমার সেনের মতে বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। যদিও অতুল সুর লিখছেন, গঙ্গাকিশোর ১৮১৮-য় একটি বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীপান্থের মতে, তিনি (গঙ্গাকিশোর) প্রথম বাঙালি মুদ্রাকর, প্রকাশক, সংবাদপত্র পরিচালক এবং বই বিক্রেতা।

১১ সুকুমার সেন দুটি বইয়ের নামোল্লেখ করেছেন, *শিশুসেবধি* ও *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*।

১২ রোজারিও প্রেস প্রথমে আমহার্স্ট স্ট্রিটে ছিল, পরে ৮ ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয়। দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, 'বটতলার বই', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা আনন্দ, ১৯৮১), পৃ ২৬৯-৮২।

১৩ *কলকাতার ছাপাখানা*, পৃ ২৮।

১৪ শ্যামল চক্রবর্তী, *ছাপা হরফের হাট* (কলকাতা সাহিত্য সদন, ১৯৭০), পৃ ১৭-১৮।

১৫ অতুল সুরের মতে আরপুলি লেনের কাছে সংস্কৃত যন্ত্রালয় ছিল এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে ছিল বিক্রয় কেন্দ্র। তবে ১৮৭৫-এ সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরির ঠিকানা পাচ্ছি 30 Bechoo Chatterjees Street, ৫৫ সংখ্যক সংস্করণ, *বর্ণপরিচয়*।

১৬ বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (কলকাতা· ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৯), পৃ ১৫৯।

১৭ Prasun Dutta, 'Bengali Letter-Forms From Vidyasagar to Today', *The Golden Book of Vidyasagar A Commemorative Volume* (Kolkata All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee, 1993), p 216

১৮ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ ১৫৯, ১৬২।

১৯ পরমেশ আচার্য, 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', *বাঙালী প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর বিতর্ক* (কলকাতা: নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট, ২০০২), পৃ ৯৭।

২০ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ ১৫২।

২১. *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* পৃ ৪১৯।

২২ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর* (কলকাতা: কলেজস্ট্রীট, ১৪০৪), পৃ ৩০৮।

২৩ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস* (কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯৫), পৃ ৫।

২৪ *বিদ্যাসাগব ও বাঙালী সমাজ,* পৃ ১৬৩।

২৫. *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর,* পৃ ৫৪৩।

২৬ *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস,* পৃ ৩১।

২৭ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* পৃ ১৬৪।

২৮ 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর', পৃ ৯৯-১০১।

২৯. ওই, পৃ ১০৪।

৩০. ওই, পৃ ১০০।

৩১ *বিদ্যাসাগব,* পৃ ৩৩০।

৩২ *করুণাসাগর বিদ্যাসাগব,* পৃ ৫৪২।

৩৩. গোপাল হালদার ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিদ্যাসাগব বচনা সংগ্রহ,* ১ম খণ্ড (কলকাতা: সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২), পরিশিষ্ট, পৃ ৪৪, ৪৮, ৫৭, ৫৫।

৩৪ 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগব', পৃ ১০৫।

৩৫ ওই, পৃ ১০৭।

৩৬ 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগব' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৩৭ *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস,* পৃ ৫-৬।

৩৮ বিপিনবিহাবী গুপ্ত, *পুবাতন প্রসঙ্গ* (কলকাতা পুস্তক বিপনি, ১৯৮৯), পৃ ২৮০।

৩৯ *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস,* পৃ ৩১-২।

৪০ এ সম্পর্কে পরমেশ আচার্য 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে একটি কারণ অনুমান করেছেন। তাঁর কথায়

'এঁদের বন্ধুবিচ্ছেদ হয় ১৮৫০ সালে। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ "ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি"র প্রেসে ছাপা হয ১৮৫০ সালে। . .সালিশির মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত প্রেস বিদ্যাসাগবের সম্পত্তি হয। আব সেই সঙ্গে "শিশুশিক্ষা" তিন ভাগের মালিকানাও বিদ্যাসাগরের হযে যায়। "শিশুশিক্ষা" দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃত প্রেসে ছাপান না হয়েও কী করে বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হয? "শিশুশিক্ষা" দ্বিতীয় ভাগ যদি প্রেস-ভাগাভাগির পরে ছাপা হত তাহলে কোনভাবেই তা সংস্কৃত প্রেস বা বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হয় না। তবে কি শিশুশিক্ষা দ্বিতীয ভাগ "ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি"র প্রেসে ছাপা হওয়ার এবং তাদের ডিপসিটবি থেকে বিক্রি করার দুজনের মধ্যে মন কষাকষি হয়? মদনমোহন কি নিজের একটা বই সংস্কৃতি প্রেসেব আওতার বাইরে বাখতে চেয়েছিলেন? কেন? বলা হয, সংস্কৃত প্রেস ছয়শ' টাকা ধার কবে করা হয়। বই বিক্রি করে ঐ ছয়শ' টাকার দেনা কিন্তু শোধ হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃত প্রেসের প্রথম দিকে মদনমোহনের বই-ই বেশি ছিল এবং তিনিই প্রধানত দেখাশুনা কবতেন। এইসব দিক বিবেচনা কবে মনে হয় কবি ও কোমল-স্বভাব মদনমোহন বিদ্যাসাগরের প্রবল ও অন্য মত সহ্য কবতে না পারার স্বভাবের সঙ্গে বড়ো একটা নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাই হয়তো তার দু-একটা বই সংস্কৃত প্রেসের আওতার বাইরে রাখতে চাইছিলেন। আর সেই থেকে বিরোধের শুরু।'— *বাঙালী প্রবুদ্ধ সমাজেব সীমা,* পৃ ৯০-১।

৪১ *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস,* পৃ ১২-১৩।

৪২. ওই, পৃ ১৩।

৪৩. ওই, পৃ ১৪।

৪৪ ওই, পৃ ১৪-১৫।

৪৫ ওই, পৃ ১৬-১৭।

৪৬ ওই, পৃ ১৭-১৮।

৪৭ ওই, পৃ ১৮-১৯।

৪৮ ১৮৭০ সালের মধ্যে *শিশুশিক্ষা*-র ৪৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত *শিশুশিক্ষা*-র ১৪৯টি সংস্করণ এবং *বর্ণপরিচয়*-এর ১৫২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংস্করণের অর্থ দশ থেকে বিশ হাজার কপি বই।

৪৯ *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, পৃ ৫৭১।

৫০ *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ ১৬৮।

৫১ বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (কলকাতা নবপত্র, ১৩৮৮), পৃ ২১৯-২০।

৫২ ওই, পৃ ২৯৬।

৫৩ *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, পৃ ৩৯৪।

৫৩(ক) পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। প্রথম সরকার অবশ্য ছিলেন মদনমোহন তর্কালংকারের ভগ্নীপতি মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রেসের আর এক কর্মচারীর নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর ঘোষ।

৫৪ বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পৃ ২৭৯-৮০।

৫৫ *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, পৃ ৩৯৪।

৫৬ বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পৃ ২৮০।

৫৭ ওই, পৃ ২৯৩-৪।

৫৮ *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃ ৩৩, ৩২।

৫৯ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর* পৃ ৩৮৫।

৬০. বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, পৃ ৩৬১।

৬১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ', *নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার সম্পাদিত (কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২), পৃ ১১১।

৬১ বিদ্যাসাগর সর্ট বা সাট সম্বন্ধে প্রসূন দত্ত লিখছেন 'Vidyasagar prepared a list of Bengali sorts making up a fount This in Bengal was known as Vidyasagari Sart The word 'Sart' is derived from the English word 'Sorts' which means "any of the individual characters making up a fount of type" Subsequently "Sart" became 'sat' and now it is termed as Vidyasagari sat Bengali Letter-Forms' (p 218)

৬২ *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, পৃ ৫৬৮-৯।

৬৩ *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১।

৬৪ 'Bengali Letter-Forms', p 218

৬৫ *যখন ছাপাখানা এল*, পৃ ১৪৩।

৬৬ Amit Roy, A Short History of Calcutta Book Sellers (1785-1885)' *Satapatra* Centenrary Commemoration Volume (Kolkata Dasgupta & Co , 1987), p 9

৬৭. গোপালচন্দ্র রায়, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, পৃ ৩৬১।

৬৮ *ছাপা হরফের হাট*, পৃ ৩৬।

৬৯. ওই, পৃ ৪০-১।

কোথায় গেল সে পথ-কবিতা

মুনতাসীর মামুন

বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও এর প্রচলন ছিল। আমরা বলতাম 'কবিতা'। চারপেজি, আটপেজি বা ষোলোপেজি ডাবল ডিমাই আকারের নিউজপ্রিন্টে নিম্নমানের প্রেসে ছাপা কবিতা। দামও ছিল কম। এক থেকে চার আনা। পথের ধারে, হাটে-বাজারে বিক্রেতা সুর করে পড়ে বিক্রি করতেন। আমি এই ঢাকায়, বাংলাবাজারে রাস্তার পাশে স্বাধীনতার আগেও কবিতা বিক্রি হতে দেখেছি।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বা উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে এর প্রবল প্রচলন ছিল। ওই সময়ের পূর্ববঙ্গ তো ছিল জলাজঙ্গলে ঢাকা এক সমতলভূমি, যেখানে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাওয়াই ছিল দুরূহ। বিভিন্ন এলাকায় ঘটত বিভিন্ন ঘটনা, এর রেশ অন্য অঞ্চলে পৌঁছাতে সময় লাগত। অনেকসময় যেখানে যা ঘটছে সেখানকার মানুষজন ছাড়া অন্য কেউ তার খবরও রাখত না। তবে কোনো কবি জানলে লিখে ফেলতেন কবিতা, কাছেধারের প্রেস থেকে ছেপে এনে বিক্রি করতেন। এর পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, নগরায়ণ হয়েছে। কিন্তু গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল জোবালো। স্বাধীনতার আগেই বা ঢাকা শহর কী ছিল? এখন অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই 'কবিতা' বের হয় না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছানো যায় দিনের ভেতর। শিক্ষিতের হার বেড়েছে। কাজের চাপ বেশি। খুব ভোরেই দোবে পৌঁছে যায় স্থানীয় বা জাতীয় দৈনিক। 'কবিতা'-কে তাই দেয়া হয়েছে ছুটি।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এ ধরনের যেসব কবিতা বেরিয়েছিল, আজ আর তার খোঁজ পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের কথা না হয় বাদই দিলাম। সাহিত্য গবেষকরা এসব 'কবিতা'কে পাত্তা দেননি। ইতিহাসের গবেষকরাও না। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা জানার জন্য এর চেয়ে ভালো উপাদান পাওয়া যাবে খুবই কম।

অন্য দিক থেকেও এর গুরুত্ব বিবেচনা করা যায়। যিনি এ ধরনের কবিতা লিখতেন তিনি ছিলেন তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ প্রায় ক্ষেত্রে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না। শহরের যে-কবি লিখছেন তার ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য কমবেশি প্রযোজ্য। সমসাময়িকতার যে-প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, সে সম্পর্কে আরও কিছু বলা যায়। যে-বিষয়, ঘটনা কবিকে বিস্মিত, চমকিত, অভিভূত করেছে তা নিয়েই তাৎক্ষণিক বিবরণ তিনি রচনা করেছেন। ফলে সমসাময়িক ঘটনা, বিষয়ের এগুলো বিশ্বস্ত দলিল।

এ প্রসঙ্গে পুথির কথাও আসতে পারে। ওই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর পুথি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তৃণমূল মানুষ বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়েব মনের খোরাক পুথি মিটিয়েছে অনেকাংশে। সমসাময়িক অনেক ঘটনা পুথিতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে পুথির সঙ্গে কবিতার একটা পার্থক্য ছিল। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে ঢাকায়, পুথির ব্যাবসা ছিল মূল বই ব্যাবসার অন্তর্গত। এর ক্লায়েন্ট বা পাঠক শুধু তৃণমূল পর্যায়েরই ছিল না। কবিতা থেকে পুথি একটু অভিজাত।

এ ধরনের বইপত্রকে প্রচলিত ধারায় বলা হয় 'বটতলা'-ব সাহিত্য। শ্রীপান্থ এই ধরনের রচনার সুন্দর নাম দিয়েছেন 'পথ-সাহিত্য'। অবশ্য ব্যাপক অর্থে তিনি তা ব্যবহার করেছেন। পথ-সাহিত্যের যে-সংজ্ঞা বা মূল্যায়ন তিনি করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত। তাঁর ভাষায়. 'পথ-সাহিত্য বলতে গেলে পথের মানুষের জন্য. .যাঁরা ছিলেন এক সময় গ্রামীণ সমাজের নকশার অঙ্গীভূত, লোকসংস্কৃতিই ছিল যাঁদেব রসিক মনের খোরাক। ...নব্য নাগরিক সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। . .প্রাচীন বাংলা মহাকাব্য, পুরাণ কথা এবং ধর্মসাহিত্য, পাঁচালি যদি তাদেব পক্ষে জীবন রসায়ন, তবে প্রহসন আব পথ পুস্তিকা অন্য স্তরে আধুনিকতার আচ্ছাদন। লক্ষণীয় কী প্রহসনে. কী পথ-পুস্তিকায় অহরহ ব্যবহৃত হয় পয়ার অথবা ত্রিপদী, যার সঙ্গে আপামব জনসাধারণ পবিচিত।'

অমৃতলাল বসু পথ-সাহিত্য বা বটতলার গুণগান গেয়েছিলেন এভাবে· 'সে বায়বন নয়, ব্রাউনিং নয়, শেলি নয়, সুইফট নয়। হেম নবীন ববীন্দ্র-সত্যেন্দ্র নয়। কিন্তু সেসব বইয়ের একটা ভাষা, ভাব, ছন্দ রস ছিল যা তার নিজস্ব; পেস্তার মিষ্টতা শখের জলপানে নেই বটে, কিন্তু বর্ষার বৈকালে বাদাম পেস্তাও গরম গরম শখের জলপানের মতো মুখরোচক হয় না।'

বটতলার বই বা 'কবিতা'-কে এখানে পথ-কবিতা হিসেবে উল্লেখ করব। এসব পথ-কবিতায় বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। কবিকে বা তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে যে-ঘটনা আপ্লুত করেছে, সে বিষয় নিয়েই তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়েছে পথ-কবিতা। গত কয়েক বছরে উনিশ শতকে প্রকাশিত এবং অতি দুর্লভ এ ধরনের বেশ কিছু পথ-কবিতার সন্ধান পেয়েছি। সেগুলো নিয়েই আজকের আলোচনা।

যেসব পথ-কবিতার সন্ধান পেয়েছি তার একটা বড়ো অংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে রচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ ভূখণ্ডের মানুষের কাছে নতুন নয়। কিন্তু মনে হয় ১৮৮৭ সালের টর্নেডো ও ১৮৯৭ সালের ঢাকায় ভূমিকম্প পূর্ববঙ্গেব মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ ছিল তাদের কাছে অবাক বিস্ময়। এ দুটি ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও পথ-কবিতা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আমি যেগুলোর নাম জোগাড় করতে পেরেছি সেগুলো দেওয়া হল। প্রথমে লেখকের নাম, তার পর বইয়ের নাম। একই ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রিন্টার, প্রেস, প্রকাশস্থল ও তারিখ। সবশেষে পৃষ্ঠাসংখ্যা, বইয়ের আকার, মূল্য ও মুদ্রণসংখ্যা:

১. অমরচন্দ্র দত্ত, *ভীষণ অগ্নি*, তমিজউদ্দিন আহমদ। চারুযন্ত্র, শেরপুর। ১৮৮৪, পৃ ১৬। ১৬mo.dy। ৬ পয়সা। ২০০০
২. কালী মঙ্গল দত্ত, *শোকাঞ্জলি*, কালীকুমার তর্কভূষণ। শারদ যন্ত্র, চট্টগ্রাম। ১৮৭৯, পৃ ১৪। ১২mo। ২ আনা।
৩. কুশাই সরকার, *নানাবিধ গান*, গোপীনাথ বসাক। স্যমন্তক যন্ত্র, ঢাকা। ১৮৯২, পৃ ১২। ১২mo। ১ আনা। ৩য় সংস্করণ।
৪. গঙ্গা প্রসাদ সাহা, *ভয়ানক ভূমিকম্প*, রামচন্দ্র অনন্ত। বাসন্তী যন্ত্র, ময়মনসিংহ। ১৮৯৮, পৃ ২৪। ৮vo.dy। ৪ আনা। ১০০০
৫. জগৎচন্দ্র নাথ, *অদ্ভুত ভূমিকম্প*, টাঙ্গাইল, ১৮৮৮, পৃ ১৬। ১২vo.dy। ১ আনা। ১০০০
৬. বিপিনচাঁদ গোপ, *ঝড়ের গান*, জগবন্ধু দে। গরীব যন্ত্র, ঢাকা। ১৮৮৮, পৃ ৬। ৬ পয়সা। ১০০০
৭. ভগবানচন্দ্র দাস, *বিষাদ সম্বাদ*, মুরারি মোহন বিশ্বাস। তমোঘ্ন যন্ত্র, রাজশাহি। ১৮৯৯, পৃ ১২৮। ৮vo.dy। ৮ আনা। ৮০০
৮. নগেন্দ্র নাবায়ণ রায়, *পবনের অত্যাচার*, দ্বারকানাথ বসু। সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল। ১৮৭৬, পৃ ১৬। ১২mo। ৬ পয়সা। ৫০০
৯. মোহাম্মদ রহিম বক্স, *শোকার্ণব*, শেখ আব্দুল জব্বার। চৌধুরী প্রেস, বগুড়া। ১৮৯৮, পৃ ৭০। ৮vo.dy। ৪ আনা। ১০০০
১০. হরমোহন ঘোষ, *কামিনী কলঙ্ক*, দ্বারকানাথ বসু। সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল। ১৮৭৯, পৃ ১৭। ২ আনা। ১০০০
১১ হরিবন্ধু চক্রবর্তী, *বাপ্‌রে কী বিষম ঝড়*, দ্বারকানাথ বসু। সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল। ১৮৭৭, পৃ ১৩। ১২mo। ১ আনা। ৫০০

পথ-কবিতা বেশির ভাগই রচিত হয়েছে ১৮৯৭ সালের ঢাকার ভূমিকম্প ও ১৮৮৮ সালের ঢাকার প্রবল টর্নেডো নিয়ে। ঢাকায় ১৮৭৬, ১৮৮৫ সালেও ভূমিকম্প হয়েছিল তবে ১৮৯৭ সালেরটিকে প্রবল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গেজেটিয়ার অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রবল হয়েছিল বটে, তবে প্রাণহানির সংখ্যা খুব বেশি হয়নি। ভূমিকম্পে শাহীন মেডিকেল হল (ঢাকার নামী ওষুধের দোকান), নাজিরের মঠ, শাহবাগ এবং মিসেস স্ট্যানসবারি যে-বাসায় থাকতেন সেগুলো ধসে পড়েছিল এবং এতে নিহত হয়েছিল পাঁচজন। এ ছাড়া কমিশনার, কালেক্টর, জজ ও সিভিল সার্জনের বাড়িসহ ৯টি স্থাপনা এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, তা আর বাসযোগ্য ছিল না। জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ইমারতসমূহ সারানোর জন্য সরকারের ১,৫০,০০০ রুপি লাগবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।

ঢাকায় ভূমিকম্পে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাই এর তেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়নি,

যেমনটি হয়েছিল টর্নেডোর ক্ষেত্রে। এই টর্নেডোর অনেক বিবরণও পাওয়া গেছে যাতে মনে হয় এটি সবাইকে বিস্মিত করেছিল। ঐতিহাসিক যতীন্দ্রমোহন রায় যখন এর বর্ণনা দেন তখন তিনিও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষায়:

> ১৮৮৮ খ্রি: অব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় ঢাকায় যে ভীষণ তুর্নড হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আজিও অনেকের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সমগ্র বঙ্গ দেশে ইহা 'ঢাকার তুর্নড' বলিয়া যে রূপ পরিচিত, বিক্রমপুরে তদ্রূপ ইহা 'হাসাইলের ঝড়' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এ বাত্যা প্রথম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দিক হইতে ঢাকা শহরের দিকে আসিয়াছিল। প্রথমে ঈশান কোণে লোহিত বর্ণের মেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশ ঐ মেঘখানা সমুদয় আকশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং মুহূর্ত মধ্যে উষ্ণ ঝটিকাবর্ত আরম্ভ হইয়া প্রলয়ের ধ্বংসের ন্যায় অট্টালিকা এবং গৃহাদি, ভূমিস্মাৎ করিয়া ফেলে। বিক্রমপুরান্তর্গত হাসাইল, ভরাকর, শৈলকোপা, বিদ্দেল প্রভৃতি কতিপয় গ্রামেও এই ভীষণ ঝটিকাবর্তের প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঢাকা শহরের ৩৫২৭ খানা গৃহ এই তুর্নডের ফলে ধরাশায়ী হয়। ঢাকার নয়ন মনোরম 'আহসান মঞ্জিল' প্রাসাদ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ হুসনী দালান এবং রমনার কালীর মঠ প্রভৃতি ১৪৮ খানা ইষ্টকালয় ভগ্ন হইয়া যায়। বস্তুতঃ এই তুর্নডে ঢাকার প্রায় সমুদয় অট্টালিকারই অল্পাধিক পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৩ জন লোক হত এবং ১৫০০ লোক আহত হইয়াছিল। প্রায় ১২১ খানা নৌকা ও পুলিশ স্টিমার জলমগ্ন হইয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলেও প্রায় ৭০ জন লোক এই ঝটিকাবর্তের প্রবল তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

ঢাকাপ্রকাশ তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল:

> নবাববাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক স্তম্ভ বা হাতিশুঁড় নামিতে দেখে। দেখিতে দেখিতে ঐ জলস্তম্ভটি দ্বিখণ্ড হইয়া একভাগ পশ্চিম দিকে ও একভাগ নবাববাড়ীর দিকে প্রধাবিত হয়। উহা দ্বিখণ্ড হওয়ার সময়ই উহা হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিময় গোলা উড্ডীন হইতে লোকে দেখিয়াছিল। যখন উহা নবাববাড়ীর ধ্বংস সাধনে নিরত হয়, তখন দূরবর্তী লোকে নবাববাড়ীটাকে যেন প্রজ্বলিত অগ্নিময় দেখিয়াছিল।

> বাত্যাবর্তের শব্দ শুনিয়া নবাব সাহেবগণ আপনাপন প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া উত্তর দিকের বারিন্দায় আসিয়াছিলেন, যেই তাঁহাদের আসা অমনি পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠগুলি চুরমার হইয়াছিল।

কুশাই সরকার সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখতেন। পথকবি ছিলেন তিনি। বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা তার কবিতার সংকলন, *নানাবিধ গান*-এ ঢাকার টর্নেডো নিয়ে দীর্ঘ এক কবিতা আছে। ওই কবিতায় ঢাকার কী কী ক্ষতি হয়েছিল তার বর্ণনা আছে। কুশাই-র 'গান' অনুযায়ী হাজারিবাগ থেকে তুফান শুরু হয়ে ব্যাপ্ত হয় বাড্ডানগর, বাগালপুর (!) নবাবগঞ্জ, চৌধুরী বাজারে। এখানে অসংখ্য ঘর ধসে গেছে (এর অধিকাংশ বোধ হয় ছিল কুটির)। ঝড় এর পর আমলিগোলা হয়ে লালবাগে প্রবেশ করে। সেখানে কিছু সেপাই জখম হয়, মারা যায় একজন হাবিলদার। সেখান থেকে 'তুফান ছুইটে পরে এইসে' চাঁদনিঘাট, রহমতগঞ্জ ও চকবাজারে। জেলের এক কোনা ভেঙে তুফান বেগমবাজার হয়ে মুঘলটুলি ঘুরে হানা দেয় কুমারটুলি। লন্ডভন্ড করে দিয়েছে সেখানকার দালানকোঠা। এ ছাড়া নৌকা চুরমার হয়ে গেছে, শাহবাগ, স্কুল-কলেজের বাগান ধ্বংসস্তূপ। জখম হয়েছেও অনেক। আসলে কুশাইর কবিতায় যে কাঁচা অনুভবটি আসে তা আমার বিবরণে অসম্ভব। তাই পরিশিষ্টে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছি।

ঢাকা ছাড়া বরিশালের ওপর হয়ে যাওয়া টর্নেডো সম্পর্কে রচিত হয়েছে তিনটি পথ-কবিতা। বরিশাল প্রায়ই ঝড় বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে বিখ্যাত হল ১৮৫৪, ১৮৭৮, ১৮২২, ১৮৬৯, ১৮৭৭, ১৯১০, ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। উল্লিখিত তিনটি বই রচিত হয়েছে ১৮৭৬ সালের সাইক্লোন নিয়ে।

১৮৭৬ সালের সাইক্লোনটি আঘাত হানে ভোলার ওপর। ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় এ ঝড় শুরু হয়। সমগ্র দ্বীপটি তলিয়ে যায় ১০ থেকে ৪৫ ফুট পানির নিচে। এ ঝড়ে ভোলার ৩০ থেকে ৪০ ভাগ মানুষ প্রাণ হারায়। পটুয়াখালি সহ এ দ্বীপে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখের মতো।

তিনটি কবিতার বইয়ের মধ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে *কামিনী কলঙ্ক* নিয়ে খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছে। ঝড়ের ঝাপটায় বিপর্যস্ত রমণীদের নিয়ে নিম্ন জাতীয়রা নানা দুর্নামে মেতে ওঠে:

> and tells a story of a young Hindu widow who bravely repelled a brutal attack on her virtue, but had to yield in the end...therefore committed suicide.

নগেন্দ্রনারায়ণ রায় *পবনের অত্যাচার*-এ লিখেছিলেন:

হে প্রভো দৌলত খাঁর শুন কিছু মর্ম্ম
সমুদ্রের বাধ বেটা সহায় করিয়ে।
একেবারে পাজি বেটা লয়েছে লুটিয়ে॥
প্রাণিহত্যা কতশত করেছে দুর্জ্জন।
মহকুমা সুদ্ধ বেটা করেছে হরণ॥
ইহা ভিন্ন পল্লীগ্রামে হাজার হাজার।
করিয়াছে সণ্ডাবেটা সমূহে সংহার॥
একজন বৃদ্ধ কতো বিলাপ করিয়ে।
করাঘাত হানিতেছে কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥
মুখেও বলেছে বৃদ্ধ কোথা পুত্রগণ
পবনের অত্যাচারে ত্যাজিল জীবন।

এই ঝড় নিয়ে লিখেছিলেন হরিবন্ধু চক্রবর্তী *বাপ্‌রে কি বিষম ঝড়!* তবে তিনি তা লিখেছিলেন 'চড়ামদ্ধি শ্রীযুক্ত ফজলে আলী খাঁ চৌধুরী জমিদার সাহেবের আদেশক্রমে'। মূলত লেঃ গভর্নরেব ত্রাণকর্মের প্রশংসা করেই এটি লেখা। সেটি স্বাভাবিক। জমিদার ফজলে আলি চেয়েছিলেন, তিনি যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুরের একনিষ্ঠ সেবক তা যেন গভর্নর জানেন। হরিবন্ধু লিখেছেন:

সলীলে ভাসিয়ে গিছে মৃত্তিকার সুর॥
চট্টগ্রাম, সুধারাম, সাহাবাজপুর।
ভেঙ্গে চুরে একেবারে সব চূর চূর॥
ঝড়ে পড়ে অঙ্গে আর কারো নাই বল।
হাহাকার করিতেছে জীবিত সকল॥

সুধারাম হল আজকের নোয়াখালি আর সাহাবাজপুর হল ভোলা। সবশেষে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি আবেদন জানিয়ে লেখা হয়েছিল:

ওগো মা ভারতেশ্বরি। দেখ একবার
বঙ্গেতে কি দুরাবস্থা তোমার প্রজার॥
কি খাইবে কি পরিবে ভেসে গিছে সব।
অনাহারে মরিতেছে জীবিত মানব॥

অন্যান্য পথ-কবিতাগুলো আমি দেখিনি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জেনেছি, অমরচন্দ্রের *ভীষণ অগ্নি* লেখা হয়েছিল ময়মনসিংহের এক অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে। গঙ্গাপ্রসাদ সাহার *ভয়ানক ভূমিকম্প*-র মূল বক্তব্য ছিল ধর্মেকর্মে মতি না থাকাতেই এসব দুর্যোগ হচ্ছে। ভগবানচন্দ্র ১৮৮৮ আর রহিম বক্স ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প নিয়ে লিখেছিলেন। এ পর্যন্ত উল্লিখিত পথ-কবিতার মধ্যে ভগবানচন্দ্রের বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাই বেশি। তবে এর অন্য আরেকটি বিষয় ছিল পুটিয়ার কুমার ও রানি স্বর্ণময়ীর মৃত্যু।

বিভিন্ন উৎসব নিয়েও প্রকাশিত হয়েছে পথ-কবিতা। তবে এগুলো ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব ও তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত কোনো পথ-কবিতা চোখে পড়েনি। এমনও হতে পারে মুসলমান পথ-কবির সংখ্যা স্বল্প। এ ধরনের কিছু বই হল:

১২. গৌরচন্দ্র কুণ্ড, *দোলযাত্রা উপলক্ষে বাইজি স্রোত*, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।
১৩. লেখকের নাম নেই, *শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ বসন্ত উৎসব*। [ও] *শ্রী পঞ্চমী পূজার মেলা*, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চৌধুরী প্রেস, বগুড়া। ১৮৯৩, পৃ ১১। ১২mo। ২ পয়সা।
১৪. সুরেশচন্দ্র নন্দী, *নারায়ণী স্নান*, রামচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত, বগুড়া। ১৮৯৯, পৃ ৯। ১২mo.dy। ৬ পয়সা। ১০০০

গৌরচন্দ্রের বই সম্পর্কে গেজেট থেকে খানিকটা জানা গেছে। চট্টগ্রামে দোলযাত্রার সময় বড়োলোক বা বাবুরা বাইজিদের ভাড়া করে আনতেন আমোদফুর্তি করতে। এটি লেখকের কাছে মনে হয়েছে খুবই অনৈতিক কাজ।

এলাকার বিবরণ নিয়েও প্রকাশিত হয়েছিল কিছু পথ-কবিতা। এ ধরনের তিনটি বইয়ের খোঁজ পেয়েছি:

১৫. গোপালচন্দ্র সিনহা, *তাজহাট বর্ণনা*, কোলকাতায় মুদ্রিত, যশোর থেকে প্রকাশিত, যশোর। ১৮৮২, পৃ ২৩। ১২mo.dy। ২ আনা। ৫০০
১৬. বঙ্কবিহারী মুখোপাধ্যায়, *করটিয়া বার্তা*, মীর আতাহার আলী। মহমুদিয়া যন্ত্র। করটিয়া। ১৮৯১ পৃ ৩০। ১ আনা। ৬০০
১৭. মুরারী মোহন বিশ্বাস, *রামপুর যৎকিঞ্চিৎ*, লেখক কর্তৃক মুদ্রিত, রামপুর বোয়ালিয়া। ১৮৯৬ পৃ ১৩। ১৬mo.dy । ২ সং। ১ আনা ৩ পয়সা। ১০০০

পূর্ববঙ্গের মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ বাস করত শহরে। পুরো উনিশ

শতকে শহরবাসীর হার খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পূর্ববঙ্গে মোট জনসংখ্যার ৩.৯% বাস করত শহরে। তাই কোনো এলাকা খানিকটা উন্নত হলেই তাকে শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হত।

মুবারীমোহনের দুটি পথ-কবিতার সন্ধান পেয়েছি। মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর আরও কিছু বই বেরিয়েছিল যার সন্ধান পাইনি। বাস করতেন তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ায়। আজকের রামপুর-বোয়ালিয়া রাজশাহি শহরের অন্তর্গত হলেও তখন তার স্বাতন্ত্র্য ছিল। রাজশাহির সদর ছিল রামপুর-বোযালিয়া। ১৮৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকার পর শহর হিসেবে স্থান ছিল চট্টগ্রাম ও রামপুর-বোয়ালিয়ায়। এসব শহরের লোকসংখ্যা ছিল ২০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে। তাই রামপুর-বোয়ালিয়ার কবি গর্বিত হয়ে লিখতে পারেন

রামপুর-বোয়ালিয়া, শান্তিময় শোভনীয়া
বহুলোক অবস্থিত তথা।
চারিদিগে মনোহর, উচ্চতর পাকাঘর
ধবল-পর্বত-শ্রেণী যথা।

গোপালচন্দ্র যে-তাজহাটের বর্ণনা করেছেন খুব সম্ভব তা রংপুরের তাজহাটের। তাজহাটের জমিদারের বেশ নামডাক ছিল। তাদের বিশাল ভবনটি এখন তাজহাটে তাঁদের জাঁকজমকের প্রতীক। *করটিয়া বার্তা*-য় বঙ্কবিহারী করটিয়াব সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখকের মতে, করটিয়া সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাস। তাঁদের বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরেছেন পথ-কবিতায়।

পূর্ববঙ্গ তো সোনার বাংলা কখনো ছিল না। দুর্ভিক্ষ, অনটন লেগেই থাকত এ অঞ্চলে। বিভিন্ন স্থানে স্থানীয়ভাবেও খাদ্যাভাব দেখা দিত। এসব নিয়েও প্রকাশিত হয়েছে পথ-কবিতা। এরকম কয়েকটির খোঁজ আমি পেয়েছি:

১৮. জমির উদ্দিন আহামত, *দুর্ভিক্ষ বিবৃতি*, জালালউদ্দিন আহমদ। বাসন্তী যন্ত্র, ময়মনসিংহ ১৮৯২, পৃ ৯। ১২mo.dy। ৬ পয়সা। ৬০০
১৯ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, *দুর্ভিক্ষের ছবি*, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। রমেন্দ্র যন্ত্র, নোয়াখালি। ১৮৯৫, পৃ ২৬। ১৬mo.dy। ১ আনা। ১০০০

বই দুটি আমি দেখিনি। তবে সরকারি দলিলে দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য আছে। কবির মতে, ঠিকঠাকমতো ধর্ম পালন না করার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর স্বর্গের এই অভিশাপ নেমে এসেছিল। তবে, 'As a loyal-subject of the Queen-Empress the writer is unable to say whether or not the

sufferings of the people are caused also by the faults of their rulers.'

বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে যে কবিতা লেখা হত তার কথা আগেই লিখেছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বেশি লেখা হত বলে সেগুলো আলাদাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি। এ ধারাবাহিকতায় আর দুটি কবিতার বইয়ের নাম উল্লেখ করছি:

২০. দ্বারকানাথ মিত্র, *হায় কী সর্ব্বনাশ*, জগৎচন্দ্র দাস। চন্দ্রশেখর যন্ত্র, চট্টগ্রাম। ১৮৯১, পৃ ১৮। ১৬mo । ১ আনা। ৫০০

২১. *সেন্সাস সঙ্গীত*, কোলকাতায় মুদ্রিত। যশোর। ১৮৯১, পৃ ৮। ১২mo.dy । ৬ পয়সা। ১০০০

আদমশুমারি বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রবল কৌতূহল ও অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমশুমারি বা সেন্সাস হয়। সে থেকে দশ বছর পর পর আদমশুমারি হয়েছে। এসব আদমশুমারি আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে মনে রাখতে হবে, সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায়ের ভেতর বিভিন্ন বিভেদ সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে এই সেন্সাস। প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষ আদমশুমারি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিল কারণ, জনমানসে তারা এ ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছিল যে, বর্ণগত ক্রম সামাজিক মর্যাদার চিহ্নজ্ঞাপক। ওই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালের আদমশুমারির সময় যে-পরিমাণ দরখাস্ত কর্তৃপক্ষ সমীপে জমা দেয়া হয়েছিল তার ওজনই ছিল দেড় মনের মতো।

সেন্সাস সঙ্গীত-এ বর্ণিত হয়েছে সেন্সাস নিয়ে যে বিরাট দক্ষযজ্ঞ হয় তার বিবরণ এবং মানুষজন যেসব বিষয়ে অভিযোগ করছে সেসবও। গেজেট অনুসারে:

> Humorous description of the census operations in India and the complaints of the different bodies of men, such as enumerators, tabulators connected with the operation.

১৮৯০-এর দিকে ভারত জুড়ে রক্ষণশীলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 'এজ অফ কনসেন্ট বিল' বা 'সহবাস সম্মতি আইন'। সংক্ষেপে, এই আইনের মূল কথা ছিল, ১২ বছরের নীচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত কোনো বালিকার সঙ্গে তার সম্মতিতে অথবা অসম্মতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৮৯১ সালের ভারতীয় পিনাল কোডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার অ্যান্ড্রু স্কোবল বিল আকারে এই আইন উত্থাপন করেন এবং ভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমান এ আইনের বিরোধিতা শুরু করে। ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে এই আইনের বিরোধিতা করেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ।

কবি কায়কোবাদও এই বিলের বিপক্ষে কবিতা রচনা করেছিলেন। তবে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

দ্বারকানাথ মিত্র সেই বিষয় নিয়েই লিখেছেন। বিশেষ করে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিরাট সভা নিয়ে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী 'সাত সহস্র' লোক উপস্থিত ছিল। দ্বারকানাথের কবিতা সম্পর্কে সরকারি গ্রন্থাগারিকের মন্তব্য হল:

> Celebrates the glory of the great mass meeting at the maidan in favour of the agitation against the Age of Consent Bill The writer uses very strong language

অন্যান্য বিষয়, বিশেষ করে অশ্লীল কিছু পথ-কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল স্রেফ বিক্রির আশায়। এ ধরনের কয়েকটির উদাহরণ

২২. কৃষ্ণগোবিন্দ দাশগুপ্ত, *বেনারসী চাটনী*, শিশির কুমার দাস। আর্য্য প্রেস, সিরাজগঞ্জ। ১৮৯৫, পৃ ৭৮। ১২mo। ৩ আনা। ১০০০
২৩. জানকীনাথ দাস, গুপ্ত *বৃন্দাবন মাহাত্ম্য কবিতা*, মীর রাব্বানী। মাহমুদিয়া যন্ত্র, টাঙ্গাইল। ১৮৮৮, পৃ ৪। ১২mo.dy। ৬ পয়সা। ১০০০
২৪ জে-দে, *কাল*, নোয়াখালী-১৮৯৯। পৃ ৮। ৮vo।
২৫. মুন্সী কাজেমউদ্দিন আলী খান, *ঘরজামাতার দুঃখের কথা*, চন্দ্রকুমার সরকার। আনন্দ যন্ত্র, ময়মনসিংহ। ১৮৭৯, পৃ ৮। dy. ১২mo। ১ আনা। ১০০০

এর কোনোটিই আমি দেখিনি। তবে, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী *কাল* ও *চাটনী* দুটিই অশ্লীল। অবশ্য নামকরণেই তা অনুমান করা যায়। *বেনারসী চাটনী* সম্পর্কে মন্তব্য 'এ ভালগার প্রোডাকশন'।

ঘরজামাতার দুঃখের কথা-র বিষয় নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায়। ঘরজামাই হওয়ার গ্লানি লেখক বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তবে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘরজামাই রাখার প্রবণতা ও ঘরজামাইর দুর্দশা বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের মধ্যেও তো ঘরজামাই ছিল, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ। কবির পরামর্শ, ঘরজামাই হওয়ার আগে ভেবেচিন্তে এগুনো ভালো।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে যেসব বই বেরিয়েছিল বা গেজেটে যেগুলোকে বই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল পথ-কবিতা। শ্রীপান্থ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'কী প্রহসনে, কী পথপুস্তিকায় অহরহ ব্যবহৃত হয় পয়ার অথবা ত্রিপদী, যার সঙ্গে নানাভাবে আপামর জনসাধারণ পরিচিত। বই যখন গদ্যে লেখা অর্থাৎ আধুনিক বাহনে, তখন থেকেই কাহিনী প্রায়শ মোড় নিতে চায় পদ্যে। গদ্য যখন, তখনও প্রয়োজনে কখনও কখনও চলে আসে মুখের ভাষা।' এমনকী আঞ্চলিক ভাষা

পর্যন্ত। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য বইয়ের তুলনায় পথ-কবিতার বিক্রিও ছিল ভালো। অধিকাংশ পথ-কবিতা কমপক্ষে ১০০০ কপি ছাপা হত। আমরা বিভিন্ন সংস্করণের হিসাব পাইনি। তবে উদাহরণ হিসেবে কুশাই সরকারের *নানাবিধ গান*-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। কয়েকটি সংস্করণে এর ৯০০০ কপি ছাপা হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি, এ ধরনের বইগুলো সংরক্ষিত হয়নি, হারিয়ে গেছে। যে-কটির (নামের) সন্ধান পেয়েছি তার উল্লেখ করেছি। পরিশিষ্টে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি এ কথা বোঝাবার জন্য যে, পূর্ববঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে পথ-কবিতা কত মূল্যবান ছিল।

পরিশিষ্ট-১

বাপ্‌রে কি বিষম ঝড়!

আসিলেন, লেপ্টনেন্ট বাহাদুব।
পূর্ব্ব বঙ্গলার দুঃখ করিবারে দূব॥
দেখিলেন দৌলত খাঁ নাহি ভরপুর।
সলীলে ভাসিয়ে গিছে মৃত্তিকার সুর॥
চট্টগ্রাম, সুধারাম, সাহাবাজপুব।
ভেঙ্গে চুরে একেবারে সব চুর চুর॥
ঝড়ে পড়ে অঙ্গে আর কারো নাই বল।
হাহাকার করিতেছে জীবিত সকল॥
অন্ন বিনে ছিন্ন হলো শরীরের কল।
অন্ন দে অন্ন দে বাবা! অন্ন দেরে বল॥
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেব দয়ালু স্বভাব।
প্রলিপ্ত হইল, দূর করিতে অভাব॥
কহে হরি কব তুড়ি ধর্ম্ম অবতাব।
অন্নবস্ত্র বিনে কিছু নাহি চাই আর॥
চাডমন্ধি হতে পূর্ব্বদেশ বসাতল।
ফালাইয়া, বাউফল বিহীন-সম্বল॥
ত্বরা করি নৌকা ভবি চাল, ডাল নিযে।
ত্রৈলোক্য কৈলাস যাচ্ছে স্থানে২ গিযে॥
অন্ন বিনে ছিন্ন হলো শরীরের কল।
অন্ন দে অন্ন দে বাবা! অন্ন দেরে বল॥
ওগো মা ভারতেশ্বরি! দেখ একবাব
বঙ্গেতে কি দুরাবস্থা তোমার প্রজাব॥
কি খাইবে কি পবিবে ভেসে গিছে সব।
অনাহারে মরিতেছে জীবিত মানব॥
সবলের বল তুমি অবলের বল।
তব বলে বলবান বাঙ্গালী দুর্ব্বল॥

অন্ন বিনে ছিন্ন হলো শবীরেব কল।
অন্ন দে অন্ন দে বাবা অন্ন দেরে বল॥
(হবিবন্ধু চক্রবর্তী, *বাপ্‌বে কি বিষম* ঝড়, ববিশাল, ১২৮৩)

পরিশিষ্ট-২

ঝড়ের গান

ঈশ্ববেব অপার নিলা বুজা ভাব২ আছে সাধ্য কাব।
বুজি বাউরূপে এলেন হরি নিবাবিতে ধরাভাব।
১২৯৪ সনে, চৈত্র মাসেব ২৬ দিনে
শনিবাব সন্ধ্যাব পবে খণ্ড প্রলয হল সঞ্চব।
ঘূর্ন বায়ু এইসে বেগে ঘুইবে উঠে উদ্ধ ভাগে
বিপবীত এক শব্দ ডাকে শুইনলো লোকের চমৎকার।
পশ্চিম হইতে তুফান ছুইটে, হাজারীবাগ দিয়া উঠে,
খেরী ঘব আর মেইটে কোঠে
কত বেইঙ্গেছে অপার।
বাড্ডানগর বাগলপুরে নবাবগঞ্জ চন্দ্রি বাজারে
জত ঘর গিযাছে পইবে
সংখ্যা কবা নাজায তার।
সিকসেন ভেঙে আমলি ালা, প্রবেশ করে লালবাগের কিল্লা,
সিপাই জখম কতগুলা
মরে একজন হাওলাদাব।
সেখান হইতে তুফান ছুইটে পরে এসে চান্নিঘাটে
রমৎগঞ্জ এক চাপটে
ভেঙে এইল চক্‌বাজাব।
ভেঙে জেলখানা নবিত কোনা, বেগম বাজাব দিচ্ছে হানা,
মোগটুলী কয়েকখানা
দোকান ঘর ভেঙ্গে আর।
কুমাবটুলী যে অবস্থা কিছু না রেখেছে আস্থা
নাস্থা খাস্তা তিন অবস্থা
দালান কোঠা একাকার।
বংশীবাজাব সজিব বাখি, বাবুব বাজার দিয়ে বাঁকী
বেগে দলে দক্ষিণমুখী
বুড়িগঙ্গা হইলে পাব।
পাব হইতে ঝরেব মুখে পইবে ছিল যত নৌকা
আছারিয়া ঘূর্ণাপাকে
কইবে গেছে চুবমাব।
যতলোক গিয়াছে মাবা, জন্মসূত্রে ছিল ধবা,
দগ্ধাকার কইরে জিঞ্জিবা
ঢাকা হইল পুনর্ব্বার।

এই যে নবাব বাড়ির কীর্ত্তিকাণ্ড কৈরাছে সব লণ্ডভণ্ড
আর কৈরাছে খণ্ড ?
ভেঙ্গেছে লোহার কাটার।
বাগান ছিল পরিপূর্ণ; কৈরেছে সব ছিন্নভিন্ন,
বৃক্ষাবিদ সব শূন্য
কিছু চিনে নাহি তার।
লক্ষ টাকার যে রংমহল সেখানে পর হইল প্রবল
ফেলেছে ছাঁদ ভেঙ্গে সকল
কিছুমাত্র নাই বাহার।
কত দালান গিছে পৈরা, কতবা বৈয়াছে খারা,
কৈরাছে সব আস্তর খারা
দেখিতে বিকৃতি আকার।
নগদখানায় প্রবেশ করি ভেঙ্গেছে আলায়ের ঘড়ী
নায়েবদের আউ ভারী
তারা পেয়েছে নিস্তার।
উঠাইয়ে ছাঁদ বিষম ঝরে, নিয়ে গেছে স্থানান্তরে,
দপ্তর খানা ভেঙে করে
হত্যা একজনা।
নবাব বাড়ির বহু লোকের হইল মরণ রমণ বাবু গোবর্দ্ধন
ঝর হইল মৃত্যুর কারণ
জৈ এ জয়চন্দ্র পাল জমিদার
নাজানী কোন কর্ম্ম ফেবে নাজির বাবু কাশী ছাইরে
আসিযে দুই দিনের তরে
এ ঝরে হইল সংহার;
কোতালীর বারীন্দা ফেলে সাফারী বাজারে চলে
জাবার কালে
ভেঙে নিল কান্নিশ শয্যা ধন সাহার
সেখানে ভেঙ্গে বহুতর ফেলেছে বারিন্দা ছাপার
কবিরাজের গল্লীর ভিতরে
ভেঙে গিছে সারা সার;
পটুয়াটুলী গিয়ে ঝবি ভগ্ন কৈরি কালীবাড়ী
তবু সে আফিলেশ্বরী
ডিরে আছে মা আমার।
পশ্চিম কোনা দিচ্ছে ফেলে শূন্যেতে ছাঁদ আইছে ঝুইলে
বিশ্বাম্বর মার পদতলে
প্রলয়ে কি করে তার
জুবিলি স্কুলের দুইটা বিপরীত ঘর টিনের আটা
কৈরী তারে উল্টাপাল্টা
উডাচ্ছে ফুসের আকার।
যাইয়া কলেজ স্কুলে দেবদারুর বৃক্ষ ফেলে
পুনঃব্যব গিছে চলে

নির্ণয়ে নাহি তাহার
কেহ গিছে ডাক্তারখানা কেহ লাগায় হলদী চুনা,
কেহ বান্দিয়া তেনা
দিতে আছে জলদাব।

(কুশাই সরকার, *নানাবিধ গান*, ঢাকা, ১৮৯২)

পরিশিষ্ট-৩

রামপুর-বোয়ালিয়া

রামপুর-বোয়ালিয়া, শান্তিময় শোভনীয়া
বহুলোক অবস্থিত তথা।
চারিদিগে মনোহর, উচ্চতর পাকাঘর
ধবল-পর্ব্বত-শ্রেণী যথা॥
রাজপথে অবিরত; চেরিয়ট বাগী কত
চলিতেছে ঘর্ঘর নির্ঘোষে।
চক্রাঘাতে যেন ধরা, প্রকম্পিত কলেবরা
হইতেছে অতিশয় রোষে॥
দোকানি পসারী যত, তাহারা কহিব কত
স্থানে স্থানে দেব-নিকেতন।
বহুবিধ পাঠশালা, বিস্তর বালক বালা
প্রতিদিন করে অধ্যয়ন॥
উকিল মোক্তারগণ উপার্জ্জনে অনুক্ষণ
মত্ত হয়ে হরিতেছে কাল।
অন্য কথা নাই মুখে; অজুহাত, লয়ে সুখে
করিতেছে জোবাব সোওয়াল॥
সুবিছান ধনী আর, ছোট বড জমিদার
বণিক প্রভৃতি মহাজন।
ফটোগ্রাফ ছাপাখানা, এইমন আছে না না
লাইব্রারি চিকিৎসা-ভবন॥
জেলায় কাছারী ঘর, অতিশয মনোহর
লৌহময় তীর বর্গা তায়।
গিবিজা ঘরের কায় গিরিজানথের প্রায়
সুশোভিদ ধবল-আভায়॥
রজত পর্ব্বত সম, ধর্ম্ম-মট মনোরম
আব ব্রাহ্ম সমাজের ঘর।
রামপুরে দুই দল, উভয়ে উভয়-ছল
যপাসি বেডায় নিরন্তর॥
বেশ্যাগণ অগণন, যথাতথা প্রতিক্ষণ
নিরীক্ষণ করে শত শত।
মুখে সুধাসম হাসি, অন্তরে গরল রাশি
যাতে দিন মান প্রাণ হত॥

(মুরারীমোহন বিশ্বাস, *বামপুবাব যৎকিঞ্চিৎ*, রামপুর-বোয়ালিয়া, ১৮৬৭)

পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ

অলোক রায়

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় পুরোনো বইয়ের একটা বিরাট বাজার ছিল। কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে পাওয়া যেত না এমন বই বোধ হয় ছিল না। বিশেষভাবে লেখক-উপহৃত লেখক-স্বাক্ষরিত বই একমাত্র ওখানেই মিলত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংস্করণের বই খুব দুর্লভ ছিল না। শ্যামবাজার, হাতিবাগান, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ডালহাউসির ফুটপাতে মিলত দুষ্প্রাপ্য পুরোনো পত্রিকার সেট, ইংরেজি-বাংলা প্রায় যে-কোনো পুরোনো বই। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ থেকে শুরু করে হেন পুস্তকপ্রেমী ছিলেন না, যাঁকে কলেজ স্ট্রিটের রেলিঙের ধারে দেখা যেত না। পঞ্চাশ সালের আগের কথা অবশ্য আমার জানা নেই। আমি কলেজে পড়ার সময় থেকে বই সংগ্রহ শুরু করি। তার পর পঞ্চাশ বছর কেটেছে। এই সময়ের মধ্যে পুরোনো বইয়ের বাজারের চরিত্র অনেক বদলেছে। দেশবিভাগের পর অন্তত বছর-কুড়ি ওপার বাংলা থেকে প্রচুর বই এপার বাংলায় চলে আসে। যাঁরা বই এনেছিলেন তাঁরা বই বিক্রি করার জন্য আনেননি, বই ভালোবাসেন বলে জমি-জায়গা ছাড়তে পারলেও বই ছাড়তে পারেননি। কিন্তু তার পর সেই বই রাখতে পারেননি। বাসস্থানের সমস্যা, অর্থাভাব, বংশধরদের রুচিবদল—পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহকে গৃহ থেকে ফুটপাতে স্থানান্তরিত করেছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহি, রংপুরের জমিদার বা উচ্চবিত্ত শিক্ষিতজন সম্ভবত অনেকেই বই সংগ্রহ করতেন। আমি এরকম বই অনেক দেখেছি, পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে নিজেও সংগ্রহ করেছি চামড়া দিয়ে বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা বা রবার স্ট্যাম্পে স্বত্বাধিকারীর নামঠিকানা লেখা বই। পারিবারিক সংগ্রহ পৌঁছে গেছে পুরোনো বইয়ের দোকানে, আবার সেখান থেকে বই কিনে গড়ে উঠেছে নতুন পারিবারিক সংগ্রহ। এইভাবে বইয়ের হাতবদল চলতে থাকে। এমনিতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু হাতবদলের মাঝপথে কিছু বই পথভ্রষ্ট হয়ে চিরতরে বিনষ্ট হয়। কোথাও কোনো বই স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয় না। ফলে দরকারি বইয়ের সন্ধান মেলে না অনেকসময়।

পারিবারিক সংগ্রহ অধিকাংশ সময়ে শুরু হয় ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে। তার পর চক্রবৃদ্ধিহারে কয়েক পুরুষের চেষ্টায় বিত্তের পরিমাণ যেমন বাড়ে, বইয়ের সংখ্যাও

বাড়ে। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের (১৭৩৩-৯৭) জীবনীকারেরা তাঁকে শুধু বিদ্যোৎসাহী নয়, অসামান্য সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি ভাষায় পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির রোমাঞ্চকর জীবনে পড়াশোনা করার সময় তিনি কখন পেলেন জানা যায় না, কিন্তু তাঁর পুথি ও পুস্তক সংগ্রহ এ দেশে প্রবাদতুল্য:

> His collection of books and manuscripts, Sanskrit, Arabic and Persian, was large and valuable. It included many rare and original works, and the Sanskrit and Persian manuscripts in particular appear to have been compiled at great cost and with the most laborious and discriminative research. They bear evidence of the universality of tastes and of his general appreciation of learning. No private person's library in this country could be compared to Nubkissen's in respect of the value of ancient manuscripts. (N. N Ghose, *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur,* 1901)

পরবর্তীকালে রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) সেই সংগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন। কলকাতায় পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে সভাবাজার রাজবাড়ির স্থান সম্ভবত সর্বোচ্চে বলা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কাজ করেছেন তখন তিনি সেখানে প্রায় যাবতীয় বই-পত্রিকা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু দেব-পরিবারে লেখাপড়া জানা ব্যক্তির অভাব না থাকলেও (আমাদের সময়ে আমরা হারীতকৃষ্ণ দেবকে দেখেছি) যৌথ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যিনি যখন লাইব্রেরির চাবি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, তখন তিনি যথেচ্ছভাবে বই ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন সকলকে, এবং অধিকাংশ সময়ে সে সুযোগের অসদ্‌ব্যবহার ঘটেছে। লাইব্রেরি থেকে বই বাইরে গেছে, তার পর তা ফিরে আসেনি। আমরা বিশ শতকের ছয়ের দশকে একাধিকবার সভাবাজার রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে গেছি—দোতলায় উঠে বাঁদিকে বিশাল কক্ষ, অত্যন্ত ধুলিমলিন, অধিকাংশ আলমারির কাচ ভাঙা, সম্ভবত তালাও ভাঙা—আলমারিতে অর্ধেক বই নেই। বই-পত্রিকার কোনো তালিকা দেখতে পাইনি। বই নেড়েচেড়ে দেখবার সুযোগ ছিল, কিন্তু বেশ কয়েকদিনের চেষ্টাতে প্রয়োজনীয় একটি বইয়েরও সন্ধান পাইনি। সেইসঙ্গে শোনা গেল রাজবাড়ির সংগ্রহ তখন পুরোনো বইয়ের দোকানে যেতে শুরু করেছে। অধিকাংশ পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের অন্তিম অবস্থা একইরকম। ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলে কী হতে পারত, অন্য কয়েকটি পুস্তক সংগ্রহের প্রসঙ্গে সে কথা বলা যাবে। রাজবাড়ির যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি ট্রাস্টের রক্ষণাধীন হওয়ায় বইগুলি কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে

স্থানান্তরিত করা সহজ ছিল না। অবশেষে দীর্ঘ প্রয়াস-প্রচেষ্টার পর স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে, তবে সেই বিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগারের ঠিক কতটুকু রক্ষা করা গেছে তা আমার জানা নেই।

আমাদের ছেলেবেলায় মিউজিয়াম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো কলকাতায় অন্যতম দর্শনীয় স্থান ছিল পাথুরিয়াঘাটায় টেগোর কাস্‌ল্। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) মানুষ যেমনই হোন না কেন, পুস্তকপ্রেমী ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি এবং হরকুমার ঠাকুরের বিশাল সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও কাব্যের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। যখন তাঁর বাড়ি দেখতে গেছি তখন লাইব্রেরি দেখতে পাইনি (১৯৫০-১), তবে খুব কৌতূহল হয় তাঁর বইপত্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ কোথায় গেল। সম্ভবত গ্রন্থাগার রক্ষায় উত্তরপুরুষের কোনো আগ্রহ ছিল না।

পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের সৃষ্টি এবং বিলুপ্তি নিয়ে বেশ বড়ো মাপের একটা বই লেখা যায়। আঠারো-উনিশ শতকে রাজামহারাজারা পুথি সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন। সকলেই যে তাঁরা নিজেরা পড়ুয়া ছিলেন তা নয়। কিন্তু প্রাচীন পুথির মূল্য অনেকে জানতেন। আর এই পুথি সংগ্রহের অন্যতম একটি পথ ছিল অবাধ লুণ্ঠন। নবকৃষ্ণ দেবের সংগ্রহের ইতিহাস পুরোপুরি জানা নেই। তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) প্রপিতামহ পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭-১৮০৬) ১৭৮১ সালে বারাণসীতে চৈত সিংহের বিদ্রোহ দমনের সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে রামনগর আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজের উপকার করায় প্রভূত ধনরত্ন মিলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু কাশীর রাজবাড়ি অবরোধের সময়ে তিনি নানা প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এগুলি সূড়ার রাজবাড়িতে রক্ষিত ছিল। পীতাম্বর অনতিপরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁর ছেলে বৃন্দাবন রামমোহন রায়ের বন্ধু হলেও পড়াশোনায় আগ্রহী ছিলেন না। রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেজয় (১৭৯৬-১৮৬৯) অবশ্য অধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তো কথাই নেই। বেলেঘাটায় গেলে সূড়ার রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যাবে, তবে পীতাম্বর-জন্মেজয়-রাজেন্দ্রলালের সেই বিশাল গ্রন্থাগার আজ কোথায়? বিশ শতকের ছয়ের দশকে একদা সেই লাইব্রেরি দেখার জন্য মাঝে মাঝে সেখানে গেছি। রাজবাড়ির কম্পাউন্ডে একটি আউটহাউসের দোতলায় একটি মাত্র ঘর, সেখানে স্তূপাকার বই-পত্রিকা-পুথি মেঝেতে ছড়ানো আছে, তার উপর দিয়েই হাঁটাচলা হচ্ছে। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও বই বা কাগজে হাত দেওয়ার অনুমতি মিলল না। খুব কায়দা করে আমাকে বলা হল, স্বত্বাধিকারীরা খুব শীঘ্রই সব গুছিয়ে ফেলবেন, তার পর বইপত্রের তালিকা টাইপ করে আমাকে দেবেন। ধুলো ঘাঁটা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা ছাড়া এর মধ্যে পারিবারিক কিছু চিঠিপত্র থাকতে পারে, সেগুলি 'বাইরে'-র লোককে দেখতে দেওয়া যায় না। তার পর একাধিকবার গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও সে

তালিকা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি। পরে জেনেছি সেসব বই-পত্রিকা-পুথি কিছুই রক্ষিত হয়নি। সম্ভবত আবর্জনা বিবেচনায় সেগুলি রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা ছিল, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের উত্তরপুরুষের মনে আঘাত লাগতে পারে বলে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছি।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের (১৭৪৯-৯৩) সঙ্গে পুথিপত্রের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর বংশধর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ অবশ্য স্মরণীয় হয়ে আছেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্য। মাইকেল মধুসূদনের গুণগ্রাহী হিসেবে তাঁরা বই পড়তেন, বই সংগ্রহ করতেন। বেলগাছিয়া রাজবাড়ির সেই সমস্ত বইয়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করেছিলেন সম্ভবত এই বংশের উত্তরপুরুষ বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৭-৬১)। বিমলবাবুর বইয়ের সংগ্রহ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর পর সম্ভবত সেই পুস্তক সংগ্রহের একটা বড়ো অংশ কান্দি রাজ কলেজ লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে।

কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তবাবু) পীতাম্বর মিত্রের মতো চৈত সিংহের লুণ্ঠিত সম্পদের কিয়দংশ পেয়েছিলেন। তবে পুথিগত সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। বিদ্যোৎসাহী যুবা রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। কৃষ্ণনাথের ভাগনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী দানধ্যানের জন্য বিখ্যাত, তাঁর সাহিত্যপ্রীতির কথাও জানা আছে। তবে কলকাতায় কাশিমবাজার হাউসের পুস্তক সংগ্রহ ঠিক কোন সময়ে গড়ে ওঠে জানি না। মণীন্দ্রচন্দ্রের পৌত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐতিহাসিক এবং নাট্যকার। আশা করা যায়, কাশিমবাজার হাউসের পুস্তক সংগ্রহ স্থায়ীভাবে রক্ষিত হবে।

স্থায়ীভাবে বই রাখতে হলে উত্তরপুরুষের মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং কিছু আর্থিক সংগতির প্রয়োজন। তা না হলে ব্যক্তিগত পারিবারিক সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় বা দান করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যখন বহুধাবিভক্ত হয়, তখন বইয়ের সংগ্রহও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র-সমরেন্দ্র তাঁদের বইয়ের সংগ্রহ রক্ষা কবতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্রের সংগ্রহ সম্ভবত বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির গ্রন্থাগারটিও পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহে পুষ্ট হয়েছে। প্রিয়নাথ সেন ও প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে জানতে পারলে ভালো লাগবে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক তেমনই মহামূল্যবান। সৌভাগ্যক্রমে তা জাতীয় গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার গত একশো বছরে যেসব পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ দান হিসেবে পেয়েছে তার একটা বড়ো অংশ স্থানাভাবে, অযত্নে, দায়িত্বহীনতায় আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে

দানলব্ধ পুস্তক সংগ্রহের পরিমাণ বিশাল। তার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুস্তক সংগ্রহের কথা আমরা সকলে জানি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বইপত্রও সাহিত্য পরিষদে স্থান পেয়েছে। এখনও প্রত্যেক বছর বিভিন্নজন তাঁদের সংগৃহীত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে দান করেন। দাতাকে ছাপানো রসিদ দেওয়া হয়, পরিষৎ পত্রিকায় প্রদত্ত বইয়ের বিবরণসহ দাতার নাম ছাপা হয়। কিন্তু সেখানেও স্থানাভাব এবং অব্যবস্থা। ফলে কয়েক বছর আগে আমি নিজে যে দুস্প্রাপ্য পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা গ্রন্থাগারকে দিয়েছিলুম, এখন নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গিয়ে সেগুলির সন্ধান মিলল না।

আমার মাতামহ জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের (১৮৮৪-১৯৫৯) মৃত্যুর পর তাঁর বাংলা বইয়ের একটা বড়ো অংশ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইংরেজি পত্রপত্রিকা (*হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গলি, ইন্ডিয়ান ফিল্ড, রেইজ অ্যান্ড রায়ত* ইত্যাদি) জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়া হয়। পরে জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই পত্রিকাগুলি আর ব্যবহারের সুযোগ পাইনি। মন্মথনাথ ঘোষ কলকাতার সিমলা-ঘোষ পরিবারের সন্তান। ফলে তাঁর পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের (*হিন্দু পেট্রিয়ট-বেঙ্গলি* খ্যাত) সংগ্রহ উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর গৃহে দীর্ঘদিন সযত্নে সংরক্ষিত ছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল কোনো লেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকার ফলে এগুলি সকলে দেখার সুযোগ পান না। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়ার পরেও সকলে সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন কি না সন্দেহ।

সিমলা-ঘোষ পরিবারের হিরণকুমার ঘোষ তাঁর পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বিডন স্ট্রিটে হিরণ লাইব্রেরি স্থাপন করেন। পরে সেই লাইব্রেরি সাধারণের সম্পত্তি হওয়ায় পারিবারিক অধিকার লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরিও যথোপযুক্তভাবে পরিচালিত না হওয়ায় বইপত্রের অবস্থা সঙিন। কলকাতায় এইরকম আরও অনেকগুলি 'সাধারণ' গ্রন্থাগারের বই শেষ পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিটের রেলিঙে স্থান পেয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা সম্ভবত পুস্তকপ্রেমী সকলেরই জানা আছে। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে বেশ কয়েক বছর আগে রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরির দুরবস্থার কথা।

তবু যাঁরা জীবিতাবস্থায় তাঁদের বইয়ের সংগ্রহ কোনো প্রতিষ্ঠানকে দান বা বিক্রয় করেছেন, তাঁদের বইপত্র আরও কিছুকাল রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বিপুল। তাঁর ইচ্ছা ছিল বইপত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে তিনি দান করবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কার্যকাল প্রত্যাশানুযায়ী বাড়াতে রাজি না হওয়ায় তিনি রাগ করে তাঁর পুস্তক সংগ্রহ বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিকে দিয়ে দিলেন। সুশীলকুমার দে অবশ্য পরিকল্পিতভাবে তাঁর জীবিতকালে বিশাল পুস্তক সংগ্রহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান ও বিক্রয় করেন। বিনয় ঘোষ যখন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পত্রিকা সংগ্রহ (*সোমপ্রকাশ* ইত্যাদি) বিক্রয় করেন, তখন কলকাতায় কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর বক্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রতিষ্ঠান

তাঁর প্রদত্ত শর্তে সেগুলি কেনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুস্তক সংগ্রহ দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত হয়, কিছু বই কেনে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কিছু বই রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি। অমল হোমের সংগ্রহ কোথায় গেছে জানি না। গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সংগ্রহ নিশ্চয় তাঁর বাড়িতে রক্ষিত নেই। যোগেশচন্দ্র বাগলের সংগ্রহও সম্ভবত নিউ ব্যারাকপুরে তাঁর গৃহে সংরক্ষিত হয়নি।

আমি নিজে অতি অল্প বয়সে কলকাতার অনেকগুলি পারিবারিক সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। রামবাগানের দত্ত-পরিবারের লাইব্রেরির (এবং বিরাট অস্ত্রাগারের) স্মৃতি আজও আমার মনে গাঁথা আছে। পরে সে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। বইপত্রও অধিকাংশ বেহাত হয়। অল্প কিছু বই-পত্রিকা (যদিও সেগুলি অ-মূল্য) রক্ষিত হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কল্যাণচন্দ্র দত্তের সল্ট লেকের নবনির্মিত গৃহে। কতদিন সেগুলি রক্ষা করা সম্ভব হবে জানি না। স্কটিশ চার্চ কলেজে আমার অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন সযত্নে পিতৃদেব চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক সংগ্রহ (সেই সঙ্গে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এবং অজস্র চিঠি) রক্ষা করেছেন, কিন্তু কনকবাবুর মৃত্যুর পর কোথায় তার কী গতি হল জানি না।

রমলা-খ্যাত মণীন্দ্রলাল বসুর সঙ্গে আমার নিকটাত্মীয়তা ছিল। তাঁর পার্ক সার্কাসের বাড়ি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লুণ্ঠিত হওয়ার সময়ে অনেক মূল্যবান বই ও ছবি বিনষ্ট হয়। পরে গড়িয়াহাটায় তিনি যে-বাড়ি করেন, সেখানে তাঁর লাইব্রেরি ছিল দেখবার মতো। ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অত বই কলকাতায় সম্ভবত আর কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল না। কয়েক হাজার বাংলা বই-পত্রিকাও ছিল সুনির্বাচিত ও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাণ্ডার, সাধনা,* রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বইয়ের প্রথম সংস্করণ। নিঃসন্তান মণীন্দ্রলাল স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বুক দিয়ে বইগুলি আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু তার পর সেগুলি কোথায় গেল কেউ জানে না। অন্তত আমি জানি না। শ্যামবাজারে আমাদের প্রতিবেশী প্রমথনাথ মল্লিকের বই সংগ্রহের নেশা ছিল। আমার মাতামহ এই কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন। প্রমথনাথ নিজে অথবা অন্যকে দিয়ে লেখালিখি করতেন। পরে তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরা বিপুল বৈভবের অধিকারী হলেও গ্রন্থ সংরক্ষণে আগ্রহ দেখাননি। ফলে উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকা চিরকালের মতো হারিয়ে গেল।

গোয়াবাগানে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের (১৮৭৬-১৯৬২) বাড়িতে অনেকবার গেছি। তাঁর পুস্তক সংগ্রহ শুধু মূল্যবান ছিল না, তাঁর খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ একটা দেখবার মতো জিনিস ছিল। যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো তথ্য তিনি অনায়াসে সরবরাহ করতে পারতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহ কোথায় গেল? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র পিতার সংগ্রহ ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করেননি, তা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। সুকুমার সেনের পুস্তক সংগ্রহ বর্ধমানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সত্যচরণ ও বিমলাচরণ লাহার পুস্তক সংগ্রহের সন্ধান পাইনি। এখনও

লাহাদের বাড়িতে বেশ কিছু বই থাকা সম্ভব। আমার মাতামহ মন্মথনাথ ঘোষের সংগ্রহের কথা আগে বলেছি। মামার বাড়িতে থাকার সময়ে সে সমস্ত বইপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করেছি আমি। কিছু বই-পত্রিকা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে দেওয়ার পরেও বাড়িতে ছিল বেশ কয়েক হাজার মহামূল্যবান বই-পত্রিকা। কিন্তু স্থানাভাবে সে বই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাব বার স্থানান্তর, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বই রাখা, ব্যবহার না করা, সিলভার ফিশ থেকে উই-ইঁদুর—আস্তে আস্তে নষ্ট হয়েছে হচ্ছে সেই বিশাল সংগ্রহ।

বিদেশে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ কীভাবে রক্ষিত হয় তার কাহিনি শুনি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পুরোনো বই-পত্রিকা রক্ষা করার কত অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। তবু এখনও সেখানে নিলামে পুস্তক সংগ্রহ বা পাণ্ডুলিপি বিক্রি হয়। আমাদের দেশে বই রাখার থেকে বই নষ্ট করা অনেক সহজ কাজ। আজ প্রবীণ বয়সে আমার নিজের ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিত্য দুশ্চিন্তা বোধ করি। জীবিতকালে বই বিক্রয় বা দান করলে অন্তত বিনষ্টির হাত থেকে সেগুলি রক্ষা পায়। তবু বেঁচে থাকতে কি বই দিয়ে দেওয়া যায়? ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়বে: 'আমার লাইব্রেরির এক অংশ এক বিশ্ববিদ্যালয় কিনতে চান, কিন্তু কেনবার কথা উঠলেই প্রাণটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। পড়ে কিছু হয় না, না পড়েও উপায় নেই। অথচ বইগুলি আমার আর থাকবে না। ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগে। কখন কোন মুহূর্তে পাতা উল্টোতে ইচ্ছে হয় জানি না। বই হাত থেকে চলে যাওয়া—এটা একরকম মৃত্যু।' (২০.৪.১৯৫৮) 'আমার চার হাজার বইয়ের মধ্যে ঠিক এক হাজার, শুধু Economics-এর বই বিক্রি করে দিলাম। মাত্র একশ রেখেছি। তার বেশি পড়তে পারব না। তবু প্রিয় জিনিস হাত থেকে বেরিয়ে গেল। একটু আপশোস আছে, দুঃখ ঠিক নেই।' (১৫.৫.১৯৫৯)

ব্যক্তির জীবনে জরা বার্ধক্য মৃত্যু আছে। বইও অজর অমর নয়। তবু যত্ন করে রাখলে বই অনেকদিন থাকে। আমাদের দেশে অন্তত দু-তিনশো বছর। কিন্তু ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ রক্ষা করা আজকের দিনে কঠিন। বইয়ের পোকা, বই চুরি ইত্যাদি তো আছেই, সেইসঙ্গে স্থানাভাব। আজকের দিনে আমরা অধিকাংশ জন ফ্ল্যাটে বাস করি। অনেকসময়ে ফ্ল্যাটও একাধিকবার বদল করতে হয়। সবশেষে উত্তরাধিকারী ফ্ল্যাট বা ব্যাংক ব্যালেন্স যত বেশি মূল্যবান বিবেচনা করেন, বইপত্রের গুরুত্ব সেভাবে অনুভব করেন না। (পাঁচ সাত হাজার টাকার বিনিময়ে কয়েক লক্ষ টাকার বইয়ের হস্তান্তর ঘটতে দেখেছি।) অনেকে আবার বই বিক্রি করা অসম্মানজনক মনে করেন। এ ছাড়া বিষয়সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা যত সহজ বা দ্রুত সম্ভব, পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ সেভাবে করা যায় না। সে অবস্থায় অযত্নে প্রাকৃতিক নিয়মে বই-কাগজপত্র নষ্ট কবা অনেক সহজ। আপনা থেকেই একদিন ধুলোয় মিলিয়ে যাবে বইয়ের পাতা, যেমন দেখেছিলুম সূড়ার রাজবাড়িতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুস্তক সংগ্রহের ভগ্নাবশেষ।

নিজের বই নিজে বিক্রি করা কঠিন কাজ। কিন্তু বিক্রি করে দিলে তবু বইগুলি কোথাও না কোথাও রক্ষিত হবে। যিনি পয়সা দিয়ে বই কিনছেন, তিনি তো সেগুলি প্রাণ ধরে নষ্ট করতে পারবেন না। আমরা যারা পুরোনো বইয়ের মূল্য বুঝি, তারা তো পুরোনো বইয়ের দোকান থেকেই সংগ্রহ করেছি কত দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকা। এক সময়ে রঞ্জন গুপ্ত রীতিমতো ক্যাটালগ ছাপিয়ে পুরোনো বইয়ের কারবার করতেন। কত বই কিনেছি রঞ্জনবাবুর কাছ থেকে। সম্ভবত আরও একটু আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পুরোনো বইয়ের ব্যাবসা শুরু করেন। তখন Firma K. L. জন্ম নেয়নি। কানাইবাবু আমাকে স্নেহ করতেন। বইয়ের ব্যাবসার কত গল্প করতেন। বুক কোম্পানির আদি যুগের খবর রাখি না, কিন্তু শেষাবস্থায় গিরীন্দ্র মিত্রের বাড়িতে বসে বইয়ের গল্পের কথা মনে হয় (পরে বুক কোম্পানি উঠে গেলে সেখানে মনীষার বইয়ের দোকান হয়)। মোহনবাগান রো-তে পুথিপুস্তকের সংগ্রহ ভালো হলেও সেখান থেকে বেশি বই কিনতে পারিনি। শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে সি. ও. বুক স্টলে এদিক থেকে বেশি দামি এবং কম দামি দু-ধরনের বই-ই পাওয়া যেত। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার অনেকদিন পর্যন্ত একই সঙ্গে নতুন ও পুরোনো বইয়ের কারবার করতেন। ও. সি. গাঙ্গুলি সম্ভবত আরও পরে বইয়ের ব্যাবসায় এলেন। সব শেষে ইন্দ্রনাথ মজুমদার, যাঁর সুবর্ণরেখা বিজ্ঞাপন দিত—গোয়েন্দা লাগিয়ে পুরোনো বইয়ের সন্ধানের থেকে সহজ হবে সুবর্ণরেখার আশ্রয় গ্রহণ। সুবর্ণরেখা অনেকদিন আমাদের যাবতীয় বইপত্র সংগ্রহের প্রধান উৎস।

কলেজ স্ট্রিট-রেলিঙে আর পুরোনো বই পাওয়া যায় না। সেগুলি সোজাসুজি পুরোনো বইয়ের দোকানে চলে যায়। আসলে সেই চাকার মধ্যে চাকা। যেখান থেকে একদা বই সংগ্রহ করেছি, আবার সেখানেই শেষ গতি আমার বইয়ের। দুঃখ করার কিছু নেই। শুধু যেসব বই আমাদের পারিবারিক অবহেলায় চিরতরে বিনষ্ট হয়েছে তার জন্য দুঃখ হয়। পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহ চিরকাল থাকে না, থাকবে না। পরিবার যেমন ভাঙে গড়ে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহও ভাঙে গড়ে। এরই মধ্যে লুকিয়ে থাকে পারিবারিক পুস্তক সংগ্রহের ইতিহাস।

গ্রন্থপালের বিদ্যেবুদ্ধি তথা গ্রন্থবোধ

অরুণ ঘোষ

মারাঠি রাজনীতিক খাদিলকর 'লাইব্রেরিয়ান' শব্দটির একটি স্বদেশি প্রতিশব্দ করেছিলেন: 'গ্রন্থপাল'। শব্দটি আমার জানা ছিল না। এটি প্রথম গোচরে আনেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে। শব্দটি আমার মন্দ লাগেনি। তা ছাড়া রাজনীতিক-কৃত এই হিন্দিগন্ধী প্রতিশব্দের '-পাল' শব্দান্ত অন্যবিধ পালেদের, যথা নগরপাল, রাজ্যপাল ইত্যাদির পাশাপাশি বেশ স্বতঃসিদ্ধভাবেই জায়গা করে নেয়। বহু ব্যবহার সত্ত্বেও 'নগরপাল' যদিও এখনও খোঁড়াচ্ছে, 'রাজ্যপাল' কিন্তু দিব্যি চলে। 'গ্রন্থপাল'-ও খোঁড়াবে সন্দেহ নেই, তবুও পালেদের ক্ষমতা সম্পর্কে যাঁরা সম্যক অবহিত তাঁরা জানেন এই সম্মানীয় শব্দটির এক অন্যতর ব্যঞ্জনাও আছে।

ভারতবর্ষে প্রথম সারিব সক্রিয় রাজনীতিকরা যেমন সহজে রাজ্যপাল হতে চান না, মনে হয় যেন এ দেশের শ্রদ্ধেয় বিদ্বজ্জনেরাও তেমনই শুধুমাত্র গ্রন্থপাল পরিচিতির মধ্যে নিজেদের আটকে রাখতে চাননি বা চান না। বাঙালি বিদ্বজ্জনের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫), নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-৮১) প্রমুখ জীবনের কোনো-না-কোনো সময় গ্রন্থপালের কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র প্রভাতকুমার ছাড়া কেউই এটাকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নেননি। এবং, মজার কথা, প্রভাতকুমারের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগাববিদ্যার কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না।

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে হরিনাথ দে কারোরই ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। কেননা খোদ ইংল্যান্ডেই বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারবিদ্যা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হয় ১৯১৯-এ ইউনিভারসিটি কলেজ অব লন্ডনে। ভারতবর্ষে তা এসে পৌঁছোয় আরও অনেক পরে। সুতরাং গ্রন্থাগার সংগঠনের যে-কাজে তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবেই সমাজকল্যাণ এবং উনিশ শতকীয় নবজাগরণ না হোক অন্তত এক নব-আলোড়নেরই স্বাভাবিক প্রকাশ। প্রভাতকুমার এই আলোড়নের সীমান্তকালের মানুষ। সীমান্তকালের, কিংবা সঠিক অর্থে সীমান্ত বহির্ভূত, একান্তভাবেই বিশ শতকের মানুষ ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। নীহাররঞ্জনের কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ ছিল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে একটা শিক্ষাবর্ষ তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং অপেক্ষার সেই

বর্ষটিতে তিনি গ্রন্থাগারবিদ্যার পাঠটি নিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনেব সূত্রপাতও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসাবেই। তথাপি নীহাররঞ্জন গ্রন্থপাল নন, ভারতবর্ষেব বরেণ্য ঐতিহাসিকদের একজন, যাঁর অতুলনীয় কীর্তি *বাঙ্গালীর ইতিহাস*।

কিন্তু প্রভাতকুমারও কি গ্রন্থপাল? ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থপাল হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার গ্রন্থাগারে দীর্ঘদিন কাজ করে তিনি অবসর নেন। অথচ এই দীর্ঘ অবলম্বিত বৃত্তিটা তাঁর কোনো পরিচয় বহন করে না। রবীন্দ্র-জীবনীকার না বললে প্রভাতকুমারেব পরিচয়ের পনেরো আনা অংশই অন্ধকারে ঢাকা থাকে।

শুধুমাত্র গ্রন্থপাল পরিচিতি নিয়ে সাধারণ্যে পরিচিত মানুষ ভারতবর্ষে কে আছেন? রমন-এফেক্টের বিন্দুবিসর্গ না-জানা শিক্ষিত ভারতীয় সি. ভি. রমনের নাম জানেন, অন্তত বললে বলবেন, হ্যাঁ, নামটা যেন শোনা-শোনা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং মৌলিক অবদান রাখা সত্ত্বেও এস. আর. রঙ্গনাথনের নাম এই শাখার ছাত্রছাত্রীদেব বাইরে কজন জানেন? স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগারিক হওয়ার সুবাদে বি. এস. কেশবন-এর নাম তবুও কিছুটা জানা।

১৯৭০-এর দশকে ভাবতের জাতীয় গ্রন্থাগাবের জন্য একটি অধিকর্তার পদ সৃষ্টি কবা হয়। মনে করা হয়েছিল, জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থপালের উপরে একজন অধিকর্তা থাকা প্রয়োজন। ওই অধিকর্তা হবেন একজন স্কলার বা পণ্ডিত, যাঁর গ্রন্থাগার পরিচালনায় কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা আবশ্যিক নয়। তখনই গ্রন্থপাল আর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিতর্ক উঠেছিল এই নিয়ে যে, একজন গ্রন্থপালকে স্কলার বা পণ্ডিত হতে হবে কি না, আর হলেও কতখানি। এ বিতর্ক অবশ্য এতদিনেও নিষ্পত্তি হয়নি, হবারও নয়। তবে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯৭০ সালের পর থেকে পর পর যে-তিনজন পণ্ডিত অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম জনের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারবিদ্যার প্রশিক্ষণ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ছিল, পরের দুজনের তা ছিল না। তাঁরা খ্যাতনামা শিক্ষক-গবেষক। প্রায় দুই দশকের কাছাকাছি সময় ধরে এই তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে জাতীয় গ্রন্থাগারের কতখানি উন্নতি হয়েছিল তা পরিমাপ করা সহজসাধ্য না হলেও এ কথা বলা চলে যে, ওই সময়কালের সম্পূর্ণটাই যদি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে ব্যয় করতেন তাহলে হয়তো আমাদের বৌদ্ধিক জগৎ তাঁদেব অবদানে আরও অনেক সমৃদ্ধ হত। সহজে পরিমাপসাধ্য নয় এমন এক কাজের জন্য তাঁদের ডেকে আনা আসলে হয়তো তাঁদের মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন দিতে বলারই শামিল। কী করতে পারেন তাঁরা গ্রন্থাগারে? সুষ্ঠু কর্মী পরিচালন? সে তো যে-কোনো ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যানেজার করতে পারেন। মূল্যবান বইপত্রের সন্ধান দেওয়া? সে তো তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনে তাঁরা এমনিই দিয়ে থাকেন। গবেষকদের সাহায্য বা

পরামর্শ দান? সে কাজও তো তাঁদের পেশাগত প্রয়োজনেই অধীনস্থ গবেষকদের জন্য এমনিই করতে হয়। তাহলে গ্রন্থাগারে তাঁদের করণীয় কী? এ বড়ো জটিল প্রশ্ন। এবং এই প্রশ্নটার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে গ্রন্থপালের কাজের চরিত্র নির্ধারণ, তাঁর সামাজিক ভূমিকা নির্ণয়।

আমার এ লেখার গৌণ উদ্দেশ্য বর্গীকরণ-সূচিকরণ-গ্রন্থপঞ্জি-তথ্যসূত্র-অনুলয় সেবা ইত্যাকার খটখটে পরিভাষা, যা সব বিদ্যারই থাকে, তার বাইরে এনে সাধারণের চোখ দিয়ে গ্রন্থপালের কাজটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেখা, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে, তা এক বিরাট কাজ, কোনো হেঁজিপেজি লোকের কম্ম নয়। প্রমাণ করাটা খুব দুরূহ হবে না, কেননা আমাদের স্থায়ী সামাজিক প্রত্যয়গুলি—যেমন, গ্রন্থাগার এক মহৎ প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এক মহৎ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক মানেই বিদ্বান, মুচি মানেই মূর্খ না হোক অন্তত বিদ্বান নয়, ইত্যাদি—এর অনুকূলে কাজ করবে। এবং এইসব প্রত্যয় ভাঙার বিধ্বংসী কাজের ধুলোবালির কষ্ট আমার সয় না। অগত্যা গ্রন্থপালেদের বিদ্যেবুদ্ধি তথা গ্রন্থবোধের আলোচনাতেই সরাসরি যাওয়া যাক। যাবার আগে বলে নেওয়া আবশ্যক যে, কারো বর্তমান বিদ্যেবুদ্ধি বা গ্রন্থবোধের পরিমাপ করার বিপজ্জনক খেলায় আমি নেই; আমি শুধু অনুচ্চস্বরে কী থাকা উচিত সেই যাবতীয় কথাগুলোই বলব, অর্থাৎ কিছুটা উপদেশাত্মক ঢঙে এবং উচ্চস্বরে এটাই জানাব যে, নিশ্চয়ই তা আছে, না থাকলে চলত কী করে এতদিন? চলছে কী করে এতদিন?

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে 'গ্রন্থপাল' শব্দটিকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, বাজারচলতি 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটাই ভালো, কেননা এতক্ষণে পাঠক না বুঝুন অন্তত আমার হৃদয়ংগম হয়ে গেছে যে, গ্রন্থপালের পেশাটা কোনো দিকপালের পেশা নয়। এত বিশাল বাংলা-শিল্প-সংস্কৃতি, তার গল্প-উপন্যাস-সিনেমায় চারদিকে এত শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমনকী বেকারও—কিন্তু কোথাও তেমনভাবে কোনো গ্রন্থাগারিক নেই। শুধু খুব সাম্প্রতিক কালে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের এক ছোটোগল্পের চরিত্র নঙ্গরচন্দ্র তার গ্রামের গ্রন্থাগারিক বন্ধু প্রভাকর বেজ সম্বন্ধে বলেছিল যে, 'প্রভাকর দেহ রাখার পর থেকে আমার জগৎটি ছোটো হয়ে গেছে'। যথার্থ গ্রন্থাগারিকের অভাবে কারো কারো জগৎ হয়তো সত্যিই ছোটো হয়ে যায়। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসরের পর এমন উপলব্ধি হয়তো অনেকেরই হয়েছে। তবু গ্রন্থাগারিক কোনো দিকপাল নন। তা সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে নীহাররঞ্জন রায়েদের মতো দিকপালেদের উল্লেখ কাটা হল না এই কারণে যে, তাঁদের পদার্পণে ক্ষণিক হলেও ইতিহাসবিদ্ তপন রায়চৌধুরীর কথা ধার নিয়ে বলতে পারা যাবে যে, 'পিদারম্ সুলতান বুদ'—অর্থাৎ 'মদীয় পিতাঠাকুর ছোলতান আছেলেন।' পশ্চিমবঙ্গের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর যে শত শত ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ নিতে আসেন বা নিয়ে যান তাঁদের পক্ষে শাখার এই বংশগৌরবটা কম কিছু নয়। এবং গোটা সমাজের নিরিখে এই ছাত্রছাত্রীরাও কম কিছু নন, কেননা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া

এঁদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। অবশ্য বংশগৌরবে যে ভবী ভোলে এমন প্রমাণও হাতে কিছু নেই। ইতিহাসে এম. এ. পাশ করা ছাত্রের মুখে যখন শুনি যে রোমিলা থাপার, সুমিত সরকার, ইরফান হাবিব-এর নাম তাঁর অজানা, বা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বি. এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বৃত্তির জন্য আবেদনকারী মৌখিক পরীক্ষায় যখন অকপটে জানান যে, লোকায়ত-খ্যাত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা বিমলকৃষ্ণ মতিলাল-এর নাম তিনি শোনেননি, বা বিখ্যাত কোনো বাঙালি সাংবাদিকদের নাম জানতে চেয়ে যখন কোনো ছাত্রের মুখে *বর্তমান* পত্রিকার সম্পাদকের নাম পাই, অনেক মাথা চুলকেও তাঁর সমকক্ষ আর কোনো নাম উঠে আসে না, তখন সন্দেহ হয় প্যারীচাঁদ মিত্রদের নিয়ে কতদূরই বা আর যাওয়া যেতে পারে। 'পিতাঠাকুর ছোলতান' থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী। অবশ্য এই পিতৃপরিচয়হীনতার অভিশাপ শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শাখায় কালযাপনকারীদেরই প্রাপ্য নয়, সব শাখারই এতে সমান অধিকার। এবং দোষটা কোনো শাখার নিজস্ব নয় বা ছাত্রছাত্রীদেরও নয়—দোষ আবহাওয়ার। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সবসময়ই কেমন ঘুম পায়, আর ঘুমের ঘোরে বাপঠাকুরদার নাম মনে রাখতে পাগলেও পারে না। তবু গ্রন্থাগারিকের মূল কাজই হল নাম মনে রাখা—হয় বইয়ের নাম না হয় লেখকের, কখনো বা বিষয়েব—যে-বিষয়নামকে আজকের কম্পিউটারের ভাষায় ডেসক্রিপটর (descriptor) বলা হচ্ছে। এইসব নাম মনে না থাকলে লিখে রাখতে হয়, সেটাই ক্যাটালগ, কখনো বা ইন্‌ডেক্স। বিষয় থেকে নাম, নাম থেকে বিষয়। অনুসন্ধিৎসুকে নামের জোগান দিয়ে যাওয়াই হল গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কর্তব্য। বাকি কাজ পাঠকের।

তাহলে গ্রন্থাগারিকের বিদ্যেবুদ্ধির দরকার কীসের? এ কাজ তো পুস্তক বিক্রেতাও পারে। সে আলোচনায় আসার আগে বিদ্যেবুদ্ধির সংজ্ঞার্থটা জেনে নেওয়া জরুরি। প্রতিটি বিদ্যারই আলাদা আলাদা সংজ্ঞার্থ আছে—পদার্থবিদ্যা কী, রসায়নবিদ্যা কাকে বলে, ভূগোলবিদ্যা কোনটি, ইত্যাদি সংজ্ঞার্থ কোথায় পাওয়া যায় গ্রন্থাগারিক তা জানেন। প্রতিটি বিষয়ের অভিধান খুঁজে তা বার করে দেওয়া যায়। গ্রন্থাগারবিদ্যারও তেমনই একটা সংজ্ঞার্থ আছে, কিন্তু সেই সংজ্ঞার্থটুকুই সব নয়—তার বাইরেও সব বিদ্যার সঙ্গে তার একটা সংযোগ থাকে। এই সংযোগটা না রাখলে শৌলমারির সাধু নেতাজি কি না এই নিয়ে ধন্দে পড়ে *A Princely Impostor?*-এর সঙ্গে মিশিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। সেইজন্যেই গ্রন্থাগারিকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন, শুধু গ্রন্থাগারবিদ্যার নয়—শুধু বিদ্যার, শুধু বুদ্ধির।

এখন মুশকিল হল শুধু বিদ্যা বা শুধু বুদ্ধির সংজ্ঞার্থের সন্ধান পাওয়াটা দুরূহ। এ বিষয়ে কমলাকান্ত চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই। কমলাকান্ত যে-ভাষ্য দিয়েছিলেন তদনুসারে, 'বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার

জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।'

আর বুদ্ধি বিষয়ে কমলাকান্ত বলেছেন যে, 'যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।'

সুতরাং এ জগৎসংসারে, বিশেষ করে বঙ্গভূমে, সবারই যা আছে সেই প্রয়োজনীয় বিদ্যেবুদ্ধিটুকু গ্রন্থাগারিকের থাকবে না, এমনটা ভাবা মূর্খতা। সেই কারণেই সকল গ্রন্থাগারিকই বিদ্বান এবং বিদ্বানমাত্রেই গ্রন্থাগারিক হবার ক্ষমতা রাখেন। সেই কারণেই অনেক গ্রন্থাগারিকই তুলাজ্ঞানে যে-কোনো গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং নেবার পর লৌহজ্ঞানে সে দায়িত্ব এড়িয়েও চলেন। চাকরি জীবনের ধর্মই এরকম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে আর একটু বেশি কিছু দাবি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গ্রন্থাগারিকের 'গ্রন্থবোধ'। এই গ্রন্থবোধের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

বোধের সঙ্গে বুদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু যেন মনে হয় বোধ জিনিসটা বুদ্ধিকে অতিক্রম করা কিছু। শুধু বুদ্ধিতেই কিন্তু অনেকদূর কাজ চলে যায়। শ্রদ্ধেয় ফণীভূষণ রায় তখন কলকাতার কমার্শিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক। একদিন এক তরুণ শিল্পোদ্যোগী তাঁর কাছে এসে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনাদের শেক্সপিয়র রচনাবলি আছে? ফণীভূষণ তাঁকে সবিনয়ে জানালেন যে, তা নেই। ভদ্রলোক তখন কিছুটা ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, এখানে গোলাপ ফুল নিয়ে কোনো বই আছে? ফণীভূষণ তখনও সবিনয়ে জানালেন, আজ্ঞে না। ভদ্রলোক তখন কিছুটা হতাশ হয়েই বেরিয়ে আসার মুখে। এবার ফণীভূষণের প্রশ্ন করার পালা। জানতে চাইলেন, আপনি ঠিক কী খুঁজছেন বলুন তো?—আজ্ঞে, আমি গোলাপ ফুল রপ্তানির ব্যাবসা করি। জানতে চাইছিলাম গোলাপ ফুল নিয়ে শেক্সপিয়র কী লিখেছেন। লিটারেচরে ছাপাবার জন্য। —ও তাই বলুন। বসুন আপনি। বলে ফণীভূষণ তাঁর হাতে *ডিকশনারি অফ কোটেশনস*-এর 'অন রোজ' (Rose) চ্যাপটারটা খুলে ধরিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের তখন হাতে চাঁদ পাওয়ার অবস্থা। ঘটনাটা ফণীভূষণের কাছেই শোনা।

এটা ফণীভূষণের বুদ্ধির খেলা। সন্ধানী ভদ্রলোককে দেখে তিনি বুঝেছিলেন ইনি আর যাই হোন শেক্সপিয়র-প্রেমী কেউ নন এবং তাঁর পক্ষে 'গাছের চেয়ে গাছের ছায়া সব রকমেই ভালো' হবে। তা ছাড়া পাঠক-মনোযোগী হবারও এটা একটা দৃষ্টান্ত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বারউইক সেয়ার্স তাঁর প্রিয় ছাত্র রঙ্গনাথনের বইয়ের ভূমিকায়

লিখেছিলেন, 'যখন লাইব্রেরিতে কাজ করার আগ্রহ নিয়ে তরুণেরা আমার কাছে আসে আমি তাদের প্রশ্ন করি—তোমরা কি বই ভালোবাস? অবশ্যম্ভাবী উত্তরটি হয়—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি—তোমরা কি মানুষকে ভালোবাস এবং মানুষের সেবা করতে?' ফণীভূষনের আচরণে তার স্পষ্ট উত্তর ছিল। যে-কোনো ভালো গ্রন্থাগারে কাজ-করা গ্রন্থাগারিকের কাছে এ উত্তরটা থাকতে হয় এবং পরিষেবার এই ধরনটাও জেনে রাখতে হয়। তাঁরা জানেন গাছগাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে, ছায়াব ওষুধই আসলে সর্বরোগহরা। এই ছায়াগুলো আর কিছুই নয়, নির্দেশিকা, তথ্যপঞ্জি, টীকা, তথ্যসূত্র, ভূমিকা, সূচিপত্র, গ্রন্থপরিচিতি, লেখক পরিচিতি, এমনকী বইয়ের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। এগুলো শিশিতে পুরেই গ্রন্থাগারিকের কারবার। আর শুধু গ্রন্থাগারিকই বা কেন, এই টোটকা সেবন করে কত লেখক বইয়ের পর বই প্রসব করে চলেছেন তার খবরও গ্রন্থাগারিকই রাখতে পারেন। উৎসের জলে কেরোসিনের গন্ধ তো মোহানার জলেও তাই। একটি বইয়ের তথ্যসূত্রে ভুল ছাপা হয়েছে তো তার ঔরসজাত আরও পাঁচটি গ্রন্থে একই ভুল বাহিত হয়ে চলেছে—এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে তা নিয়ে আলোচনা করাটা অনধিকার চর্চা। কিন্তু অধিকারের সীমাটা একটু না বাড়ালেও আবার গ্রন্থবোধের ব্যাপারটা ঝাপসাই থেকে যাবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারিকের কাছে গ্রন্থবোধের দাবিটা জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে তা আসবে তার পথ বাতলে দে নি। বুঝে নেওয়া যায় যে, বোধ যখন, তখন তা ভেতর থেকেই জাগ্রত হবে, বাইরে থেকে আসতে দিলে সংক্রমণ ঘটতে পারে। কেননা বইয়ের বিপুল জগৎটাকে বাইরে থেকে দেখলে যতটা পবিত্র মনে হয় ততটা পবিত্রতা হয়তো তার নেই। বহু বইই আসলে মলাটে মোড়া ছাপা কাগজ। অনেক সময় গ্রন্থকারই গ্রন্থবোধের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেন। যেমন ২০০২ সালেই দুটি সংস্করণ হয়ে যাওয়া এক প্রবীণ কৃষকনেতার লেখা এক বইয়ের শুরুতেই বইটির যে স্বাক্ষরবিহীন পরিচয় দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে :

> গল্প নয়। ঘটনা অতিরঞ্জিত নয়। বাস্তব চিত্র। একটি থানা অঞ্চল। দশটা বছরের টুকিটাকি। ১৯৬৭-৭৭। নামধামের পরিবর্তন হয়েছে। একটা অঞ্চলের ইতিহাস। গোটা বাংলার চিত্র যে লড়াইয়ের ফসল বামফ্রন্ট সরকার। এতদিনের ইতিহাস তার ইতিহাস কই? বীরত্বের কাহিনীগুলি? ঐতিহাসিকরা যোগবিয়োগ করবে। বানানো কথা লিখবে। প্রতিবাদ করার মত কেউ বেঁচে নেই। মালমশলা যাবে হারিয়ে। সোনারপুরের আন্দোলন কি? কথাটা এল কিভাবে? সেদিনের সবলতা দুর্বলতা অত্যাচার সন্ত্রাস সবাই ভুলে যাবে। আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু ইতিহাস কিছু সত্য ঘটনা থাক না।

থাক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু গ্রন্থাগারিক এটিকে রাখবেন কোথায়? *খোয়াবনামা*-র পাশে, না কি *কৃষকসভার ইতিহাস*-এর পাশে? কিন্তু নামধামের যে 'পরিবর্তন হয়েছে'! অথচ এটি 'গল্প নয়'! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন—'লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ'!

তা সত্ত্বেও গ্রন্থবোধটাকে ঝেড়েমুছে রাখতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব?

আগেই বলেছি, বুদ্ধির চেয়ে বোধ বড়ো, বোধের চেয়ে বোধি। বোধিলাভের জন্য বুদ্ধদেব ঘর ছেড়েছিলেন, চৈতন্যও। গবেষকরাও দেশ ছাড়ছেন। গ্রন্থাগারিকদের অত বেশি কিছু করার দরকার নেই, কেননা তাঁদের দরকার বোধি নয়, বোধ। এর জন্য শুধু পরিশ্রম করাটা ছাড়লেই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, 'লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায় না।' এবং এর কারণ হিসাবে তিনি সঞ্চয় বাহুল্যের দ্বারা নিজেকে ক্লান্ত করা এবং সাধারণের মনকে অভিভূত করার কৌশলের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। কথাগুলি আজ আরও বেশিভাবে প্রযোজ্য। সরকারি দাক্ষিণ্যে বিপুল বই সঞ্চয় করে সুদৃশ্য গ্রন্থাগার ভবনের জনহীন কক্ষে চেয়ারে বসে গ্রন্থাগারিক ঝিমোচ্ছেন—এ দৃশ্য একটু ঘুরলে অনেক গ্রন্থাগারেই প্রত্যক্ষ হবে। কথা বললে শুনবেন সেইসব আক্ষেপ, 'লোকে আজকাল পড়তে চায় না।' অথচ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে আসা জাতীয় অধ্যাপক এস. আর. রঙ্গনাথন সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, প্রতিটি পাঠকের জন্য বই এবং প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক। তাহলে গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইগুলির পাঠকেরা সব গেলেন কোথায়? কিংবা পাঠকদের উপযুক্ত বইগুলো?

এখানে একটা কথা এসে যায়—গ্রন্থাগারিক নিজেও তো একজন পাঠক? না কি, শুধুই পাঠক-সহায়ক? কিন্তু নিজে না পড়লে সহায়তা দেবেন কীভাবে? প্রশ্ন হল, একটা গ্রন্থাগারে তো অনেক বিষয়েরই বই থাকে। গ্রন্থাগারিককে কি সব পড়ে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়ে উঠতে হবে?

এ পেশায় একটা কথা চালু আছে—সামথিং অফ এভরিথিং জেনে রাখা। কিন্তু তারও তো একটা পদ্ধতি আছে। শুনতে কথাটা যত সহজ, অর্জন ততটা সহজসাধ্য নয়। এখানেও বোধ হয় বারউইক সেয়ার্সের কথাটাই আবারও স্মরণীয়—মানুষকে ভালোবাসা। মানুষ, এ ক্ষেত্রে পাঠক, নিজে অন্তত আবছা হলেও জানেন তিনি কী খুঁজছেন। আবছা হলেও জানেন, কোথাও তা পাওয়া যেতে পারে। এক অর্থে তিনিও একজন অপ্রথাগত গ্রন্থাগারিক। তাঁরও স্বকীয় কিছু পদ্ধতি আছে। প্রথাগত গ্রন্থাগারিক তাঁকে সহায়তা দিতে এসে যদি দাতা-গ্রহীতার দ্বিমুখী সম্পর্কের বাঁধনে না জড়ান তাহলে নিছকই এক অন্ধগলিতে ঢুকে পড়বেন। একটু পরেই বুঝতে পারবেন উদাসীনতা বা বিরক্তি ছাড়া তাঁর আর দেবার কিছু নেই। আসলে সহায়ক হতে চাওয়ার চেয়ে কিছুদূর পর্যন্ত সহযাত্রী হতে চাওয়াটাই বোধ হয় সঠিক পন্থা। তাতে

পথ চেনা যায়, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল—সেটাও। আবার ফিরেও আসতে হয়। কেননা পাঠকের জানার কোনো যবনিকা বা সিদ্ধান্ত বা প্রতিপাদ্য থাকবে কি থাকবে না সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপাব। কিন্তু গ্রন্থাগারিকের বোধ হয় তেমন কিছু অন্ত থাকতে নেই, এটাই তাঁর অনিবার্য নিয়তি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেখানে তাঁর বিস্তার কিংবা গভীরতা সেখানটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব দর্শন ও রুচির সঙ্গে আশ্লিষ্ট, পেশার সঙ্গে বোধ হয় ততটা নয়।

গবেষণা গ্রন্থাগার বা বাণিজ্যিক গ্রন্থাগারগুলির কথা আমি বলছি না, কেননা সেগুলির ভাবনা তাদের ব্যবহারকারীরাই অনেকখানি ভাববেন। আমার বক্তব্য সাধারণ গ্রন্থাগার নিয়ে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোড়নহীন একটা নিস্তরঙ্গ সমাজে যে-মারি নামে তার প্রথম বলি হয় বই। সমাজে আলোড়ন তোলার জবরদস্ত কাজটা হয়তো গ্রন্থাগারিকের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু গ্রন্থাগার কক্ষে প্রাণের স্পন্দনটুকু বাঁচিয়ে রাখতে তিনি পারেন; অন্তত পারা উচিত। 'প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরি করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেবির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপরে ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়, গ্রন্থপাঠকের। এই উভযকে রক্ষা করাব দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।' কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরিব মুখ্য কর্তব্য' অভিভাষণ থেকে নেওযা—আমি বললে জ্ঞান দেওয়া হবে। গ্রন্থাগারিক যদি জ্ঞান দেন তাহলে তিনি শিক্ষক, যদি শুধু বই ইস্যু করেন তাহলে কেরানি, যদি শুধু গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংবক্ষণেব কাজ করেন তাহলে কেয়ারটেকার। এর বাইরে যদি কিছু তিনি হতে চান তাহলে একালেব এক প্রিয় কবির কথাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়—পরিশ্রম করাটা ছেড়ে বিকল্পেব সন্ধান করুন। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পাঠক বই পড়তে না চাইলে তাঁকে নোটবই পড়াবেন, নোটবই না পড়লে জমি কিনে দিয়ে তার দলিল, দলিলও না পড়তে চাইলে অপরেব বা নিদেনপক্ষে নিজেব হস্তরেখা। কঠিনকে এড়িয়ে সহজ বা চটুল পন্থার এই স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে আত্মসমর্পনে হয়তো অর্থ বা বৈষয়িক লাভ কিছু ঘটে, কিন্তু বোধলাভ বোধ হয় অনায়ত্ত থেকে যায়। গ্রন্থাগারিকের লক্ষ্য শিক্ষক হওয়া নয়, আধিকারিক হওয়া নয়, কেরানি বা কেয়ারটেকার নয়, অন্য কিছু নয়; গর্বের সঙ্গে শুধু গ্রন্থাগারিকই হওয়া। আর সেই কারণেই শুধু পরিশ্রমটাই বর্জনীয়।

পরিশ্রমের সংজ্ঞার্থটাও অবশ্য কমলাকান্তের কাছ থেকেই জেনে নেওয়া দরকার: 'উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিনীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।'

বাঙালি পাঠক ও তাঁর বাংলা বই পড়া: কয়েকটি মুহূর্তের ভাবনা

গৌতম ভদ্র

রবীন্দ্রনাথের সেই ঝাঁ ঝকঝকে লাইনের কথা আপনাদের মনে আছে তো? 'ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সবার সেরা।' এ হেন বাংলা বই নামে কিনে পদার্থটি নির্বিচারে পুতুপুতু করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখতেন 'পয়লা নম্বর' গল্পটির নায়ক অদ্বৈতচরণের দাদার এক খুড়শ্বশুর। কেনা বইগুলির একটিও খোয়া যায়নি, এই গর্বে শ্বশুরমশায়ের বুক ফুলেফেঁপে উঠত। ওইদিকে নায়কের পকেটে টাকা নেই। তাই অদ্বৈতচরণ নির্বিচারে বাংলা বইয়ের ক্যাটালগ পড়তেন, আর দাদার শ্বশুরবাড়ির বইয়ের আলমারির দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকতেন, 'চক্ষুর জিভে' জল আসত।[১]

বিশেষ করে বাংলা বইয়ের জন্য হাপিত্যেশের এইরকম তুখোড় বর্ণনা খুঁজে পাওয়া ভার। আমাদের মতো হ্যাংলা বইখোর বলবে যে, খুড়শ্বশুরটি বইয়ের মজুতদার, রসিক নয়। হাতে হাতে বই ঘুরে বেড়ালেই তো বইয়ের মর্যাদা বাড়ে। ধনবানে কেনে ও ভাগ্যবানে পড়ে, এটাই তো রীতি। শুধু নিজে পড়ে নয়, অপরকে পড়িয়েই বাড়তি সুখ ও আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়, এই কথা যে-কোনো বইখোর জানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনের প্রারম্ভে আমার বরিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে যে স্বল্প কয়েকজন বই চাইলেই অবলীলায় ধার দিতেন, মাঝে মাঝে নিজে যেচে নতুন বইয়ের খবরও শোনাতেন, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। অদ্বৈতচরণের মতো তাঁরও একটা 'মটো' ছিল, 'ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ'। এই পাঠাভ্যাসের আনন্দযজ্ঞে আমাদের মতো জুনিয়র সহকর্মীদেরও ডাক মাঝে মাঝে পড়ত। সেই ঔদার্যের স্মৃতির উদ্দেশে আজকের সভায় উনিশ শতক ও বিশ শতকেব গোড়ায় বাঙালি পাঠকের বাংলা বই পড়ার অভ্যাস ও ধারণা নিয়ে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

'লেখা পড়ার' সমস্যা ও পরিসর

গাড়িঘোড়া চড়তে গেলে লেখাপড়া করতে হয়, এইরকম প্রাকৃত ধারণার কথা ছেলেবেলার ছড়ায় হামেশাই শুনতাম। সহজ ছড়াটার মধ্যে একটা ধন্দ আছে। 'লেখা' ও 'পড়া', লেখাটা আগে, পড়াটা পরে। জোটবদ্ধ দ্বন্দ্ব সমাসে শব্দটি সিদ্ধ।

মাস্টারমশায়ের কাছে জেনেছি যে, দ্বন্দ্ব মানে মিলন ও বিরোধ দুটিই, দুটি দিকেই শব্দটি কাটে। মিল ও অমিলের নানা জটিল সম্পর্কে লেখাপড়ার কাজটি আবদ্ধ। একটু ভাবলেই দেখা যায় যে, সামাজিক প্রকরণে দুটি কাজ আলাদা, পড়তে জানলেই যে লিখতে হবে বা লেখায় সমর্থ হতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সমাসবদ্ধ পদে কিন্তু লেখার অর্থটাই প্রাধান্য পায়, লেখকের গৌরবও আমাদের সংস্কৃতিতে বহুধা প্রতিষ্ঠিত। ভালো লেখকের জন্য নানা পুরস্কার আছে, কিন্তু ভালো পাঠকের কোনো শিরোপা আজও কোনো প্রতিষ্ঠান দেবার কথা ভাবেনি। লেখাপড়ার জগতে পাঠকের উপস্থিতি নৈমিত্তিক ও স্বতঃসিদ্ধ, যেন আলাদা করে ভাববার দরকার পড়ে না।

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাতে, বইয়ের ইতিহাসেও যেন লেখকের দবদবাই বেশি। গোলকায়ন তথা জাতীয়তাবাদ এবং 'প্রিন্ট-ক্যাপিটালিজম' বা মুদ্রণশিল্পের বিকাশ ও রূপান্তর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এই কথা আজ কে না জানে।[২] দেশে ও বিদেশে ছাপাখানার উদ্ভব ও প্রসার নিয়ে অবিরাম কাজ চলেছে।[৩] এই গবেষণাগুলিতে বই কেনাবেচার সূত্রেই পাঠকরা পরোক্ষে হাজিরা দেয়। চাহিদা বাড়া বা কমার কারণ তো ক্রেতার পছন্দ বা অপছন্দ। তারা বইয়ের বাজারে বড়ো ফ্যাক্টর, সংখ্যার হিসাবে বিচার্য, নিছক উপভোক্তা বা ক্রেতার মোড়কে তাদের পাঠকসত্তা চাপা পড়ে থাকে।[৪] আবার লেখাপড়াকে ঘিরে যে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসটি তৈরি হয়, সেই বিবরণীতে রুচি নির্মাণের প্রশ্ন জাঁকিয়ে বসে। প্রকৃষ্ট জনরুচি তৈরি করাটা যে-কোনো আলোকায়িত সমাজের উচ্চবর্গের কর্তব্য, *বঙ্গদর্শন* থেকে *কল্লোল*, *কল্লোল* থেকে *শনিবারের চিঠি* কেউই তাদের অভিমতমাফিক রুচি তৈরি করার কাজ থেকে পিছপা হয়নি। সাহিত্য সম্মিলন, সাহিত্য-সমালোচনা, গ্রন্থাগার আন্দোলন, নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও কীর্তি জনতার পাঠরুচি নির্মাণের প্রকল্পের সঙ্গেই যুক্ত। বাংলা বইয়ের ইতিহাসের অনেক প্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটিই আমাদের অজানা, কিন্তু অন্বিষ্ট ক্ষেত্রের পরিসীমাটি আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। আজও এইসব গবেষণায় সাধারণ পাঠক গোষ্ঠী হিসাবে উদ্দিষ্ট মাত্র, তাদের উপস্থিতিটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তারা স্বক্ষেত্রে স্বরাট নয়, আপাতগ্রহীতার ভূমিকাতেই তাদের আবির্ভাব।[৫]

অথচ লেখার অভ্যাসের মতো পাঠের অভ্যাসেও নানা রকমফের আছে, আছে নানা ভেদাভেদ। সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসের একটি বড়ো রকমের সূত্র তো নিহিত থাকে পাঠকের গোত্রভেদে, ওই গোত্রভেদই রচনার গোত্রবিচারের সঙ্গে অন্যোন্যভাবে যুক্ত। সর্বভুক পাঠক থাকতেই পারে। তবে 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' যেন প্রাকৃত জগতের রীতি। লেখক, প্রকাশক ও সমালোচকের চিন্তায় কবিতা, উপন্যাস ও রম্যরচনার জন্য কিছু না কিছু ধরাবাঁধা পাঠকের কথা থেকেই যায়, সময়বিশেষে সেইসব পাঠকের গোত্রে তারতম্য ঘটে। বয়সের প্রভেদ ও নৈতিক দায় আরও সূক্ষ্ম ভাগ সৃষ্টি করতেই পারে, তখন হয়তো বা 'শিশুসাহিত্য' ও 'গার্হস্থ্য উপন্যাসের' লেবেল তৈরি হয়।[৬]

নিম্নবর্গের মধ্যেও অক্ষর চিনে পড়া ও রচনাটি পড়ে লেখার মানে বোঝাটা সমপর্যায়ভূক্ত কাজ নয়। কোরানের আমপারা শিশুরা সুরেলা গলাতে পড়তেই পারে, তাতে আরবি ভাষার মর্ম উদ্ধারের কাজ হাসিল হয় না, আয়েতের অর্থবোধেরও বড়ো দরকার পড়ে না। আবার 'কথকতা' বলে শিল্পটির ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, যৌথ মণ্ডলীর কাছে সোচ্চারে পুথি পাঠ আরেক ধরনের আয়াসসাধ্য রীতি। গলার স্বর প্রক্ষেপে, বলার ভঙ্গিমায় কথক সবসময় তাঁর সৃজনীশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকেন।[৭] কথকতার রীতি বড়ো ব্যাপক, রামায়ণ-মহাভারত থেকে নভেল পাঠে ছড়িয়ে পড়ে তা পাঠের আসরে যে-কোনো গল্পই জমাতে পারে।

বাঙালি সমাজে নানা বকমারি আসরে বই পড়ার অভ্যাসটি ছাপা বইয়ের প্রাদুর্ভাব ও অক্ষর পরিচয় চাগিয়ে তুলেছিল, এর প্রমাণ খুব দুর্লভ নয়।[৮] পশ্চিমে আত্মসত্তা বিকাশের ইতিহাসে সন্ত অগাস্টিনের আমল থেকে সবার সামনে জোরে পড়ার অভ্যাস ও নিঃশব্দে স্বগত পড়ার রীতি সত্তা বিকাশের দুটি পর্বলক্ষণ বলে বিবেচিত হয়েছে।[৯] দেশজ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় এই দুটি রীতিই যে সহাবস্থান করতে পারে, এই সম্ভাবনাটি মানতে কেউ অস্বীকার করবেন না।

দুই ঘরানার আলাপ

এতসব দরকারি আলোচনা থেকে একটু সরে গিয়ে অথচ ঠিক এদের গা ঘেঁষেই আমার আলোচনা। আলোচনাটির অন্বিষ্ট 'বই পড়ার আনন্দযজ্ঞ', এ ক্ষেত্রে পাঠকই যজ্ঞটির হোতা। এই 'আনন্দ' কথাটির মধ্যে যদি কেউ কেউ রলাঁ বার্তের 'The Pleasure of the Text'-এর অনুরণন পান, তাতে ক্ষতি নেই।[১০] বই পাঠের অন্যতম সেরা তাত্ত্বিক বার্ত, এমনকী তাঁর রচনাতেই তো 'লেখকের মৃত্যু' বা 'the author is dead' স্লোগানের মতো ধ্বনিত হয়েছিল। বইয়েব জন্য আকাঙ্ক্ষা, বই পড়ার ইচ্ছা, ইচ্ছাপূরণের আনন্দ, এইসব অভিজ্ঞতাই বার্ত তাঁর নানা রচনায় অনুপম ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। পড়াটাই যেন আরেকটি অভিজ্ঞতা, আনন্দের স্বাদে ভরপুর। বার্তের কাছে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎটি সংকেতময়, নানা গোত্রের চিহ্নের পাঠোদ্ধারেই বার্তের অনন্ত আগ্রহ। এই সাংকেতিক বস্তুজগতেরই একাংশ তো ছাপা বই, সাহিত্যকৃতি। আপাতভাবে যে-কোনো পাঠকের কাছে বই বস্তুবিশেষ, দুই মলাটে বদ্ধ, ছাপার অক্ষরে ধরাবাঁধা পরিসরে বিন্যস্ত। বই পেলে পাঠক তাঁর মতো করে পড়েন, অর্থ বোঝা বা না বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর বিচার ও ক্ষমতা গ্রাহ্য। তারিয়ে তারিয়ে, এক নিঃশ্বাসে, মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে পড়লেও বা কে বাদ সাধছে? পড়া, আধপড়া বা না পড়ার এতসব পদ্ধতির কথা বার্ত ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করেছেন, সেইগুলির সঙ্গে আরও কেউ আরও কয়েকটা পয়েন্ট জুড়তেই পারেন। বইয়ের অবয়ব আছে, পাঠকের কাছে সেই অবয়বের আবেদন আছে, লেখার ভঙ্গি, ছাপা, বাঁধাই সব নিয়েই আবেদনের সংকেত তৈরি হয়। বই পড়ার সুখ

(pleasure) ও বই পড়ার আনন্দ (bliss), এই দুটি অনুভবের মধ্যে বার্ত পার্থক্য করেছেন। সাংস্কৃতিক চিন্তনের ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে পাঠের স্বস্তিকর অভ্যাসটি সুখদায়ক। যে-রচনা পাঠকসত্তার ঠাঁইটি নাড়িয়ে দেয়, লেখকের অভিপ্রায় সত্ত্বেও যে-পাঠাভ্যাসে খেয়ালি পাঠক অন্যকিছুর হদিশ পান, সেই রচনাটির বা সেই সেই পড়ার ধরনেই বই চাখার আনন্দটি ধরা পড়ে।

আনন্দ পাবার জন্য পড়ার ঝোঁকেই বার্তের মতো পাঠক স্তাঁদালের উল্লিখিত কোনো এক রচনার মধ্যে প্রুস্তকে খুঁজে পান, খবরের কাগজের দৈনন্দিন প্রতিবেদনেও তাঁরা উঁকিঝুঁকি মারতে পারেন। এই গোত্রের রচনা পাঠকে লেখকের অভিপ্রায়ের দায় থেকে মুক্ত করে, দুই মলাটের বেড়াজাল থেকে ছিন্ন (unglue) করে পাঠকের স্বচ্ছন্দবিহারিতাকে বার্ত স্বীকার করেছিলেন। নানা স্তরে পাঠকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর লক্ষ্য; তাহলে তো লেখকের সাচ্চা অভিপ্রায়কে বোধগম্য করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ কেতাবি ও কেজো সমালোচনার ঝোঁকটি খান খান হয়ে ভেঙে যাবে। পাশ্চাত্যে বার্তের রচনার প্রভাবে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা বই পড়া তথা বইয়ের পাঠকদের নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছেন। রচনার অর্থবোধে, ব্যবহারে ও প্রচারে পাঠক যেন স্বেচ্ছাচারী, হাজারো কায়দাকানুন ও কলকবজার মধ্যে সে অন্তর্ঘাতটি চালিয়ে যেতে সক্ষম। সেরকম জবরদস্ত পাঠকের কাছে যে-কোনো রচনা যখন তখন ফুকরে জানাতে পারে, 'ঢোল-ডগর তুমি কার? যখন যার হাতে আমি তার।' কোনো পাঠের ও পাঠকের যেন একক ইতিহাস হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, অনেকান্ত হওয়াটাই যেন সেই ইতিবৃত্তের প্রকৃতি।[১১]

বার্তের আলোচনার সূত্রে কোনো খেয়ালি পাঠক যদি আনাচে কানাচে কাশ্মীরের আলংকারিক বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন ও ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তকে উঁকি মারতে দেখেন, তবে অবাক হবার কিছু নেই। রসধ্বনি তত্ত্বের এই দুই বিশ্রুত তাত্ত্বিকের মতে পাঠকই সর্বময়, কাব্যরস নির্ণয়ের কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি রসিক পাঠক, 'সহৃদয় সামাজিক' এই সুন্দর নামেই তিনি আখ্যাত। রসভুক্তি বা রসাস্বাদন একমাত্র সহৃদয়েরই হয়, নানা অনুশীলনের ফলে স্ফটিক-নির্মল মানোমুকুরের অধিকারী সহৃদয় কাব্যের ধ্বনিব্যঞ্জনায় চমৎকৃত হন এবং তাঁরই পক্ষে কাব্যপাঠ থেকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরতুল্য আনন্দ (bliss) আস্বাদন করা সম্ভব। আধুনিক কোনো কোনো ঐতিহাসিক কাব্যরস বিচার ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে সহৃদয়ের চিত্তভাবনাকে ঐকান্তিক প্রাধান্য দেওয়াটা রসধ্বনি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বলে ঠাহর করেছেন। কী প্রক্রিয়ায় কাব্যভাবটি ভাবনা বা সাধারণীকরণের প্রক্রিয়ায় সামাজিকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, দেশ ও কালের পরিমিতিকে অতিক্রম করে সহৃদয়ের সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্যে ও অহংবোধে রচনার রসভুক্তি ঘটে, সেই তত্ত্ব ধাপে ধাপে ('সোপান পরম্পরা') অসামান্য গ্রন্থ সমবায় *ধ্বন্যালোক* ও *লোচনটীকা*-তে বলা হয়েছে। অরসিকের কাছে কাব্য পাঠ করলে রসের জন্ম হয় না, রতিস্বাদে অনভিজ্ঞ একজন জরন্মীমাংসক *অভিজ্ঞান শকুন্তলা*-র মতো নাটকের শৃঙ্গাররস আস্বাদন করতে

অসমর্থ। কোনো এক বিশেষ রসানুভূতির জন্য সহৃদয়ের মনে ঠিক সেই রসের বিশেষ স্থায়িভাব নয়তো চিত্তবৃত্তির সংস্কার আবশ্যক। এই লৌকিক সংস্কার থেকেই অলৌকিক রসাস্বাদে উত্তরণের যুক্তি পরম্পরায় শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এই পর্যায়ে লেখকের রচনা ও সহৃদয়ের পাঠক্ষমতার একটি বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। *অভিনবভারতী*-তে অভিনবগুপ্ত কবি হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম ('তাদাত্ম্য') হবার ক্ষমতাকে সহৃদয়ের যোগ্যতা বলে মনে করেছিলেন। কবিমনের যথার্থ অভিপ্রায় সহৃদয়ই বার বার পড়ার ফলে বুঝতে পারে, সেই কল্পনাপ্রতিভার সে অধিকারী। *ধ্বন্যালোক*-এ সহৃদয়ের বিশেষণরূপে 'হৃদয়সংবাদভাজ' কথাটি লক্ষ করার মতো। লেখকের মনের খবর জানার হক যেন সহৃদয়েরই আছে, এই দাবিটি জোরের সঙ্গে করা হচ্ছে। লেখকের অভিপ্রায় আদৌ তুচ্ছ নয়, তবে সেটা বুঝে কাব্যরস আস্বাদন একমাত্র সহৃদয়ই করতে পারে।

এই পয়েন্টে মীমাংসকরা রসধ্বনি প্রবক্তাদের বেশ চেপে ধরেছিলেন। পরগত চিত্তবৃত্তি তো অনুমান করাই যায়, শব্দের লক্ষণা বিচারই যথেষ্ট, ব্যঞ্জনাশক্তির দরকারটা কোথায়? *লোচনটীকা*-র প্রথম উদ্দ্যোতের শেষে (১-১৮) মীমাংসকদের যুক্তি কাটান দিতে অভিনবগুপ্তকে নানা তর্কের অবতারণা করতে হয়। তখন তিনি সহৃদয়ের পড়ার ক্ষমতাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। নিছক অন্যের চিত্তবৃত্তি বুঝলেই সহৃদয়ের সাহিত্যরসাস্বাদন হয় না, সহৃদয়কে নিজেই সেই রসে নিমজ্জিত হতে হয়। এই তদ্গাত প্রক্রিয়াতে সহৃদয় আদৌ উদাসীন থাকে না, বরং কাব্যগত চিত্তবৃত্তিতে তার 'তন্ময়ত্ব' লাভ হয়। ফলে দেশ ও কালের পরিধিতে আবদ্ধ সহৃদয়ের পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধটি মুছে যায়। সময় ও কালের ঊর্ধ্বে লেখক, অভিনীত চরিত্র অথবা অন্য সহৃদয়ের ভাবানুভূতির সঙ্গে একজন সহৃদয়ের সাধারণত্ববোধ ('সর্ব সামাজিকানাম্ একঘনতা') রসধ্বনির রূপান্তরক্ষমতায় জেগে ওঠে। কেবলমাত্র লৌকিক অনুমান বা লক্ষণাব ধারণায় এই সাধারণীকরণের প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রের পাঠ ও অনুজ্ঞার লৌকিক অভিপ্রায় বোঝা এবং সাহিত্যপাঠের অলৌকিক রসচর্বণার মধ্যে অভিনবগুপ্ত স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন।

শেষ পর্যায়ে অভিনবগুপ্তের চলনটি অবশ্যই অধিবিদ্যার, মেটাফিজিকাল। বার্তের কল্পিত পাঠকটির বিপরীতে অভিনবগুপ্তের রসিক পাঠকটির অবস্থান। সে আদৌ বিশেষ নয়, সহৃদয়ের শিরোপাটি পেতে গেলে তাকে নির্বিশেষ হতেই হবে। রসভুক্তির প্রক্রিয়ায় সে সার্বভৌম সন্দেহ নেই, কিন্তু তত্ত্বগতভাবে স্বতন্ত্র ও একান্ত খেয়ালি পাঠের মজাটুকু উপভোগ করার দাবি তার থাকে না। 'সকল সহৃদয় সংবাদ-শালিতাই' তার কাম্য। পাঠতত্ত্বের এই বিচারে ভারতীয় রসধ্বনি তত্ত্বের প্রবক্তাদের বিপরীতমুখেই বার্তের যাত্রা।

ভারতীয় শাস্ত্রবিচার ও জ্ঞানতত্ত্বের মার্গে পাঠক আসেন ঘুরপথে, নিজের দাবিকে পেশ করেন অন্যভাবে। বৃত্তি, ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনীর মধ্যেই গড়ে ওঠে ভারতীয়

জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্য, মূলের পাঠকে একজন বৃত্তিকার বা ভাষ্যকার কীভাবে বুঝছেন বা পড়ছেন, সেইগুলির বিবৃতিই তো এক একটি প্রস্থানের প্রতর্ক। আমাদের আলোচিত *ধ্বন্যালোক*-এর কথাই ধরা যাক। প্রচলিত মতানুযায়ী অজ্ঞাতনামা কেউ ছন্দে 'কারিকা' লিখছেন, কারিকার বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন ও এই বৃত্তির ভাষ্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন' নামে টীকায় লিখছেন। এই সব কারিকা-বৃত্তি-ভাষ্যের সমবায়েই রসধ্বনি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তস্য তস্য টীকাও পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্তের রচনায় স্পষ্ট যে, পূর্বতন 'চন্দ্রিকা' টীকা নাকচ করে আলংকারিক ভট্টনায়কের সঙ্গে তর্কের মাধ্যমে তাঁর মতটি পরিশোধিত করে তিনি নিজের মতটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এইসব বিচারই কারিকার মূল বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্যের দোহাই দিয়ে করা হচ্ছে। নিজের মতকে মৌলিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করলেও মূল কাবিকার বুড়িটি সবাইকে ছুঁতে হবে। রসতত্ত্বে কবিও যেন সহৃদয় পাঠক, আলংকারিক রাজশেখর অন্তত সেই কথা বলবেন। জ্ঞানতত্ত্বে দুরন্ত পাঠকও মূল লেখকের অভিপ্রায়ের নিহিত অর্থের উপস্থাপনায় নিজের অভিনবত্বকে ঢেকে দেন।[১২]

প্রাচ্যের আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত এবং পাশ্চাত্যের বার্ত ও তাঁর অনুগামীর পারস্পরিক মোকাবিলায় কেউই তাঁদের স্বস্থানে থাকেন না, দুই পক্ষেরই যেন ঠাঁই নড়ে যায়। বার্তের ঘরানায় পাঠকটি চোবাগোপ্তায় অভ্যস্ত, ভাষার বিন্যাসে আবদ্ধ নির্দিষ্ট নিবন্ধের ধাঁচাটি খান খান করাটাই তার কাজ, লেখকের বিজিগীষু যেন এই পাঠক। বার্তের প্রশ্নের সামনে রসধ্বনি তত্ত্বের স্থিতধী সহৃদয় মেনে নেবে যে, প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ভাষ্যে নানা অন্তর্ঘাতী প্রকরণের সাহায্য তাকে নিতেই হয়, পরম্পরার প্রতি আনুগত্যের দোহাইটি বাতিল করলেও তার নিজের পাঠটি বেরিয়ে পড়বে, তার অভিপ্রায়ই লেখকের অভিপ্রায় বলে ঐতিহ্যে স্বীকৃতি পায়। অপরপক্ষে, কবির হৃদয় সহৃদয়ের ভাষ্যের মাধ্যমেই ধরা সম্ভব, এমন এক ধারণা বার্তের চেনা পাঠককে বোধের আরেক কিনারায় নিয়ে যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে একবার অতিরেক পাঠকেই বার্ত 'লেখা' বলেছিলেন।[১৩] ব্যত্যয়ী রচনার সম্ভাবনা স্বেচ্ছাচারী পাঠকে দেগে দেয়, তার বেশ কয়েকটি উদাহরণ বার্ত নিজেই লিখে রেখে গেছেন। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ যেন নানা লেখায় ফুটে ওঠে, পাঠের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা কেবল লেখাতেই ধরা পড়ে।

ছাপা বই চেনার মুহূর্ত

এই দুই ঘরানায় আলোচিত দুই ধরনের বর্গের মোকাবিলায় লেখা ও পড়া এবং পড়া ও লেখার অন্তর্লীন নানা সূত্রে টান পড়ে। সেই সূত্রগুলি ধরে উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি পাঠকের বাংলা বই পড়ার পাঠাভ্যাসকে খতিয়ে দেখতে গেলে নজরে পড়ে যে, সময়ের ফেরে সব পড়ার অভিজ্ঞতাই লেখার সাক্ষ্যে ধরা পড়ছে, লেখালেখির অন্বয়েই 'পাঠক' সত্তাটি হাজিরা দিচ্ছে। পুথি পড়ায় অভ্যস্ত বাঙালি পাঠকের হাতে নতুন একটি বস্তু আসছে, ছাপা বই। শিক্ষিত বাঙালি ক্রমশ ছাপা বই পড়তে অভ্যাস

করছে, শহর কলকাতার দুঁদে লেখক ও প্রকাশক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের গোড়াতেই এই কথা জানাচ্ছেন।[১৪] বাঙালি সমাজে ছাপা বইয়ের পাশাপাশি হাতে লেখা পুথি পড়া অনেকদিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলেছিল, আজও চলতে পারে। শুধু দুটি পরিবর্তন মনে রাখা দরকার। প্রথমত, ছাপা বই হাতে আসা ও পড়াটা পুথি পাঠ ও রচনাকে এক কালক্রমে ফেলেছে: ঐতিহাসিক চিন্তায় পুথি পাঠ ও রচনার অভ্যাসটি অগ্রজ, ছাপা বই অনুজ। উন্নতির স্কেলে শেষেরটা এগিয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, পুথির নিজস্ব বস্তুরূপের তুলনায় ছাপা বই অবয়বে একেবারে আলাদা, রূপটাই যেন ভিন্ন।

তুখোড় বিষয়ী ভবানীচরণ এই দুইটি আদত তফাত ভালোমতোই বুঝতেন। প্রথমত, বই ও পুথির অবয়বী পার্থক্যকে সেদিনের কলিকাতা কমলালয়ে ভাঙিয়ে তিনি দুই পয়সা কামাই করারও চেষ্টা করেন। তাঁর প্রেসে অন্যান্য বই আট পেজি ফর্মার মতো করে ছাপলেও *শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা* বা *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকের মতো ধর্মপুস্তক বা প্রাচীন বই পুথির আকারে ও তুলট কাগজে ছাপতেন। এও বলা হত যে, 'বইটি চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব।' ছাপা বই অথচ আকৃতিতে সেটা 'বিশুদ্ধ' পুথির মতো; পাঠাভ্যাসে সেটা পুথির রীতিমাফিক আড়ে লম্বা করে পড়তে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বইয়ের দামটাও একটু বেশি। ছাপা যন্ত্রেও দেখনদারির এই বিভাজনটি ভবানীচরণ দেগে দেন। আবার বামুনের হাতে ছাপা হরফ বিন্যাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভাজনটির উপর তিনি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর রুচি ও মূল্যবোধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ালেখার বস্তুরূপকে স্বীকৃতি দিয়ে কলকাতার নাগরিক জীবনযাত্রায় বইয়ের ব্যবহারের কথাটি ভবানীচরণ তির্যক ভঙ্গিতে উল্লেখ করতে ভোলেন না। কলকাত্তাই বাবুদের বড়লোকি জাহির করার একটি উপায় যে ছাপা বই সাজানো, এইটি তাঁর বর্ণনায় ফুটে ওঠে। বাঙালির বাংলা বই ছাপা ও পড়ার আদিপর্বের একটি মুহূর্তে লেখা সেই বিবৃতিটি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

বই কেনা থেকে বই পড়া

ইংরেজি সনটি ১৮২৩, শহরটি কলিকাতা কমলালয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এখানে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন, এখানে মুদ্রার অনুগামী বিদ্যা। কলকাতার হাড়হদ্দ তুখোড় এক শহুরে বাসিন্দার কাছে এক গেঁয়ো বাঙালি ভূত বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। এ হেন দুই বাঙালির কথোপকথনটি ভবানীচরণ লিখে গিয়েছিলেন।[১৫] তাঁর লেখায় ধরা পড়েছে গেঁয়ো গৃহস্থ ও নব্য শহুরে বাঙালির আচার ও সংস্কৃতির বৈপরীত্য, সদর ও মফস্‌সলের বর্গ। বাঙালি যেন একটি, সেই একটিই যেন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে চাইছে। এক বিশেষ প্রেক্ষিতেই গ্রামের কাছে নতুন শহরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। শহরকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াটা গ্রামের উদ্দেশ্য নয়; বরং গেঁয়ো লোকটি শহরে ঢুকতে চাইছে, সেইজন্যই শহরের রীতিনীতিটা তার জানা দরকার। মুদ্রা ও বিদ্যা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, এই দুইয়ের আরাধনাতেই ভবানীচরণ সফল। এই

মেলবন্ধনেরই দৃশ্যরূপ ছাপা বই, বই কেনা ও পড়ার কথা এহ বাহ্য। পণ্যের রকমেই শহুরে বাবুরা বই কেনেন, 'পড়ুন না পড়ুন, দুই গেলাস-ওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার জল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না'। বইয়ের প্রতি মনোভাবটি গাঁয়ের লোকের চোখে লাগে, গ্রামে পুথি তো সে পড়তেই দেখেছে। এই ব্যবহারের দুটি কারণ সে নিজে নিজেই ঠাহর করতে পারে। শহুরে বাসিন্দার কাছে সে শুধু কারণদুটির যাথার্থ্য ঝালিয়ে নিতে চায়। 'এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে থাকিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন'। বই কেনা ও রাখাটাই যেন মর্যাদার দ্যোতক, বই পড়াটা চুলোয় যাক। আলমারিতে সার দিয়ে সাজানো বই যেন দেখনসই মন্দিরে বসে থাকা বিগ্রহ ঠাকুরটি। 'বিদ্যাসংস্থান হেতুক এবং ঐশ্বর্য প্রকাশ কারণ কতকগুলিন পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন এবং জেলদ্‌গর ও দপ্তুরি নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে, বাবুকে ঐ কেতাব কখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতে হয় না।'[১১] বইয়ের প্রতি এই বাবুয়ানি চালে ভবানীচরণের গেঁয়ো সত্তাটি ধন্দে পড়েছে। কারণ শহরে বেশ কিছু বইয়ের বিজ্ঞাপনও তো ছাপা হয়, ১৮১৯ সালে ছাপা বিজ্ঞাপনটি তো তাঁর অজানা নয়. 'এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্রা নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেইমত ছাপার পুস্তক সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মনকে উচ্চাভিলাষী করে। পূর্ব্বকালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মেলা ভার ছিল, ছাপার আরম্ভ অবধি ক্ষুদ্র২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তকের সঞ্চার হইতেছে।'[১২] এইসব বিজ্ঞাপনে নতুন কিছু হবার উচ্ছ্বাসটি স্পষ্ট, ছাপা বইকে ঘিরে চলেছে কিছু পাবার উল্লাস। দেশের মানসিকতা সমৃদ্ধ হচ্ছে, বিত্তহীনেরাও বই কিনতে পারছে, এই প্রত্যাশাও বিজ্ঞাপনে আছে। অথচ এই উল্লাসের মধ্যেই ভবানীচরণ বড়ো সাবধানি। বাংলা বইয়ের বেসাতিতে তিনি পোক্ত, শহুরে বাসিন্দারূপে জানেন যে, অর্থকৌলীন্য ও বিদ্যাকৌলীন্যের মধ্যে সম্পর্ক দুয়ে-দুয়ে চারের মতো সহজ নয়। কলিকাতা কমলালয় তো শুদ্দুরের শহর, যে-কোনো জাতের যে-কেউ বড়োলোক হতে পারে, অক্লেশে কোনো এক মুদি বা তাঁতি বা তিলি, এমনকী লোহার বা সদ্‌গোপ, 'দিব্য ঢাকাই ধুতি জামদানের এক লাই পরীধান করিয়া অসময়ের ইলিস মৎস্য ১ একটা ২ দুই টাকায় ক্রয় করিয়া হস্তে লইয়া' যায়। এ হেন নকড়া-ছকড়া সবাই যে বই পড়ার মর্ম বুঝবে, তার দিব্যি কে-ই বা দিয়েছে? বামুনরা তাহলে খাবে কী করে? 'ধনী লোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম্ম বুঝে বা গ্রাহক হয় এমত নয়, যাহারদিগকে বিদ্যাবিষয়ে অধিক আলোচনা আছে তাহারদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অনুষ্ঠানপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।'[১৮] এইভাবেই বাঙালির গেঁয়ো সত্তাটাকে নাগরিক ভবানীচরণ আশ্বস্ত করেন। তাঁর

উপস্থাপনার ধরনটিই আকর্ষক, সংখ্যা-তথ্য এই আলোচনায় গুরুত্ব পায় না। উপস্থাপনায় বই কেনা ও বই পড়ার মধ্যে পার্থক্য টানা হচ্ছে, সেই সূত্রে বইয়ের যথার্থ ব্যবহার নিয়ে উদ্‌বেগটি প্রকাশ করা হল। আসলে লেখকের লেখা বইয়ের কদর তো পাঠকের কাছে, ব্যবসায়ী ভবানীচরণ নিজে তো একজন লেখকও বটে। নব্য শহুরে সমাজেব বাবুয়ানিতে বইয়ের মর্যাদাটি কোথায়, তাই নিয়ে চাপান-উতোরও চলেছে। সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও রুচির দ্যোতক হয়ে দাঁড়াচ্ছে বই কেনা বা না কেনা। ভবানীচবণের আলোচনার ঢঙে ঘর সাজানোর জন্য টাকায় কেনা পণ্য হিসাবে বই বাবুয়ানি সংস্কৃতি নির্দেশের চিহ্ন মাত্র, প্রথমে যেন সেটাই নজর কাড়ে। আবার নাগরিকের কৈফিয়তে প্রতিসরণটিও লক্ষ করার মতো। নিছক 'পণ্য'-রূপে বই বিবেচিত নয়, পণ্যাতীত মর্মও বইয়ের আছে, সেই মর্ম উপলব্ধি করা চর্চাসাপেক্ষ, রুচিনির্ভর, এ হেন ইঙ্গিতও শহুরে সত্তাটি দিয়েছে। টাকার সঙ্গে আরও কিছু থাকলেই বইয়ের রসিক পাঠক হওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে শহরের সব বড়োলোক নয়, বরং কয়েকজন বিদ্যাবাগীশ বাঙালিই বইয়ের পোষ্টা হতে পারেন, এই জরুরি 'এলিটিস্ট' কথাটি ভবানীচরণ স্বীকার করছেন। ওই স্বীকারোক্তির মধ্যে বইয়ের নিছক ক্রেতার পাশাপাশি বই পড়ুয়াব বিশিষ্ট মর্যাদাটিও তিনি মেনে নিলেন।

বই পড়ার কেজোমি

বাঙালির বাংলা বই পড়ার দ্বিতীয় ক্ষণের দুই ধরনের ছবি পাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, পাঠকরা অবশ্য তাঁদের পাঠাভ্যাসের অভিজ্ঞতা লিখছেন শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায়। দুটি লেখাই আত্মজীবনী, একটি আত্মজীবনীর লেখক পুরুষ, অপরটির লেখিকা মহিলা। দুটি আত্মজীবনী দুই ধরনের, একে অন্যের বিপরীত অক্ষে অবস্থিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার *সাধারণী* পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক, বঙ্কিম পরিকরদের একজন। তাঁর লেখা আত্মজীবনী *পিতাপুত্র* বাংলা বই পড়ার যেন একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন, নানা খুঁটিনাটিতে ভরা। এই জীবনীতে একজন লেখক ও সম্পাদক কীভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন, সেই কর্মকাণ্ডের একটি বিবৃতি যেন ম্যানুয়ালের ঢঙে লেখা হচ্ছে। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বঙ্গভাষার লেখক*-এ রচনাটি ছাপা হয়েছিল।[১৯] সদরওযালা রায়বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকারের খবরদারিতে বালক পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্য পড়ে চলেছেন, ভাষাটি শিখছেন, প্রয়োজনমাফিক বাবা ঠিক সময়ে সঠিক বইটি জুগিযে যাচ্ছেন, ছেলেও পরের ধাপে স্বচ্ছন্দে পা রাখছেন। বই পড়ার এইরকম একটা সরলরৈখিক ও মসৃণ বিবরণীর জুড়ি মেলা ভার। বইয়ের শুরুতেই আছে একেবারে আগমার্কা এক স্বর্ণযুগেব কথা: 'বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া, অবাধে দশবারজন শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম পাঠ করিতেন।'[২০] এই আর্য পাঠাভ্যাস যেন রূপান্তরিত হচ্ছে

উলার খাস মজলিসে, গঙ্গাচরণের সান্ধ্য আড্ডায়। সেটা বাংলা বই পড়ার এক জমাটি আয়োজন, বিশ শতকীয় সাহিত্যবাসরের উনিশ শতকীয় সংস্করণ।

> সন্ধ্যার পর পিতৃদেবের বাসায় মহা মজলিস হইত। মন্ত্রণাগৃহ নহে, দুঃখ দারিদ্র্য জ্ঞাপনের স্থান নহে; পরনিন্দা-পরকুৎসা প্রসারের স্থান নহে...রাণ্ডির, ব্রাণ্ডির প্রমোদভবন নহে; কিন্তু মজলিস, ভোরপুর মজলিস—গমগমে মজলিস।[২১]

কী নয় যেন বলে দিচ্ছে কী হয়, অথবা কী হওয়া উচিত। ভদ্রলোকি সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্রে আসছে বাংলা সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা। এই মজলিসে বই আসত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সেইসব বইয়ের বিশদ তালিকাও দিচ্ছেন, সে সবই বিশেষ ধরনের বই, বাছাই করা বই।

> বিদ্যাসাগর ''কৃষ্ণনগরের মূল পুস্তক দৃষ্টে'', ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রকাশিত করিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রকাশিত হইল। এই সকল পুস্তক এবং সেই সময়ে অন্যান্য পুস্তক, ভাল অক্ষরে ছাপা, ভাল সংস্করণে যেমন প্রকাশিত হইত, পিতা একখণ্ড ক্রয় করিতেন; আর এই সান্ধ্য সম্মিলনে পঠিত, আলোচিত, আন্দোলিত হইত। সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফোয়ারা উঠিত।

'আনন্দ' কথাটা শেষে আসছে, সাহিত্যপাঠে মজলিসের সবাই আনন্দিত হত, এবং এই আনন্দ যেন বিশুদ্ধ, যেমন সুন্দর বই তেমনই রসিক পাঠক। কৈশোরের এই পাঠ-অভিজ্ঞতাই প্রৌঢ় অক্ষয়চন্দ্রের মডেল, চিরায়িত সেকাল ও একালের পাঠ অভিজ্ঞতার ভেদরেখা তৈরি হচ্ছে: 'তখনকার সাহিত্যসেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার সাহিত্যসেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেকশন।'[২২]

বিচক্ষণ পিতার নজরদারিতে অক্ষয় সরকার বড়ো হচ্ছেন, ভালো বা মন্দ লাগার বোধটি ছেলেবেলার পড়ার অভ্যাস থেকেই যেন তৈরি হচ্ছে। *কাদম্বরী* ও কৃষ্ণমোহনের লেখাগুলি ভালো লাগত না, পাশে সরিয়ে রাখতেন। গর্বের সঙ্গেই তিনি স্বীকার করছেন: 'কাজেই বলিতে হইতেছে আমি বালজীবনে যে ভাষা শিখিতেছিলাম এমন নহে, না বুঝিয়া না শুনিয়া একটু একটু সাহিত্যও শিখিতেছিলাম। রসরচনা কাহাকে বলে তখন না বুঝি, রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম।'[২৩] রসিক হওয়াটাই অনুশীলনসাপেক্ষ, পরিবেশজাত; বই পড়া শিখতে হয়, রসবোধ জাগ্রত হবার জন্য সঠিক ট্রেনিংটুকু যথাসময়ে পাওয়া দরকার। সাহিত্যামোদী বাবা, সাহিত্য-মজলিস,

সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য, এই সবই উনিশ শতকের সাহিত্য-সমালোচকদের কাম্য ছিল, এদেরই নানা বিশিষ্ট রীতি ও রূপ বার বার বাংলার সাহিত্যিক অভিজ্ঞতায় ও সাহিত্যিকের জীবনীতে এসেছে। অক্ষয় সরকারের আত্মজীবনী যেন সম্পাদক ও সমালোচকের আদাবি কেতাব, এমনকী ওই বইটা পড়লে 'বটতলার বই' থেকেও কীভাবে রস নিংড়ানো যায়, তা-ও জানা যাবে। পাঠাভ্যাস সাহিত্যবিচারবোধের সোপান, মানদণ্ডটা যেন সঠিক পাঠাভ্যাসেই তৈরি হয়। নানা বাদবিচারের ঢঙে অক্ষয় সরকার বলে যান: 'বিধিবার্থ সংগ্রহ হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম প্রচুর, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায় সাহিত্যবিচারের কোন সুবিধা পাই নাই, বলিতে কি ভাষা শিক্ষারও নহে।'[২৪] বই পড়ার সুখ, এমনকী আনন্দই, অক্ষয় সরকার খোঁজেন, সেটাই তাঁর কথিত লক্ষ্য। পাঠকরূপে তাঁর পাওয়া না পাওয়ার বোধগুলি হিসাব নিকাশে পোক্ত, কেজোমিতে সিদ্ধ।

অক্ষয় সরকার পাকাপোক্ত সামাজিক ও সহৃদয়, মজলিসে সাহিত্য রসভুক্তির বর্ণনায় অভিনবগুপ্ত আপত্তির কিছু দেখতেন না। অথচ রসিক পাঠক নির্মিতির ধারণায় অক্ষয়চন্দ্র স্পষ্টতই এক নূতন শর্ত আনছেন, রসিকের বাদবিচারের বোধ যেন সেই শর্তের উপরে নির্ভরশীল। তাঁর কাছে রুচি নির্মাণের উপায় 'সাহচর্য্য শিক্ষা', 'সাহচর্য্যের শাসনই' একজন প্রকৃত পাঠক তৈরি করতে পারে। এই সাহচর্য পিতা, মাতা বা গুরুজনের কাছ থেকেই পাওয়াটা কাম্য। পরিবারেই একজন সাহিত্যরসিক পরের প্রজন্মের জন্যে সাহিত্যের ট্রেনিং ক্লাস খুলবেন, নিজের বই পড়ার ভালোবাসাটা ছড়িয়ে দেবেন পরিবারের বাচ্চাদের মধ্যে, পাঠাভ্যাসের আদর্শটা ঠিক এই হওয়া উচিত। ফলে পাঠবিচারে আর স্বেচ্ছাচারের সম্ভাবনা রইল না, ভালো-মন্দের উপর রাশ টানা থাকল, সঠিক সাহচর্যের মধ্যেই মডেলটি কাজ করছে। আবার পারিবারিক লালন-পালনের মধ্যেই সাহিত্য আলোচনার জন্য ছাড় দেওয়া হল, বিধিবদ্ধ পাঠের বাইরে নিয়মিত পাঠাভ্যাস হয়ে উঠল আনন্দদায়ক। এখানেই অভিনবত্ব। সহৃদয়ের বাল্য হৃদয় পিতা-মাতার পরিবারের সাহিত্যালোচনার পরিবেশে পরিশীলিত হবে, এইরকম কোনো ধারণার কথা সংস্কৃত রসশাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

এই কেতাদুরস্ত পাঠাভ্যাসের ছকে মাঝে মাঝে যে পাঠকের দুষ্টবুদ্ধি রসবিচারের ধরাবাঁধা গতকে নাকচ করবে না, তা কিন্তু নয়। কিশোর অক্ষয় সরকার ছিলেন 'মাইকেল-বিদ্বেষী', সুযোগ পেলেই ফুট কাটতেন, ক্লাসে অধ্যাপকের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। তাঁর মতে, মাইকেলের রচনার সব কিছুই চুরি। 'অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈমিলী'-র মতো উপমায় তিনি মীর আম্মানের হিন্দুস্তানি কিস্‌সা *চাহার দরবেশ*-এর প্রতিধ্বনি শুনতে পান, 'আঁধারি ঘরমে এক দিয়া না দিয়া'। অক্ষয় সরকারের নিজের বিবৃতিতেই এক গোত্রের সাহিত্য পাঠাভ্যাসের মধ্যে আরেকটি গোত্রের সাহিত্য পাঠাভ্যাস তিরের মতো ঢুকে যায়, অধ্যাপক ও সতীর্থদের পাঠক্রম অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে, হাসির রোল ওঠে। বার্তের বিজিগীষু পাঠককে সাহচর্য শিক্ষার দোহাই দিয়ে আটকে রাখা সবসময় সম্ভব নয়।

ভয় থেকে অভয়

কোথায় *সাধারণী*-র অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর কোথায় ফরিদপুরের রাশদিয়ার কুলবধূ রাসসুন্দরী দাসী। অথচ ইতিহাসের ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখার শিরোপাটি রাসসুন্দরীরই প্রাপ্য, ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই জীবনীর প্রথমাংশ শেষ করেন। গদ্যে-পদ্যে মেশানো আত্মজীবনীটি, অধ্যায়ের আগেই লম্বা লম্বা পদ্য আছে, তার মধ্যে দিয়ে কখনো-বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কখনো-বা শাক্ত কবি কমলাকান্ত বা রামপ্রসাদ কথা বলেন। নারীবাদী ইতিহাসের বাড়বাড়ন্তির দিনে এই অসাধারণ আত্মজীবনীটি নানাভাবে আলোচিত হয়েছে, অনন্য লেখাটির যেন মাত্রার শেষ নেই।[২৫]

একটি সুন্দর শব্দে পড়ুয়া হিসাবে রাসসুন্দরী নিজের পরিচয়কে বুঝিয়েছেন। শব্দটি 'জিতাক্ষরা', পুরাণ সংকীর্তনাদি শ্রবণে ব্যাকুল মনটি এই শব্দটি বেছে নেয়। শব্দটির প্রাতিপদিক অর্থ 'দৃষ্টিমাত্র অক্ষর-পাঠ-পটু'; লক্ষণার্থ উত্তম পাঠক। পাঠক হওয়াই রাসসুন্দরীর উদ্দেশ্য, অক্ষরকে তিনি চিনতে চান। নানা বাধা আছে, সামাজিক বাধাগুলি জানা, নারীবাদী ঐতিহাসিকরা নানাভাবে সেই কথা বলেছেন। নিজের সঙ্গেও লড়াই আছে, রাসসুন্দরী সেভাবেই লিখেছেন। 'আমি অতি ছোট ছোট করিয়া পুথি পড়িতাম, তথাপি আমার প্রাণ ভয়ে এক একবার চমকে উঠিত মনে ভাবিতাম কেহ বুঝি শুনিল। বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল। সকল বিষয়েই বড় ভয় হইত, আমি ভয়েই মরিতাম।'

লোকলজ্জায় জড়োসড়ো রাসসুন্দরীর মনে বই পড়ার জন্য আকুলতাও ছিল। স্বপ্নের মধ্যে তাঁর দোটানা কাটে, স্বপ্নবৃত্তান্ত দিয়েই রাসসুন্দরী তাঁর পাঠক হবার জীবন শুরু করেন।

> এক দিবস আমি নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি—আমি যেন চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছি। আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন আমার শরীর মন এককালে আনন্দরসে পূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোক বুজিয়া বার বার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। ...এ চৈতন্যভাগবত পুস্তক আমি কখনও দেখি নাই এবং আমি ইহা চিনিও না। তথাপি স্বপ্নাবেশে আমি এই পুস্তক পাঠ করিলাম...এ পুস্তক যে আমি পড়িব, ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমি যে স্বপ্নে এ পুস্তক পড়িলাম, ইহাতে আমি কৃতকার্য হইলাম। আমার জীবন সফল হইল। আমি পরমেশ্বরের নিকট সমস্তদিনই বলিয়া থাকি, আমাকে লেখাপড়া শিখাও, পুথি পড়িব। সেইজন্য পরমেশ্বর লেখাপড়া না শিখিয়াই স্বপ্নে পুথি পড়িতে ক্ষমতা দিয়াছেন।

...আমার জন্ম ধন্য, পরমেশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ভাবিয়া প্রফুল্লচিত্তে থাকিলাম।[২৬]

উদ্ধৃতিটি লম্বা, অভিজ্ঞতাটি অনন্য। অথচ তাঁর *আত্মজীবনী*-র নানা অংশে 'স্বপ্নমঙ্গল' আছে, যা চান তার জন্য স্বপ্নেই দয়ামাধবের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, 'মায়ের মহামন্ত্রে' পরমেশ্বরের নামটি তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রস্তুতির একটা রিহারসাল যেন রাসসুন্দরী স্বপ্নেই দিয়ে দেন, বাস্তব সেই স্বপ্নের ইচ্ছাপূরণ মাত্র। ফলে বাস্তবের প্রাপ্তিটা স্বাভাবিক, পরমেশ্বরের ইচ্ছাই রাসসুন্দরীর ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলে। ঐশ্বরিক ইচ্ছায় সম্ভব ও অসম্ভবের কার্যকারণ সম্পর্ক তুচ্ছ হয়ে যায়; সব প্রাপ্তিই তো সম্ভব, তখন 'মন ষড়ভুজ' হয়ে পড়ে।

পড়ার তৃপ্তি হয় স্বপ্নে, তার রেশটুকু জেগে থাকে দিনের প্রতি মুহূর্তে। বাঙালির অভিজ্ঞতায় পাঠের এই ইতিবৃত্ত অনন্য। দৈনন্দিন কাজকর্মের ফাঁক-ফোকরে রাসসুন্দরী অক্ষর দেখেন, দেখতে দেখতে আলাদা অক্ষর চাখেন। বাড়িতে চৈতন্যভাগবতের পুথি ছিল, পুথির পাটার উপর আঁকা ছবি দেখে তিনি পুথিটি চিনে রাখেন। পুথির একটি পাত সরিয়ে রাখেন, বড়ো ছেলের মকশো করা তালপাতার পাতও হাতিয়ে নেন। ছেলেবেলার পাঠশালার কথা মনে আসে, অক্ষর দেখেন ও চেনেন। নানা বাধা, তবু 'দুঃখের পড়া' চলতে থাকে, ভরসা পরমেশ্বর ও নিজের চেষ্টা।

সঙ্গে সঙ্গে রাসসুন্দরী জানান যে, 'ননদ'-রাও সমজুটি হল, প্রতিবেশিনীরা এল, মহিলামহল তৈরি হল, পাহারাদার নির্বাচিত হল। সেই একান্ত আসরে রাসসুন্দরী পাঠক, অন্যরা শ্রোতা। 'গোঙ্গাইয়া' পড়তে শিখেও রাসসুন্দরী নিজে শিল্পী, পারফরমার, পড়াটা যেন কারুকৃতি। এই পেরে ওঠার মধ্যেই রাসসুন্দরীর ইচ্ছার দায় ও পরমেশ্বরের বাঞ্ছা মিলেমিশে যায়, সারাদিন পড়ার সুখে 'সংসারের কাজ তৃণবৎ বোধ হইত', 'বিষয়ের দুঃখের ধার রাখিতাম না', 'পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রেমানন্দেই পরিতুষ্ট থাকিতাম।'[২৭]

নিজের সংসারে রাসসুন্দরী মাননীয়া, তাঁর আজ্ঞাতেই কলকাতা থেকে ছাপা সপ্তকাণ্ড বাল্মীকির রামায়ণ কিনে পাঠানো হল, তিনি পড়াও শুরু করলেন। তাঁর জবানিতে অভিজ্ঞতাটি শোনা যাক:

আমি প্রাপ্তি মাত্রেই মহা আহ্লাদিত হইয়া হাতে লইয়া দেখিলাম। তাহার ছাপার অক্ষর অতি ক্ষুদ্র। এ জন্য ও পুস্তক আমার পড়া হইল না। তখন আমার মনে যে কত কষ্ট হইল তাহা বলা যায় না। আমি ঐ পুস্তক হাতে লইয়া পরমেশ্বরের প্রতি অনুযোগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ...কিছুক্ষণ পরে আবার আমার ভারি লজ্জা হইতে লাগিল। ছি ছি আমি কাঁদি কেন। ...পূর্বে তো আমি

লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না, তাহা আমাকে কে শিখাইয়াছে। যিনি সদয় হইয়া দয়া করিয়া আমাকে এত দিয়াছেন, তাহার যদি কৃপা থাকে, তবে ও পুস্তকও আমি অনায়াসে পড়িতে পারিব।

এই ভাবিয়া কান্না সম্বরণ করিয়া মনঃস্থির করিলাম, পরে ঐ পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ঐ ছাপার অক্ষর অতি অল্প দিবসের মধ্যেই আমার বেশ পড়া চলিতে লাগিল।[২৮]

পড়ার আকুলতাকে রাসসুন্দরী তীক্ষ্ম ভাষায় প্রকাশ করেন। বই হাতে নিয়ে খুশি হওয়া, না পড়তে পারায় চোখে জল আসা ও অঝোরে কাঁদা, আবার লজ্জা পাওয়া— এই সব অভিব্যক্তি বই পড়াকে ঘিরেই প্রকাশ পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে পড়তে চাওয়ার আকুলতা ও না পড়তে পারাটা শরীরী, অক্ষরের আকৃতি ও ছাপার বিন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পুথি ও বই এক বস্তু নয়, বস্তু অর্থেই তারা পৃথক। দুইটি স্বতন্ত্র বস্তুকে কবজায় আনতে গেলে দুইটি পৃথক পাঠের অভ্যাস দরকার, চোখকে দুই ধরনের অক্ষরের ছাঁদের সঙ্গে সওয়াতে হবে। পুথি পাঠে অভ্যস্ত রাসসুন্দরীর কাছে ছাপা বইয়ের অক্ষরের শরীরী অবয়বের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

নানা ধরনের অক্ষর পড়তে পারাটা রাসসুন্দরীর প্রাপ্তি; নিছক ঐহিক অর্থে এই প্রাপ্তির পরিমাপ করা যায় না। সংসারের আবহাওয়া প্রতিকূল, কিন্তু দয়ামাধব সদয়। পড়ার মাধ্যমেই তিনি পরমেশ্বরের কৃপার পরশ পাচ্ছেন, আনন্দে আত্মমগ্ন হচ্ছেন। এই অলৌকিক বোধির জন্যই পারা বা না পারার সীমাকে রাসসুন্দরীর পড়ার সাফল্যটি অতিক্রম করে যায়। নিছক নৈমিত্তিকের কার্যকারণের গণ্ডিতে রাসসুন্দরী তাঁর নিজের পড়ার অভিজ্ঞতাটি বেঁধে রাখেননি; বরং নিজের আত্মগত ব্যাকুলতার মধ্যে তিনি নিয়ত ইচ্ছার একটি তাড়নাকেও স্বীকার করেন। এই অলৌকিকের দ্যোতনাকেই আনন্দবর্ধনরা 'ব্রহ্মাস্বাদতূল্য' বলে স্বীকার করে নেবেন।

পাবনার মেয়ে ও ফরিদপুরের গৃহবধূ রাসসুন্দরীর পাঠাভ্যাসের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পাঠাভ্যাসের পার্থক্য যোজনপ্রমাণ। অক্ষয় সরকারের অভ্যাস ও আনন্দ ধাপে ধাপে বিন্যস্ত, লেখার উদ্দেশ্য বাংলার জাতীয় সাহিত্য, ভাষা ও সমালোচনা রীতি গড়ে ওঠার আদিপর্বকে তুলে ধরা। এইসবের সঙ্গে নির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী আদর্শ পাঠক তৈরি হবার পদ্ধতিও বাতলানো আছে। তাঁর পাঠের মডেলটি 'একমুখী' ও আজকের ভাষায় 'সেকুলার'।

অন্যপক্ষে, রাসসুন্দরীর কোনো লৌকিক প্রকল্প নেই। স্বপ্নমঙ্গলে তাঁর পড়া শুরু, নিয়ত কারণের অঙ্কে তাঁর পড়াশোনা নির্ধারিত। তাঁর আত্মকথনে নিজের চেষ্টার বিবৃতিটি খুঁটিনাটিতে ভরা, হাড়ভাঙা খাটুনিতে সে চেষ্টা মহীয়ান, আবার ক্ষণে ক্ষণে লোকভয় ও উদ্‌বেগে চেষ্টাটি দীর্ণ। কিন্তু ঐশ্বরিক কৃপায় ও ইচ্ছায় দৈনন্দিনতার মধ্যেও সুযোগ পাওয়া যায়, নৈমিত্তিকও অপ্রত্যাশিতের বার্তা নিয়ে আসে। অনেকের চোখে

কর্তার ঘরে চৈতন্যভাগবত বইটি পড়ে থাকা বা ছেলের কলকাতায় পড়তে যাওয়াটা স্বাভাবিক, তুচ্ছ, নৈমিত্তিক ঘটনা। এইসব সাংসারিক তুচ্ছতার মধ্যেই পাঠের অপ্রত্যাশিত সুযোগ রাসসুন্দরী খুঁজে পান, দৈনন্দিনতার মধ্যেই তিনি হঠাৎ পাবার পরিসরটি তৈরি করেন। এই উত্তরণের কোনো ম্যানুয়াল লেখা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতাটি তাঁর ঐকান্তিক। এই পাঠে নির্ধারিত ট্রেনিং-এর যে-কোনো কার্যক্রম অবান্তর হয়ে যায় অথচ দৈনন্দিন খুঁটিনাটিগুলি দেখার তীব্রতায় ও শেখার আকুলতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পাঠাভ্যাসের বোধেই রাসসুন্দরী ও অক্ষয় সরকার ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন।

প্রত্যাশিত পাঠক্রমের ছকের বাইরে শ্রীমতী রাসসুন্দরীর পাঠাভ্যাসের অভিজ্ঞতা তৃতীয় এক অর্থ বহন করে। প্রসঙ্গক্রমে তনিকা সরকারের একটি মত বিচার্য। তাঁর মতানুসারে, ঈশ্বর সান্নিধ্যে যাবার জন্য রাসসুন্দরী বই পড়ার মাধ্যমকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই বাছাটি অভিনব, পদ্ধতিটি একেবারে নিজের পছন্দ। এইভাবেই স্ত্রী-শিক্ষার আধুনিক প্রকল্পের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যান। তিনি নাকি এটাও খোলাখুলিভাবে বলেন যে, এই স্ত্রী-শিক্ষার খবরের জন্যই তাঁর মনে পড়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে ('her desire to read was implanted by news of this')।[২৯]

এই নারীবাদী পাঠের সঙ্গে আমার বৈমত্য আছে। স্ত্রী-শিক্ষার খবর শুনে রাসসুন্দরীর পড়ার ইচ্ছেটা চাগিয়ে ওঠে, এমন কোনো প্রমাণ আত্মজীবনীতে নেই। পড়াশোনার ইচ্ছা সম্পর্কিত প্রথম প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি পড়া যেতে পারে।

> তখন আমার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তখন আমার মনে মনে নিতান্ত চেষ্টা হইল যে আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে। ...এখন যেমত হইয়াছে উহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।
>
> দশ পাঁচজন একস্থানে বসিয়া এই প্রকার আলাপ হইত। ঐ সকল শুনিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইত। আমার মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত। এমন কি, যদি একখানি কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে তাকাইয়া দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে যে লেখাপড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছি। কিন্তু আমি মনের সহিত সর্বদা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম, হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব।[৩০]

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বিন্যাস ও অন্বয় বিচারে স্ত্রী-শিক্ষার সংবাদপ্রসারের সঙ্গে

রাসসুন্দরীর লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা চাগিয়ে ওঠার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। বরং স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিকূল আলাপ তাঁকে সংকুচিত করত, তাঁর ইচ্ছাকে অন্তঃশীলা করে ফেলেছিল, একমাত্র একান্ত পরমেশ্বরকেই তিনি গোপন ইচ্ছাটুকু ভরসা করে জানাতে পারতেন। আখ্যানের এই বিন্যাসের সঙ্গে তনিকার সিদ্ধান্তটি সংগত বলে মনে হয় না।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, কালের তুলনাবিচারে কলিকালে 'দায়মালী কারাগারে' বন্দি রাসসুন্দরী বার বার শিক্ষাপ্রাপ্তির সৌভাগ্যের কথা বলেছেন, তাঁর মতে কলিকালের উৎকর্ষ সেখানেই। পড়ার ইচ্ছাটাও তাঁর একান্ত, তাঁর নিজের মনের কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদের প্রস্থানে তিনি বার বার নিজের মনকে স্বতন্ত্র সত্তা বলে ডেকেছেন, এই বিভাজনটি তাঁকে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি আলাপের পরিসর করে দিয়েছে, আখ্যানে বার বার মনকে বিষয় করেই ও সাক্ষী মেনে বিষয়ী রাসসুন্দরী ও অধিকারী ঈশ্বরের মধ্যে সংলাপ শুনি। পুথি পড়াটাও এই ধরনের বিষয়, মাঝবয়সী রাসসুন্দরী ফেলে আসা দিনগুলির অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে লেখেন:

> আমার লেখাপড়া বড় সহজ কষ্টে হয় নাই, যাকে বলে কষ্ট। সে লেখাপড়ার কথা আমার মনে উদয় হইলে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাকে যেন পরমেশ্বর নিজ হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন। নতুবা এমন অবস্থায় লেখাপড়া কোন মতে সম্ভবে না। যাহা হউক, আমি যে এক আধটি অক্ষর শিখিতে পারিয়াছি তাহাতেই আমার পরম সৌভাগ্য। বোধ হয়, এরূপ একটু না জানিলে আমিতো সম্পূর্ণ পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। এ নিজস্ব পরমেশ্বর আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি।[৩১]

এই অনুচ্ছেদে কঠোর সাধনা ও আত্মগত প্রাপ্তিকে রাসসুন্দরী স্বীকার করেছেন, স্বভাবভীরুতার লেশমাত্র বয়ানটিতে নেই, নিজের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানটি টনটনে। অথচ কোনো বৃহত্তর সামাজিক প্রকল্পে তাঁর কর্মটি বিধৃত নয়, কোনোরকম উদাহরণ হয়ে ওঠার ইচ্ছেও তাঁর নেই। প্রাপ্য সীমাতে সমাপ্তিটুকুই তাঁর কাম্য, নিত্য নতুন উন্নতির অভীপ্সা আর তাঁর পাঠাভ্যাসকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় না।

'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'

বাঙালির পাঠাভ্যাসের তৃতীয় মুহূর্ত হিসাবে আমি বেছে নিচ্ছি একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস ও একটি সমগোত্রীয় গল্প। বিশ শতকের শুরু থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত সময়কাল এর মধ্যে ধরা আছে। আমাদের অতি পরিচিত অপূর্ব বা অপু পাঠক হিসাবে সর্বভুক্, যা পায় তা-ই পড়ে। দর্শক হিসাবেও সে চিরকৌতূহলী, হামলে পড়ে, যা দেখে

তাতেই অবাক হয়। এই পড়া ও দেখা, বইয়ের পাঠ ও প্রকৃতির পাঠ তার কাছে একাকার হয়ে যায়, তাই তাকে নায়ক করেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন *পথের পাঁচালি*। এই দুই পাঠের মেলবন্ধনের বিবৃতিটুকু বাংলা সাহিত্যে নতুন, বিবরণের খুঁটিনাটিতে অনন্য। উপকরণটি বড়ো সামান্য, কথক বামুনের ঘরে ছেঁড়াখোড়া একটি বই, সময়টি গ্রীষ্মের নিঝুম দুপুর, অনন্ত অবকাশ। দুইয়ের সমবায়ে গড়ে ওঠে পাঠাভ্যাসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘন বর্ণনাটি:

> তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলো হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানি বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে:
>
> অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে,
> রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
> ভগ্নঊরু। দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
> এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলা মোরে।[৩২]

বইটির বর্ণনা শরীরী, লেখকটি অপুর কাছে অজানা, আমাদের কাছে অবশ্য নয়। অথচ অপুর প্রাপ্তিবোধটুকু অন্যত্র। তার পড়ার অভ্যাসে বইয়ের জগৎ প্রসারিত হল নিজের পরিপার্শ্বে, পরিপার্শ্বটাই হয়ে উঠল বইয়ের পড়া জগৎ। গ্রামের উত্তর মাঠের মজা পুকুরটিই দ্বৈপায়ন হ্রদ, এ পুকুরটার মধ্যেই 'সে ভগ্নঊরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না।' অপু একাই সেটা জানে, লেখকেরও জানার দরকার পড়ে না। অপু বলে পাঠকের কল্পনার জোর এখানেই, পড়াটা এ ক্ষেত্রে রূপের অন্তর ঘটায়, বাস্তবটা ফর্দাফাঁই হয়ে কল্পলোকে প্রতিভাত হয়, সময়টা অসীম হয়ে ওঠে। পড়ার রেশ থেকেই যায়, অপু ভাবে:

> উত্তর মাঠের কলাবেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনোদিকে...তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানববেদনা...কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্দ্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছে!

ভারতীয় রসতত্ত্বের শিরোপা অপূর্ব পেতেই পারে, সে সহৃদয়, খাঁটি পাঠক। তাই

তার মানসপ্রত্যক্ষ ঘটে, 'প্রমৃষ্টাত্তক স্মৃতি'-টুকু জেগে ওঠে। লেখকের নাম অজানা থাকলেও পাঠক হিসাবে অপুর আনন্দভোগে বাধা থাকছে না। গ্রাম্য বালক অপু সেই অপমানিত বীরের সঙ্গী—এই সহমর্মিতাতেই রসের সাধারণীকৃতি হচ্ছে, দেশ ও কালের ব্যবধানের অন্তর ঘুচে যাচ্ছে, পাঠের অভিঘাতটি সেখানেই। আর পাঠক তো লেখক নয়, কৈফিয়তের কোনো দায় তার নেই, তার পাঠের অভিজ্ঞতা স্বয়ংসিদ্ধ, তার স্রষ্টা ও ভোক্তা সে নিজেই। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্যকে কলা দেখিয়ে সে পড়ে চলে, পড়ার গণ্ডিতে সে দারুণ স্বেচ্ছাচারী।

বিভূতিভূষণের জবানিতে পাঠক অপু স্বাধীন, নিঃসঙ্গ ও মুক্ত। বই পড়া তার নিত্য অভ্যাস, কিন্তু বই বলে বস্তুটি সে পাবে কোথায়? সে বড়ো হয়, তার জানা বইগুলি পালটে যায়, পড়ার রীতিও পালটায়। তখন ছেলেবেলায় পড়া *সীতার বনবাস* ও *ডুবালের গল্প* পানসে লাগে। বড়োলোক বাড়ির পুকুরের মাছ পাহারা দেবার শর্তে সতুর আলমারির বইগুলি সে গোগ্রাসে শেষ করে। বইয়ের নামের বাহারই আলাদা—*প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুমকুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী*, আরও কত কী। তার বর্ণনায় আবার বিভূতিবাবু বই পড়ার প্রতিটি ঢং ও ভঙ্গিকে জায়গা দেন, পাঠক ও তার পাঠাভ্যাস শরীরী হয়ে ওঠে:

> একটি একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে,—গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দু এক মিনিট কি যেন ভাবে, আনন্দে, বিস্ময়ে উত্তেজনায় তাহার দুইকান দিয়া আগুন বার হইতে থাকে, পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিদিকে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখির ডাক শুরু হয়, উঠি উঠি করিয়াও বই-এর পাতার এক ইঞ্চি উপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।[৩৩]

অনুপুঙ্খে ভরা বিবৃতি—টানটান আগ্রহ অপুর ভঙ্গি, আচরণ ও শরীরের বিন্যাসে অবয়বী হয়ে ফুটে ওঠে, পড়ার পরিশ্রমের ভার ও বেলা ঢলে পড়ার ক্লান্তি একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। বই পড়া একার্থে আনন্দ ও পরিশ্রম দুটিই, এই কথাটা বিভূতিবাবুর অপু ছাড়া আর কয়জন বোঝে?

বিভূতিভূষণের অজানা নয় যে, অসম সমাজে পড়ার কাজ ও পড়া থেকে আনন্দ পাওয়াটাই একটা বিলাসিতা, সবার পক্ষে সাজে না, ইচ্ছে থাকলেই সবাই সেই সুযোগ পায় না। অতি কষ্টে গোপনে কবচ লেখার দু-টাকা বাঁচিয়ে গরিব হরিহর অপূর্বকে *বঙ্গবাসী* কাগজের গ্রাহক করে দেয়। অপুর কাছে সেই প্রাপ্তিটি রূপে, স্পর্শে, গন্ধে প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে:

> হ্যাঁ খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে বঙ্গবাসী কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য সে তীর্থের কাকের অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবার হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত।[৩৪]

বিভূতিবাবুর অপু পরে অপূর্ব হয়, বই পড়াটা সেই হয়ে ওঠার একটা ধাপ, বিভূতিবাবুর উপস্থাপনায় হয়তো বা 'উত্তরণ'। একার্থে বই পড়ার এ জাতীয় উপস্থাপনাটাই রোমান্টিক, রূপান্তরবাদী ও স্বপ্রকাশের গুণসম্পন্ন। নানাভাবে বইয়ের পড়াটি রুচিনির্মিতি তথা সাহিত্যিক সত্তা বিকাশের চিহ্ন হয়ে ওঠে। বই পড়া আর জগৎ দেখার মধ্যে সম্পর্ক হয়, পড়াটা দেখতে শেখায়, লিখতে প্রাণিত করে। এ ক্ষেত্রে যেন শৈশবের পাঠের সঙ্গে কৈশোরকের পাঠের প্রভেদ হচ্ছে। ইছামতীতে পল্টুর বাওয়া নৌকাতে সে পাড়ি দিচ্ছে, চালতে পোকার ঝাঁকে যেন উড়নশীল পক্ষীকে অপু স্পষ্ট দেখল। পাঠক লেখক হয়ে যায়, 'সহায় সম্পদহীন' পল্লীবালক নিজে খাতা লেখে, 'বৃহত্তর জীবনের আনন্দযজ্ঞে' সাদর আহ্বান শোনে।

পড়া, দেখা, শোনা, লেখা—অনুভূতির এই সব পাঠ যেন বইয়ের পড়ার মধ্যেই আছে। ডায়েরিতে আছে বিভূতিবাবুও নানা বই পড়ছেন, *পথের পাঁচালি* লিখছেন, সময় গুনছেন, প্রকৃতি দেখছেন। ঐকান্তিক পাঠাভ্যাসকে সৃজনশীলতার সঙ্গে মেলানোর স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে বাঙালির পাঠচর্চার আরেকটি মুহূর্ত। পড়াটাই যেন ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠছে এক সৃষ্টির উল্লাস, আদর্শ পাঠক তো নিজেই স্রষ্টা, বিষয়ী ও সম্রাট। বিভূতিভূষণ যেন অপুর মতো 'হৃদয় সংবাদী' পাঠকের অপেক্ষা করেন। তার পড়া, দেখা ও শোনার মধ্য দিয়ে পাঠক আসলে লেখকের সঙ্গে কথা বলে: আদি অর্থে সংবাদ তো আলাপ, কথোপকথন। অর্থেই তাই রসধ্বনিকাররা ও বার্ত ফিরে আসেন, সেই মুহূর্তে পাঠকের নিজের পড়াটাই হয়ে ওঠে লেখকের লেখা!

পড়া বনাম 'না পড়া'

অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সহকর্মী ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্যালা ও টেনিদাদের স্রষ্টা। ওই সিরিজের বাইরেও তিনি কয়েকটা গল্প লিখেছেন, এমনকী জানিয়েছেন, 'বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে দেখি, জীবনের সত্য ঘটনাগুলি তাদের চাইতে ভালো গল্প লিখেছে।' 'সেই বইটি' গল্পটি শারদীয় পূজাবার্ষিকীতে বেরোয়, পরে বাছাই করা সংকলনে ছাপা হয়। লেখক ফ্লাশব্যাকের রীতিটি বেছেছেন, গল্পটি যেন একটা স্মৃতিচারণ, সময়ের উজান বেয়ে চলা। দৈনন্দিন অভ্যাসের মতোই যশস্বী লেখক প্রকাশকের দোকানে বসে আছেন, কাউন্টারে বইয়ের স্তূপ, হঠাৎ চোখটি একটা সাবেকি বইয়ের প্রচ্ছদে আটকে গেল: 'মলাটে সেই পুরনো ছবিটি—গাঢ় নীল বড় বড় হরফে

লেখা, ''গহন বনের গল্প'', লেখক প্রিয়দর্শন মিত্র।' অনুভূতিকে লেখক এইভাবে হাজির করছেন, অসংখ্য বইয়ের মাঝে 'বহুদিনের চেনা বইখানা সেই চেনা চেহারা নিয়ে করুণ চোখে যেন আমার দিকে তাকালো'।[৩৫] বই আত্মগত হয়ে ওঠে, বন্ধু প্রকাশকের কাছে লেখক বইটি বিনা দামেই পান, 'ওসব তো পুরনো হয়ে গেছে, আজকালকার ছেলেরা আর পড়ে না।'

রঞ্জন তো সেকালের মফস্সলি ছেলে। দিনাজপুরের স্কুল, গ্রীষ্মের ছুটির ঠিক আগে উড়ু উড়ু মন নিয়ে ক্লাসে বসে আছে, ড্রয়িং মাস্টারমশায় মৌলভি সাহেব বেবাক ঘুমোচ্ছেন, ক্লাসের সেরা আঁকিয়ে খগেন বেনচিতে বসে গল্পের বই পড়ছে। বাংলা স্কুলের এক অতি চেনাজানা দৃশ্য, সংলাপটিও প্রত্যাশিত:

> কী বইরে ওটা খগেন? কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। খগেন জবাব দিল না। একেবারে তন্ময়।
>
> এই, বল না—কী বই? খগেন ভারী বিরক্ত হলো। রুদ্ধশ্বাসে বইয়ের পাতা উলটে বললো, এখন ভীষণ ব্যাপার, রাত্তিরবেলা সিংহ এসে তাঁবু থেকে শিকারীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। গোলমাল করিস নে এখন।

এইভাবেই সহপাঠী ও পাঠক খগেনের কাছ থেকে গহন বনের গল্পের কথা রঞ্জন জানছে। খগেন বইটি হাতছাড়া করবে না, পরের কাছ থেকে চেয়ে আনা বই তো, সন্ধেবেলাতেই ফেরত দিতে হবে। রঞ্জনও নাছোড়, বইটি একটু হাতে পেতে চায়, ধরতে চায়, তাতেই সুখ।

> খগেনের করুণা হলো। বইখাতার তলা থেকে সন্তর্পণে বইটা বার করে দিলে।
>
> কিন্তু না দেখালেই ভালো হতো। মোটা, বড় সাইজের বই—পাতায় পাতায় বুনো জানোয়ারের রোমাঞ্চকর ছবি! ছোট, বড় অসংখ্য গল্প—কোনোটা 'মানুষখেকো সিংহ', কোনোটা 'গরিলার বিভীষিকা', কোনোটা 'কুমিরের করাল গ্রাস'। পড়বার আগেই গা ছমছম করে ওঠে।[৩৬]

শিহরণ, রোমাঞ্চ, ছমছমে অনুভূতিতে বইয়ের রূপের প্রতি টান ধরা পড়ছে, বইটাই তখন তার কাম্য। একবার পড়তে পাবার জন্য রঞ্জন সবকিছু করতে পারে, কিছুর তোয়াক্কা সে রাখে না। বিশ্ববখাটে কালীতলার কুঞ্জকে তোয়াজ করে সে বইটা বাগাতে চায়, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স কেনার টাকা ভাঙিয়ে কুঞ্জকে সে চপ ও সিগারেট

খাওয়ায়. সিনেমা দেখার জন্য পাঁচ আনা পয়সা দেয়। কারণ বইটা পড়ার জন্য 'জ্বরের মতো নেশাটা কাঁপছে, নিশির ডাকের মতো হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।' পরের দিন সকালে চুক্তিমাফিক রঞ্জন কুঞ্জের বাড়িতে বইটা নেবার জন্য দৌড়ায়। 'এমনি পাবো, এখনি হাতে আসবে, কালকের সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে, সারা রাত্রি যা নিয়ে স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে, যার জন্য চায়ের দোকানে ঢুকেছি, কুঞ্জকে সিগারেট খাইয়েছি—মিথ্যে বলেছি মায়ের কাছে—এখনই সেই মহাসম্পদ এসে যাবে আমার হাতের মুঠোয়।'[৩৭] ইচ্ছে করে কুঞ্জ কথার খেলাপ করল, পুরোনো ঝগড়ার শোধ নিল, রঞ্জন শেষ পর্যন্ত বই হাতে পেল না। ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স না আনার জন্য মাস্টারমশাইয়ের কাছে সে মারও খেল।

কুড়ি বছর বাদে এই না-পড়া বইটা রঞ্জনের কাছে ফিরে এসেছে, সেই দিনের পাঠক আজকে লেখক, তার পুরো দখল বইটার উপর, আর কেউ ভাগীদার নেই। তবু বইটা না পড়াই থাকবে:

> এতদিন পরে ফিরে এসেছে বইটা, এ বই এখন আমার। যতবার খুশি পড়তে পারি, ইচ্ছে করলে মুখস্থ করতে পারি—পাড়ার সকলকে ডেকে শোনাতে পারি।
>
> কিন্তু কিছুই করব না। আমার লাইব্রেরির পাঁচহাজার বইয়ের ভিতর—দিশি বিলাতি অজস্র ঝকঝকে বইয়ের মাঝখানে ওকে আমি লুকিয়ে রাখব। যদি আজ আর না ভালো লাগে? কুড়ি বছর আগের মনটা এর মধ্যে যদি বদলে গিয়ে থাকে? তা হলে? তা হলে?[৩৮]

নানা সংস্কার ও অনুষঙ্গে বই সময়ের খণ্ডকে মলাটে বেঁধে রাখছে, বইয়ের পাতাগুলিতে যেন বিষয়ী পাঠকের অতিক্রান্ত জীবনের এক পর্ব থমকে আছে। সেই আবেশটুকু সময়ে ও বয়সে ভাঙতেই পারে. ভালো লাগাটাও যে সময়লগ্ন। বইটাকে না পড়ার মধ্য দিয়েই কৈশোরের পাঠককে বয়স্ক পাঠক সম্মান দিলেন, সেই বিচারকে ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেবার কোনো সুযোগই রাখলেন না। পড়ুয়াকে মান আরেক পড়ুয়াই দিতে পারেন। বই পড়ার জন্য যে কত মূল্য দিতে হয় তা তো তিনি ভালো করেই জানেন।

'লেখা পড়া' না 'পড়া লেখা'

লেখা-পড়ার দ্বন্দ্ব দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফেরা যাক। আমার পড়ার ভাবনাও তো লেখাতেই ফুটে উঠছে, এই গোত্রের লেখার নাম, 'প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা গ্রন্থন'। এই সবকটা নামের মধ্যে বাঁধাবাঁধির ভাব আছে, গাঁথুনিটা দরকার, আঁটোসাঁটো না হলে

হাততালিটা পাব না। বিপরীতে, পড়ার আরেকটি বহুল প্রচারিত তৎসম শব্দ হল অধ্যয়ন (অধি-ঈঅন্), 'ই' ধাতুর মূল অর্থ যাওয়া, গমন। লেখা যেন বাঁধে, গণ্ডি টানে; এবং পড়াটা চলে, চলতেই থাকে। অভিনবগুপ্তর পাশে বার্ত ফুকরে উঠে বলেন, বলছ পড়া নিয়ে, আসলে তো লিখছ, পড়া নিয়েই লেখা, 'Writing Reading'।[৩৯]

এই বিশেষ লেখক-পাঠকটির ধারণার আবির্ভাব উনিশ শতক থেকেই। যোগ্য পাঠকের জন্য কবে থেকে ভবভূতি হেদিয়ে মরছিলেন, সমানধর্মী সহমর্মীর জন্য তাঁর আক্ষেপ বাঙালি সাহিত্যিকরা উনিশ ও বিশ শতকে প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। ভারতীয় রসধ্বনির আলোচনায় সহৃদয় পাঠকই সর্বেশ্বর, এটাও অজানা নয়, তাঁর রসভুক্তিতেই লেখকের রচনার সার্থকতা। কবি নিজেই পাঠক হতে পারেন কি না, তাই নিয়ে বিতর্কও আছে।[৪০] মধ্যযুগের ভক্তিসাধনায় গ্রন্থবিশেষ ও তার পঠনপাঠন বার বার ফিরে আসে, গ্রন্থই ঈশ্বরের রূপ পায়, পাঠক হয়ে পড়ে ভক্ত। চৈতন্যভাগবত থেকে প্রেমবিলাসে এই অভিজ্ঞতার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সেখানে কোনো নাগরিক ভবানীচরণ বা কিশোর অপুকে খুঁজে পাওয়া ভার হবে। আধুনিক সাহিত্যে পাঠক একটি স্বতন্ত্র চরিত্র, লেখকরা যেন বিশেষভাবে সেই পাঠকটিকে হাজির করছেন। প্রথমত, একার্থে পাঠকের বকলমে লেখক আসছেন, ওই পড়ার প্রস্তুতিটা লেখকেরই হয়ে ওঠার পর্ব। দ্বিতীয়ত, পড়া নিয়ে লেখার মধ্যে আত্মভাবনার প্রক্রিয়াটি ধরা পড়ে, ছাপা বইয়ের বস্তুগ্রাহ্য রূপ আত্মভাবনার নানা প্রকরণে রূপান্তরিত হয়, বইয়ের অবয়ব বর্ণনায় পাঠকও একার্থে শরীরী রূপ পায়। এই ভাবনাটি ভিন্ন ভিন্ন, ভবানীচরণের শহর কলকাতায় বই নিয়ে বাবুয়ানির সঙ্গে বইয়ের জন্য অপুর্ব বা রঞ্জনের আকুতির প্রকাশের মধ্যে প্রভেদ অনেক। প্রথম পাঠক গোষ্ঠী ও সমাজের কেন্দ্রে আছে; অন্যপক্ষে, অপূর্বর পাঠ যেন ব্যক্তিগত। আরও বলতে পারা যায় যে, বিভূতিভূষণের মতো লেখকদের রচনাতেই যেন আদর্শ পাঠকের প্রাক্-উপস্থিতি থাকে। এই পাঠক যে সবসময় বাস্তবসম্মত তা নয়, বরং কল্পিত ও আদর্শায়িত। একেই আধুনিক লেখকরা বাস্তবে উদ্দিষ্ট করছেন, আবার বইয়ের মলাটের মধ্যে পাঠকের চরিত্র তৈরি করে হাজির করছেন। আধুনিক লেখকের লেখার অভ্যাসের সঙ্গেই পাঠাভ্যাসেরও সম-আখ্যান তৈরি হচ্ছে, একটা আরেকটার পরিপূরক, লেনদেনের খেলাটা চলতেই থাকে। লেখায় পাঠকের জন্য এই কুলুঙ্গি তৈরি করাই তো অন্তর্ঘাত, লেখকের সার্বিক প্রাধান্যের মধ্যে পাঠকের আবশ্যিক ও আদর্শায়িত উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পড়াটাকে ধরছি লেখার মধ্য দিয়ে, লিখিত বিবৃতি ও বর্ণনাই তো উৎস। এই অর্থে পাঠাভ্যাস লেখার বিষয়, পাঠ যেন লেখার অভ্যাসেই জায়গা পাচ্ছে। পড়া লিপিতে অঙ্কিত হচ্ছে, পড়া লেখক তৈরি করছে; লেখক এখানে বিশিষ্ট, পড়ার অভিমুখ লেখার দিকে। পড়া ও লেখা, লেখা ও পড়া, এই যুগ্ম পদের মধ্যেই বিশেষ ও নির্বিশেষের খেলা চলে, বার্ত ও অভিনবগুপ্ত হাত ধরাধরি করেন।[৪১]

উভয়পক্ষে বিনিময়ের সামর্থ্য যে সমান, তা না-ও হতে পারে। *অপরাজিত*-র

অপূর্বের সঙ্গে *বিলাতযাত্রী*-র লেখকের দেখা হয়, তাঁর কেজো জীবনের অভিজ্ঞতা এক গ্রাম্য বালকের পড়ায় অন্য এক কাব্য হয়ে উঠেছিল।[৪২] পাঠকের পাঠটি অপূর্বর, আর কারুর নয়। পরম্পরা বা প্রস্থানের পরিবর্তে ঐকান্তিকতার এই দাবিটুকুই আধুনিক পাঠকের নিশান।

ইতিহাসবিদ্যার সংস্পর্শে আলোচ্য মুহূর্তগুলি কালানুক্রমিকভাবেই এসেছে, আগের লেখক/পাঠকের বিবৃতিটি আগে, পরের পাঠক ও তাঁর বিবৃতিটি পরে। তবে এই ঐতিহাসিক ক্রমটিই যে স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা কিন্তু নয়। যে-কোনো কালাধারে মুহূর্তগুলি পাশাপাশি থাকতে পারে, দেশবিদেশে পড়ার অভিজ্ঞতাবিশেষে ওই মুহূর্তগুলির ক্রমবিন্যাসে হেরফের থাকতেই পারে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালির পাঠাভ্যাসের ইতিহাসে এই মুহূর্তগুলির আশ্রয় কোথায় বা কী? কীভাবে অভিনবগুপ্ত বা বার্তের নন্দনতত্ত্ব উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালির সময়ে ঋদ্ধ? কোন 'মেটাহিসট্রির' সঙ্গে এই মুহূর্তগুলির যোগ আছে? জাতীয়তাবাদের ইতিবৃত্তে না আধুনিকতার ইতিকথায় না উত্তর-আধুনিকতার কোনো না কোনো ভেঙে যাওয়া প্রকল্পে? আধুনিকতার একটি লক্ষণ বই পড়া, এই কলিকালে 'নভেল' পড়েই তো বাঙালি মেয়েরা গোল্লায় গেল। আবার এ-ও শোনা যেত যে, সাহিত্যের ইতিহাসই বাঙালির জাতীয় ইতিহাস, ঠিক ঠিক বই পড়া যে-কোনো সংস্কৃতিবান দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। পাঠক তৈরি করবার দায়িত্বও সাহিত্যরথীরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। উপন্যাসের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ধমকে দিতে দ্বিধা করেন না। আর তার প্রায় ৭০ বছর পরে *দময়ন্তী* কাব্য সংকলনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু ছন্দের নোট বই জুড়ে দেন, বাঙালি পাঠকের কানটি তৈরি করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

এই সমস্ত আলোচনার সূত্রেই বই পড়ার বিবরণগুলি খাপ খেয়ে যায়। গ্রন্থনা নিয়ে অসুবিধে নেই, বরং মুহূর্তগুলি নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে গ্রন্থিত হয়ে ভিন্ন প্যাটার্নের রূপ নিতে পারে। তৎসত্ত্বেও মনে হয় যে, একক অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রত্যেক মুহূর্তই স্বরাট ও স্বকীয়। লেখার মাধ্যমেই লেখক ঐকান্তিক পাঠাভ্যাসের আস্বাদটুকু আরেক পাঠককে দিচ্ছেন, পাঠকও উন্মুখ হয়ে পড়ছে। বিনিময়ের ব্যাখ্যানটুকুই পাঠের ইতিহাসের বড়ো প্রাপ্তি।

এই রচনাটির একটি আদি রূপ Society and Change-এর উদ্যোগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা রূপে ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে মহাবোধি সোসাইটি হলে পঠিত হয়।

১. 'পয়লা নম্বর', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২৩শ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ (কলকাতা, ১৯৫৮)।

২. পাশ্চাত্যে বইকে ঘিরে লেখক ও পাঠকের ইতিবৃত্ত রচনার সমস্যা নিয়ে ঝাঁঝালো বিতর্ক, 'How Revolutionary was Print Revolution', AHR Forum, *American Historical Review* (February, 2002), pp 84-128। এই সংখ্যাটিতে এলিজাবেথ আইজেনস্টাইন ও এড্রিয়ান জোনসের বিতণ্ডার সূত্রে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, পুস্তকাদির একটি হাল নাগাদ তালিকা ও সারসংকলন সহজেই পাওয়া যেতে পারে। জাতীয়তাবাদ প্রকল্পে মুদ্রণের

ভূমিকা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, Benedict Anderson, *Imagined Communities* (London, 1983), pp 45-6

৩. পাশ্চাত্যে এই জাতীয় গবেষণার সাধারণ ছকটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, Lucien Febvre and Henri-Jean Martin, *The Coming of the Book The Impact of Printing, 1450-1800* (London, 1976)। ছাপা বইকে ঘিরে সম্ভাব্য সব বিষয় নিয়ে আলাদা করে আলোচনা থাকলেও বইয়ের পাঠককুল স্বতন্ত্রভাবে এই আলোচনায় অনুপস্থিত। বই পাঠ নিয়ে গল্পগাছার ভঙ্গিতে লেখা চিত্তাকর্ষক বই, Alberto Manguel, *A History of Reading* (London, 1995)।

৪. Priya Joshi, *In Another Country Colonialism, Culture and the English Novel in India* (New York, 2002).

৫. বাংলা বইয়ের ছাপা ও মুদ্রণ নিয়ে এতাবৎকালের সেরা সংকলন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা, ১৯৮৯)। এই গ্রন্থে বাঙালির পাঠরীতি নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির বই পড়া নিয়ে এতাবৎকালের রচনাগুলি নানা ধরনের 'রম্যরচনা' বা ব্যক্তিগত নিবন্ধের সুরে লেখা হয়েছে। কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'বই', *ব্যক্তিগত* (কলকাতা, ১৩৫৩), বুদ্ধদেব বসু, 'পড়া', *উত্তর তিরিশ* (কলকাতা, ১৯৮৭); সৈয়দ মুজতবা আলি, 'বই', *শ্রেষ্ঠ রচনা* (কলকাতা, ১৯৬৫), শঙ্খ ঘোষ, *বইয়ের ঘর* (কলকাতা, ১৯৯৬)। ভারী ইতিহাস লেখাটা এঁদের কারুরই উদ্দেশ্য নয়, আনন্দটা কারু কারুর মধ্যে চারিয়ে দিয়েই এঁরা তৃপ্ত।

৬ একটি আলোচনার ধারা সমালোচনার ক্ষেত্র তথা 'পাবলিক' বা জনরুচির নির্মিতির সূত্রে হয়েছে, যেমন, P K Dutta, *Bangla Sahitya and the Vicissitudes of Bengali Identity in the Latter Half of the Nineteenth Century*, অপ্রকাশিত নিবন্ধ। আরেকটি অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস, বিশেষত পাড়ায় বা গ্রামে স্থানীয় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। উল্লেখ করার মতো নির্ভরযোগ্য কাজ, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য, *বাংলাদেশের গ্রন্থাগার*, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৫৭)।

৭. দ্রষ্টব্য: *যোগসূত্র*, কথকতা সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৬)।

৮. দুপুরবেলা মহিলামহলে বাড়ির বড়ো বউ আধুনিক বাংলা 'নভেল' পড়ছে, শাশুড়ি সমেত নবীনদের দঙ্গল পড়া শুনছে, এইরকম পরিস্থিতির বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বিষবৃক্ষের ফল', *প্রভাতগ্রন্থাবলী*, ২য় ভাগ, বসুমতী সহিত্য মন্দির সংস্করণ, পৃ ২৪৮-৯। রাজশেখর বসুর দাদা শশীশেখর বসু ও তাঁর রচনায় 'নভেল' পড়ার পারিবারিক আসরের বর্ণনা দিয়েছেন অরুণ নাগ, *চিত্রিত পদ্মে* (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ ৯০-২।

৯. সন্ত আমব্রোসের পড়া প্রসঙ্গে সন্ত অগাস্টিনের বিখ্যাত বর্ণনা ও তার তাৎপর্য আলোচনা, Mary Carruthers, *The Book of Memory* (Cambridge, 1990), pp. 168-72

১০. Roland Barthes, *The Pleasure of the Text,* trans Richard Miller (New York, 1975), pp 10-11, 16, 27, 35-6 এ ছাড়া, Preface, *Sade, Fourier, Loyola,* trans. Richard Miller (London, 1977), pp 3-10; *The Grain of the Voice,* trans Linda Coverdale (London, 1985), pp 156-76.

১১. বার্তের কাছে ঋণ স্বীকার করে অন্তর্ঘাতী পাঠের রূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, Michel de Certeau, 'Reading as Poaching', *The Practice of Everyday Life*, trans Steven Rendall (Berkeley, 1984), pp 164-76। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যে পুস্তক পাঠের ইতিহাস নিয়ে বিচার, Roger Chartier, 'Communities of the Readers', *The Order of Books* (Stanford, 1994), pp 1-23

১২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিচারের জন্য দ্রষ্টব্য: Daniel Ingalls সম্পাদিত *The Dhvanyaloke of Anandavardhana* (Cambridge, Mass., 1990)। ধ্বনিতত্ত্বে সহৃদয়ের বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা: S. K De, *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetics* (Bombay, 1963), pp. 61-79। আলংকারিক পরম্পরায় রসধ্বনি তত্ত্বের যুক্তিবিন্যাসের সারগ্রাহী আলোচনা: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *সাহিত্য-মীমাংসা* (বিশ্বভারতী, ১৯৭৫); কারিকা, বৃত্তি ও টীকার সংস্করণ ও অনুবাদ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য, *ধ্বন্যালোক* ও *লোচন* (কলকাতা, ১৯৮৬)।

১৩. *Sade, Fourier, Loyola*, p 10

১৪. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীর জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

১৫ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থমালা (কলিকাতা, ১৩৫৮)।

১৬ ওই, পৃ ৩৬-৭।

১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (কলকাতা, ১৩৭৭), পৃ ৬০।

১৮ *কলিকাতা কমলালয়*, পৃ ৪২।

১৯ 'পিতা-পুত্র', *বঙ্গভাষার লেখক*, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৩১১)। অক্ষয়চন্দ্র প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে, আত্মজীবনীতে বাংলা সাহিত্য শিক্ষার কথাই তিনি প্রধানত বলবেন। দ্রষ্টব্য: পৃ ৪৬৬।

২০. ওই, পৃ ৪৬৭-৮।

২১. ওই, পৃ ৪৮১।

২২. ওই, পৃ ৪৮৩।

২৩ ওই, পৃ ৪৮৯।

২৪ ওই, পৃ ৫২৪।

২৫। বিস্তৃত আলোচনা: Tanika Sarkar, *Words to Win* (Delhi, 1999)। সারগ্রাহী তালিকার বিশদ আলোচনার মধ্যে দু-একটা তথ্যবিচ্যুতিও নজরে পড়ে। অনুবাদিত বইটিতে সবসময় 'রাসসুন্দরী দেবী' বলা হয়েছে। অথচ *আমার জীবন*-এর ১৩০৫।১৩১৩ সনের আখ্যাপত্রে নামটি তৎকালীন রীতিমাফিক মুদ্রিত হয়, যেমন 'শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক লিখিত'। কিছুদিন পরে ফরিদপুর জেলার শিকদার/সরকার পরিবারের গৃহবধূ রাসসুন্দরীর নামের সঙ্গে 'দাসী' যুক্ত হয়। কায়স্থ সমাজের রীতি অনুযায়ী সেই নামেই বইটি পুর্নমুদ্রিত হয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভূমিকা লেখেন। মনে রাখা দরকার যে, সরলাবালার মেজো ছেলে কিশোরীলাল সরকার কায়স্থ সমাজের কেষ্টবিষ্টু ছিলেন। বিংশ শতকের শুরুতে বাঙালি সমাজে 'দাসী' কথাটি অব্রাহ্মণ ও 'দেবী' কথাটি ব্রাহ্মণ বংশজাত মহিলাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বাদ-বিসংবাদের শুরু হয়। 'রাসসুন্দরী' কবে থেকে 'দাসী'র পরিবর্তে 'দেবী'তে রূপান্তরিত হলেন? আরও বলা যেতে পারে, তনিকা ঠাহর করেছেন যে, 'জিতাক্ষর' কথাটি রাসসুন্দরী তৈরি করেছেন, ইংরেজিতে নিজের অনুবাদকর্মের নামও ওই শব্দবন্ধের অনুসারে দিয়েছেন। কোনো প্রচলিত অভিধানেই তিনি নাকি শব্দটি খুঁজে পাননি। দ্রষ্টব্য: পৃ ১৭০। অথচ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ* শব্দটি যথাস্থানেই আছে। শব্দটি রাসসুন্দরীর নিজের তৈরি করা নয়।

২৬। 'আমার জীবন', *আত্মকথা*, ১ম খণ্ড, নরেশচন্দ্র জানা প্রমুখ সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ২৮।

২৭. ওই, পৃ ৩২-৩।
২৮. ওই, পৃ ৪২।
২৯. Tanika Sarkar, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৩।
৩০. 'আমার জীবন', প্রাগুক্ত, পৃ ২২-৩।
৩১. ওই, পৃ ৪৩।
৩২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী* (১৩৩৬; কলকাতা, ১৩৭২), পৃ ১৪১।
৩৩ ওই, পৃ ২৪২।
৩৪. ওই, পৃ ২৪৫।
৩৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সেই বইটি', *সব সবেস. ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন*, রমেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত (কলকাতা, সন অনুল্লেখিত)।
৩৬ ওই, পৃ ১৮২।
৩৭. ওই, পৃ ১৮৪-৫।
৩৮. ওই, পৃ ১৯০।
৩৯ Roland Barthes, 'Writing Reading', *The Rustle of Language* (London, 1986), pp 29-32
৪০. উদাহরণগুলির জন্য দ্রষ্টব্য. T N Sreekantaiya, *Indian Poetics* (New Delhi, 2001), pp 184-90
৪১. তুলনীয় অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, 'একটি রাজনৈতিক কবিসত্তার জন্ম ও মৃত্যু: সংশয়ান্বিত স্মৃতিচারণ', *অনুষ্টুপ*, শারদীয় ১৪১০ (২০০৩), পৃ ২৩৫-৭।
৪২. *বিভূতিরচনাবলী*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, পৃ ১১১-১২।

মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র: ১৮৩১-১৯৩০

আনিসুজ্জামান

মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র বললে *সমাচার সভারাজেন্দ্র*-র সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। বলা উচিত, পত্রিকাটি ছিল বাংলা-ফারসি দ্বিভাষিক পত্র। মুসলমান-সম্পাদিত ফারসি পত্রিকার আবির্ভাবও এই প্রথম ঘটল। এর আগে যেসব ফারসি পত্রিকা বাংলা দেশ থেকে প্রকাশ পায়—রামমোহন রায়ের *মীরাৎ-উল্-আখবার*[১] (এপ্রিল ১৮২২), মণিরাম ঠাকুরের *শাম্স-উল্-আখবার* (মে ১৮২৩) এবং শ্রীরামপুর মিশনের *আখবারে শ্রীরামপুর* (মার্চ ১৮২৬)—সেগুলো ততদিনে অন্তর্হিত হয়েছে।[২] মুসলমান সম্পাদক তাঁর স্বল্প সামর্থ্য নিয়ে শুধু বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না—ফারসি পত্রিকার অভাবও দূর করতে চাইলেন।

কিন্তু এই অভাববোধও তাৎপর্যহীন নয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ফারসি রাজভাষার মর্যাদায় আসীন। শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান তখনও এই ভাষাকে তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির বাহন মনে করতেন। *সমাচার সভারাজেন্দ্র* এবং আমাদের তালিকার দ্বিতীয় পত্রিকা *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*-সম্পাদকও সেই ধারণার বশবর্তী ছিলেন বলে মনে হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগতভাবে নির্দেশ করেছেন যে, *সভারাজেন্দ্র*-সম্পাদক প্রাচীনপন্থী ছিলেন।[৩] এই প্রাচীনপন্থার সঙ্গে উপরোক্ত মনোভাব সম্পূর্ণ মিলে যায়।

তবু মনে হয়, পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কেও তিনি অচেতন ছিলেন না। কোন্ রাজেন্দ্রসভার সমাচার দিতে চেয়েছিলেন তিনি? কলকাতা নগরীতে ইংরেজ বণিক যে-সভা সাজিয়েছে, তার—এ কথা মনে করা অসংগত নয় তাঁর পত্রিকার নাম থেকে। তবে সে সচেতনতা এমন পর্যায়ের নয়, যার জন্যে তিনি বাংলা-ফারসির বদলে বাংলা-ইংরেজি পত্র বার করতে পারতেন।

প্রাচীনপন্থী মনোভাব এবং নবীন সম্পর্কে সচেতনতা—এই উভয় ধারার ছায়া *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*-এও যেন প্রতিফলিত হয়েছে। *সভারাজেন্দ্র*-র পর যেসব ফারসি পত্রিকা বাংলা দেশ থেকে প্রচারিত হয়—প্রকাশের ঠিকানা থেকে মনে হয় মুসলমানেরাই এগুলো বের করতেন—১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেগুলোর তিরোভাব ঘটে।[৪] ফারসি তার বিশিষ্ট আসন হারিয়েছে ১৮৩৫-এ। এর পরে নতুন করে ফারসি পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করলেন *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*-কর্তৃপক্ষ। হয়তো মুসলমানের বিশিষ্টতা জ্ঞাপনের এটাই ছিল বিবেচিত উপায়।

কিন্তু *সভারাজেন্দ্র*-র পনেরো বছর পরে শুধু বাংলা-ফারসি দ্বিভাষিক পত্রই আর যথেষ্ট বিবেচিত হল না। হয়তো কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমানদের জন্যে উর্দু, অমুসলমানদের জন্যে হিন্দি আর নতুন রাজভাষার মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ইংরেজিরও স্থান হল এই পত্রিকায়। পাঁচটি সমান্তরাল স্তম্ভে পাঁচ ভাষায় সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকল—ইংরেজি রইল মধ্যমণিরূপে মাঝের কলামে (তার দুপাশে ফারসি আর হিন্দি, বাংলা আর উর্দু রইল দুপ্রান্তে)।[৫] বোঝা গেল, কালের পরিবর্তন হয়েছে।

পরিবর্তন যে হয়েছে, সেটা আরও বেশি করে বোঝা গেল পরবর্তীকালে। উর্দু-বাংলা *মহাম্মদী আখবার* (১৮৭৭) ছাড়া দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন না আর কোনো বাঙালি মুসলমান সম্পাদক। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে তাঁদের তরী শুধু বাংলার ঘাটেই ভিড়ল।

কালভেদে অবশ্য এই বাংলা ভাষার কিছু রূপভেদ লক্ষ করা গেল। *সভারাজেন্দ্র*-র ভাষা কেমন ছিল, তা আমাদের জানা নেই। নাম থেকে মনে হয় এর ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ, পণ্ডিতী রীতির। *জগদুদ্দীপক ভাস্কর*-এর ভাষা যে অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ ছিল, সে কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে।[৬] *মহাম্মদী আখবার*-এর বাংলা ছিল দোভাষী পুথির সগোত্র। সাধু বাংলা গদ্যরীতির পরিচয় পাই *মিহির* (১৮৯২) ও *হাফেজ* (১৮৯৭) প্রভৃতিতে—হয়তো *আজীজন-নেহার*-এই (১৮৭৪) এর সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এই ধারাই প্রবল হয়। কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে *ধূমকেতু*-তে (১৯২২); *শিখা* (১৯২৭) এ ধারা পুষ্ট করেছিল। তবে আরবি-ফারসি শব্দের বহুল ব্যবহার যে মুসলমান-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল না, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

আরবি-ফারসি-উর্দুর সমাদর যে এঁদের কাছে ছিল না, তা নয়। উর্দুকে কেউ কেউ মাতৃভাষার তুল্য করতে চেয়েছিলেন, জাতীয় ভাষার মর্যাদা অনেকে দিতে চান আরবিকে। ফারসি সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সাময়িকপত্রের আলোচ্য বিষয়ে একাধিপত্য করে। পত্রিকার নামকরণের জন্যে আরবি-ফারসি ভাষার আশ্রয় নেওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

সভারাজেন্দ্র বা *জগদুদ্দীপক* প্রকাশের কালে এ রেওয়াজ ছিল না। সম্পাদকদের ফারসি-প্রীতি সত্ত্বেও এসব পত্রিকার নামকরণে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক কোনো চিহ্ন নেই—এটাও লক্ষ করার মতো। কিন্তু ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে—যখন ওয়াহাবি বিচার শেষ হয়ে গেছে, যখন আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে মুসলমানের মিতালিবন্ধনের চেষ্টা করছেন মুসলমান সমাজ নেতারা, তখন থেকে মুসলমান-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার আরবি-ফারসি নামকরণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে—এক কথায়, স্বতন্ত্র চিহ্ন বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর স্ত্রীর নামে পত্রিকার নাম রেখেছিলেন *আজীজন-নেহার*। এর কথা বাদ দিলেও পর পর যেসব পত্রিকার নাম আমরা পাই, সেগুলো হচ্ছে: *মহাম্মদী আখবার* (১৮৭৭ ও ১৮৭৮), *আখবারে এসলামীয়া* (১৮৭৮ ও

১৮৯৫), *মুসলমান* (১৮৮৪), *মুসলমান-বন্ধু* (১৮৮৫) ও *ইসলাম* (১৮৮৫)। তার পরেও আমরা পেয়েছি *আহমদী* (১৮৮৬), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১ ও ১৮৯৯), *হাফেজ* (১৮৯২ ও ১৮৯৭), *কোহিনুর* (১৮৯৮), *ইসলাম* (১৮৯৯ ও ১৯০০), *নুর-অল-ইমান* (১৯০০)। বিংশ শতাব্দীতেও এর জের চলেছে *মোসলমান পত্রিকা* (১৯০১) থেকে শুরু করে *মকতব* (১৯৩০) পর্যন্ত, সেই ঐতিহ্য আজও বহন করছে *সওগাত* (১৯২৬) ও *মোহাম্মদী* (১৯২৭)। পত্রিকার অবয়বকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করার প্রয়োজন যে তাঁরা অনুভব করেছিলেন, তা বোঝা যায় আমাদের তালিকাভুক্ত পত্রিকাসমূহের অর্ধাংশের নাম থেকে। আর নামকরণেই সে প্রয়োজনের নিবৃত্তি হয়নি।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে *নবনূর* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কাজী ইমদাদুল হক লেখেন: 'হিন্দুর ন্যায় মুসলমান ত শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে যে ভারতবাসী মুষ্টিমেয় মুসলমানের যাহা নাই, মুসলমান জাতিটাতেও তাহা নাই বলিয়া ধরিতে হইবে।' অর্থাৎ লেখক যখনই মুসলমান হিসেবে নিজের কথা চিন্তা করেন, তখনই তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে একটি সুবিশাল মানচিত্র, যেখানে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক সীমানা মুছে যেয়ে ধর্মবোধের ভিত্তিতে সব এক হয়ে যায়। এ কথাটাই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের *আল-এসলাম* পত্রে আরেকজন লেখক সুস্পষ্ট করে বলেন: 'জাতীয়তার সে সীমারেখা এক দেশ হইতে অপর দেশকে বিচ্ছিন্ন করিযা রাখে, এছলামের সাম্যবাদ তাহা ধ্বংস করিয়াছে।' সাম্যবাদ কথাটা এখানে বড়ো নয়, তার বদলে সাম্রাজ্য হলেও ক্ষতি ছিল না। আসল কথা, ধর্মীয় পরিচয়ে যখন আমরা নিজেদের চিহ্নিত করি স্বদেশ তখন খুব ছোটো জায়গা হয়ে পড়ে আমাদের জন্যে।

এ জন্যে বাংলা দেশের কিংবা ভারতবর্ষের বাইরে যে মুসলিম জগৎ, তা সবসময়েই আমাদের লেখকদেরকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। অনেকসময়ে স্বদেশের তুলনায় বহির্ভারতীয় মুসলমান ও তাঁদের দেশ সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে বেশি। বাংলার মুসলমানের চেয়ে চীনের, রাশিয়ার বা তিব্বতের মুসলমানের আলোচনা কিছু কম হয়নি। ভারতের বিভিন্ন এলাকার ভ্রমণবৃত্তান্তের চেয়ে সিরিয়া, বসরা বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হয়তো জায়গা নিয়েছে বেশি।[৭] ইতিহাস-আলোচনায় এই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক।

অন্যান্য দেশের মধ্যে আরবভূমিই মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবার কথা। কিন্তু সাময়িকপত্রের পাতা উলটে গেলে মনে হয় আমাদের কাছে তুরস্কের স্থানই ছিল সর্বাগ্রে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় মুসলমানেরা খলিফা হিসেবে তুরস্ক-সুলতানের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা যখন তুরস্ককে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন, তখন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-৯৮) মতো মুসলমান নেতারা তুরস্ক সুলতানের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব থেকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে কিছুটা সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সফল হননি।[৮]

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাশিয়া যখন তুরস্ক আক্রমণ করে, তখন তুরস্কের বিপদকে বাঙালি নিজের বিপদ বলেই মনে করেছিল। যুদ্ধ শুরু হবার অল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত হয় *মহাম্মদী আখবার*—'এই সংবাদপত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উর্দু ও বাংলা-ভাষাভাষী সাধারণ মুসলমানগণের নিকট রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের বিস্তারিত খবর প্রচার।' পত্রিকাটি ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক: যুদ্ধ শেষ হবার অল্পকাল পরে তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।[১] অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে গেলে এব পাঠকেরা সংবাদপাঠের অত জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেননি। বাঙালি মুসলমান সমাজে তুরস্কের প্রতি কত গভীর অনুরাগ সঞ্চিত ছিল, তা বোঝা যায় এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এবং তার পরিণতি থেকে।

তুর্কিদের সংগ্রামশীলতাব পরিচয় দিয়ে পত্রিকা-সম্পাদক সেই অনুবাগী চিত্তের কাছেই আবেদন জানিয়েছিলেন: 'তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো, সওযাব সস্তায় বিকাইতেছে। কিনে লহ। বেহেস্ত অল্প পয়সায় পাওয়া যাইতেছে। কদাচ ছাড়িও না।'[২] বেহেশ্‌তের আশায় না হলেও খলিফার দেশকে সাহায্য করার অভিপ্রায়ে অর্থসাহায্য করেছিলেন মুসলমানেরা। ওই পত্রিকার বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ভূপালের বেগম পাঠিয়েছিলেন দু-লক্ষ টাকা, ঢাকাব নবাবেরা পাঠান বিশ হাজার টাকা, নওয়াব আবদুল লতিফের উদ্যোগে প্রেরিত হয় দশ হাজার টাকা এবং নওয়াব আমিব আলি খানেব চেষ্টায় দশ সহস্রাধিক টাকা। তা ছাড়া, নাখোদা মসজিদে চাঁদা সংগ্রহের সিন্দুক স্থাপন করে সকল মুসলমানকে মুক্তহস্তে দান করতে অনুরোধ জানানো হয়।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ বাঙালি মুসলমান লেখকদের মনে কতটা রেখাপাত করেছিল তার পরিচয় পরবর্তীকালেও পাওয়া যায়। প্লেভনা-বীর ওসমান পাশার মৃত্যু হলে (১৮৯৯) *কোহিনুর*-এ তাঁর বীবত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, *প্রচারক*-এ বেব হয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং *ইসলাম প্রচারক* পত্রস্থ করেন সম্পাদকীয় আলোচনা ও কবিতা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেও দেখছি রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের আলোচনা চলছে আমাদের পত্রিকায়।

উনিশ শতকেব শেষে তুরস্কের সুলতান দামেস্ক থেকে হেজাজ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সারা পৃথিবীর মুসলমানেব সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। এই রেলপথেব জন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'হেজাজ ফন্ড কমিটি' গঠিত হয়। এই চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে *ইসলাম প্রচাবক* বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রতি মাসেই তাঁরা আবেদন প্রকাশ কবতেন এবং আমাদের দেশে সংগৃহীত চাঁদাব হিসাব পত্রস্থ করতেন।

তুরস্কের সঙ্গে এভাবে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করেছিলেন বলেই সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদেব নামে বাঙালি মুসলমান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। স্বদেশে তাঁর বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভের মুখে সুলতানের সিংহাসনারোহণের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে *ইসলাম প্রচাবক* ও *লহরী* প্রচার করেন বিশেষ সংখ্যা, *প্রচারক* প্রকাশ করেন বিশেষ প্রবন্ধ ও কবিতা এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

এসলামাবাদী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন *তুরস্কের সুলতান আবদুল হমীদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী*। এই আবহাওয়াতেই শোনা গেল তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের গুণগান, প্রধানমন্ত্রী আলি পাশার জীবনকথা, তুরস্কের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার সম্পর্ক-আলোচনা। এমনকী, পঞ্চদশ শতাব্দীর তুরস্ক-সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের কনস্টান্টিনোপল অধিকার-কাহিনিও স্মরণ করা হল সাড়ে চার শতাব্দীর পরে।

বাঙালি মুসলমানের কাছে যিনি এত জনপ্রিয় খলিফা, সেই সুলতান আবদুল হামিদকে তুরস্কের পার্লামেন্ট সিংহাসনচ্যুত করেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এ সত্ত্বেও তুরস্কের প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এই অনুরাগ যে সাময়িক নয়, স্থায়ী বন্ধনের দ্যোতক, তা বোঝা গেল বল্‌কান যুদ্ধের সময়ে। ডক্টর আনসারির নেতৃত্বাধীন মেডিক্যাল মিশনের সদস্যরূপে সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজি তুরস্কে গেলেন তুর্কিদের সাহায্য করতে এবং ফিরে এসে তুর্কিদের প্রশংসায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করলেন।[১১]

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে তুরস্ক যোগ দিলে এ দেশের মুসলমানদের মনে ইংরেজবিরোধী মনোভাব কিছুটা প্রবল হয়। যুদ্ধশেষে তুরস্কের ভাগ্যনির্ণয়ে মিত্রপক্ষের কঠোরতার প্রতিবাদে দেখা দিল খিলাফত আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতি বাঙালি মুসলমানের আন্তরিক সমর্থনের পরিচয় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ সময়ে *আল-এসলাম*-এ লেখা হয়:

> ...মিত্রপক্ষ তুরস্কের বিশাল রাজ্য আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে খলিফার পদমর্য্যাদা আর থাকে না, প্রকাশ্যভাবে মোছলমানগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে, তাহার ধর্ম্মের পবিত্র বিধানে হস্তক্ষেপ করা হয়।...
>
> ...এজন্য আজ সমগ্র এছলাম জগৎ খলিফাতুল মোছলেমিন, আমিরুল মোমেনিনের পদগৌবব. তাঁহার রাজ্য রাজত্ব রক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, সমগ্র এছলাম জগতে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।...

এই আন্দোলনে যে শিয়া-সুন্নির কোনো ভেদ নাই, সে কথাও লেখক আমাদের জানিয়েছেন। আরও দেখা গেল, খলিফার অমর্যাদাব বেদনায় অংশগ্রহণ করতে হিন্দু লেখকও এগিয়ে এসেছেন।

ইসলাম-দর্শন-এ এ সময়ে প্রকাশিত হয় ফুরফুরার পির আবুবকর সাহেবের ভাষণ। সাধারণভাবে পির সাহেব ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু খিলাফতের বিপর্যয়ে রুষ্টচিত্তে তিনি ইংরেজকে আহ্বান জানিয়ে বললেন:

...যে সমস্ত স্থান পূর্ব্বে তুর্কী গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ত্বাধীনে ছিল এবং এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্থান আপনাদিগের অঙ্গীকার মত তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিউন। নচেৎ ভারতবর্ষে বিরাট অশান্তি ও বিপদের আশঙ্কা আছে।

তবে তুরস্কের সুলতান যে খলিফার মর্যাদালাভের অধিকারী নন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা যে সার্বভৌম নয়, সে কথাও অনেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। *আল-এসলাম* তাই কামাল পাশাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে কামাল পাশার ভূমিকাকে সর্বাধিক গৌরব দান করেন *ধূমকেতু*—কামালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম নজরুলের আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেছিল।

কামাল পাশার বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমে সুলতানের পদ এবং তার পর তাঁর খলিফার পদ রহিত করা হয়। যে-খিলাফত রক্ষার জন্য এত আন্দোলন, এত আবেদন, তাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তুরস্ককে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজালেন কামাল। তাঁর এসব আভ্যন্তরীণ সংস্কার অনেকের পছন্দ হয়নি—*মোহাম্মদী* ছিলেন তাঁদের মুখপত্রস্থানীয়। আফগান-আমির আমানুল্লাহ আর তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান কামাল আতাতুর্ক উভয়কেই *মোহাম্মদী* চিহ্নিত করেছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবোধের সর্বনাশ-সাধনকারীরূপে।[১২] তবে নব্য তুরস্কে. প্রশংসাও করেছিলেন অনেকে—এঁদের মধ্যে তরিকুল আলম, ফজলুল হক সেলবর্সি ও মুহম্মদ হবিবুল্লাহ (বাহার) উল্লেখযোগ্য। আব কামাল পাশা বাঙালি মুসলমানের চিত্তে যে একটা গৌরবের আসন অধিকার করেছিলেন, তার জন্যে নজরুলের কৃতিত্ব সর্বাধিক। কামালকে নায়ক করে ইব্রাহিম খাঁ একাধিক রচনা প্রকাশ করেন—তার একটি ছিল ধারাবাহিকভাবে (পরে গ্রন্থাকারে) প্রকাশিত নাটক।

খিলাফত আন্দোলনের সমসাময়িক কালে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি আন্দোলন দেখা দেয়, যা হিজরত আন্দোলন বলে পরিচিত। ইংরেজের শাসনাধীন হয়ে ভারতবর্ষে আর মুসলমানদের থাকা উচিত নয়—কোনো মুসলিম শাসনাধীন দেশে তাদের চলে যাওয়া উচিত, এই ছিল এ আন্দোলনের মূল কথা। বলা বাহুল্য, তুরস্কের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার এ আন্দোলনের মূল বক্তব্যের সমর্থন দান করে। ফলে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে হিজরত শুরু হয়ে গেল। *আল-এসলাম* এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। এ সময়ে আফগানিস্তান সম্পর্কেও কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশলাভ করে।

হিজরত আন্দোলন যদিও বাঙালি মুসলমানের ব্যাপক সমর্থন লাভ করেনি, তবু এর ফলে আফগানিস্তান এক নতুন আশা নিয়ে ভারতীয় মুসলমানের কাছে দেখা দেয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে সেখানেই নির্বাসিত মুক্তি সরকার গঠিত হয়েছিল আর মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি সে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। হয়তো এই ধরনের প্রচেষ্টার

কথা মনে রেখেই ১৯২৭ সালে মোহাম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরি সম্পূর্ণ একটি নতুন সুর ধ্বনিত করে বলেন:

> নব বলে বলীয়ান তরুণ তুর্কী বা আফগান যদি ঘটনাক্রমে এই দেশ অধিকার করে, তবে তাহা তুর্কী বা আফগানেরই রাজত্ব হইবে, ভারতীয় মুসলমানের রাজত্ব হইবে না।

এরই জের টেনে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে *জয়তী* লেখেন:

> ...প্যান-ইসলাজিমের স্বপ্ন মুসলমানরা বহুদিন দেখিয়াছে, আজও অনেকে দেখিতেছে। এ স্বপ্নমোহ কবে টুটিবে, কে জানে?

মনে হয়, খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পরেই যেন বাঙালি মুসলমানের এ মোহ ভাঙতে আরম্ভ করেছে। স্বদেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও পরিবেশের প্রতি কর্তব্যবোধ তার জেগেছে। এ ভাবধারার পশ্চাতে নজরুল ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। *শিখা*-গোষ্ঠীর বুদ্ধিচর্চা ও *সওগাত*-এর উদারনৈতিকতাও এ ভাবনাকে গতি দিয়েছিল।

যে-মনোভাব থেকে মুসলমান লেখকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তুরস্কপ্রীতি, সেই মনোভাব কার্যকর হয়েছিল ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চায়। যে-ইতিহাসক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান নিজের ঐতিহ্য সন্ধান করেছিলেন, সে ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস অর্থাৎ মুসলিম শাসনাধীন দেশসমূহের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিজেরা জড়িত থেকেও তাঁরা পুরাকালের মুসলমানের দেশবিজয়ের স্মৃতিচর্চা করেছেন অসাধারণ আবেগময়তার সঙ্গে। *মিহির* পত্রিকায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত (মোহাম্মদ রেয়াজ অল দিন আহমদ মশহাদির) 'সুরিয়া বিজয়' এ ধরনের রচনার আদি নমুনা। সেই সময় থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস-আলোচনা লক্ষ করলে বোঝা যায়, কী গভীর উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে একাধিক লেখক বার বার একই প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন।

শুধু বিষয়গুলোর উল্লেখ করলেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ১৯১১ সালের দিকে সেখ রেয়াজউদ্দিন আহমদ প্রকাশ করেন *আরব জাতির ইতিহাস*—সৈয়দ আমির আলির *A History of the Saracens* (১৮৮৯; পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯) গ্রন্থের অনুবাদ। এ ইতিহাসের শুরু হজরত মুহম্মদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় থেকে। বলা বাহুল্য, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চায় আরও পূর্ববর্তী কাল সম্পর্কে তেমন উৎসাহের পরিচয় নেই। 'আঁধার যুগের আরব' বা 'ইয়মন ও হিজাজের পূর্ব ইতিহাস' বিষয়ে এক-আধটা রচনা চোখে পড়ে। সেগুলো লিখিত হয়েছিল হজরত মুহম্মদ বা আরব মুসলমান সম্পর্কিত অসংখ্য রচনার অনেকটা ভূমিকারূপে।

সাময়িকপত্রে হজরত মুহম্মদের জীবন সম্পর্কিত আলোচনা গত শতকেই শুরু হয়েছিল: *আখবারে এসলামীয়া*-য় প্রকাশিত (১৯০০) মওলানা মনিরুজ্জামান এসলামাবাদীর রচনা তা নির্দেশ করে। পরে হজরত মুহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে হিন্দু লেখকেরাও যোগ দিয়েছিলেন। হজরত মুহম্মদের জীবনীই শুধু সাময়িকপত্রে আলোচিত হয়নি, তাঁর জীবদ্দশার বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যেমন, ওহোদের যুদ্ধ—নিয়েও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং রাজনীতি ও রণকৌশলে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে তাঁর অবদান আলোচিত হয়েছে। তাঁর বহুবিবাহ সমর্থনের পাশাপাশি তাঁর সহধর্মিণীদের জীবনী—বিশেষত বিবি খাদিজার পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খলিফাদের নিয়েও আলোচনা হয়েছে যথেষ্ট। হজরত আবুবকর, হজরত উমর ও হজরত আলি সম্পর্কে পৃথক নিবন্ধ পাই—হজরত উসমান সম্পর্কে তেমন পাই না। এ ছাড়া খলিফাদের ইতিহাস, তাঁদের শাসননীতি, তাঁদের শাসনাধীন মুসলিম রাষ্ট্রমণ্ডলের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধ, সিরিয়াবিজয়, মিশরবিজয়—খলিফাদের শাসনামলের এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোচনাও সাময়িকপত্রে পাওয়া যাবে।

ইয়াজিদের শাসনকালের কোনো কোনো ঘটনা ইতিহাসচর্চার বিষয় সরবরাহ করলেও উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছেন মুখ্যত উমর ইবনে আবদুল আজিজ। ফ্রান্স ও স্পেনে মুসলিম অধিকার, সিসিলি, ফিলিপাইন্‌স ও আফ্রিকায় ইসলামের উপস্থিতি এবং স্পেনে মুসলিম সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে সগৌরবে। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আল হারুন অবজ্ঞেয় হননি, তবে সর্বাধিক শ্রদ্ধালাভ করেছেন আল মামুন—খুব সম্ভব, শিবলি নোমানির দৌত্যে।[১৩]

ইতিহাসে আরও পরবর্তীদের মধ্যে পাই সুলতান মাহমুদ, সুলায়মান ও সালাহউদ্দিনের পরিচয়। সেলজুক শাসনের বিবরণ, ক্রুসেডের ইতিহাস, বাগদাদের পতন ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কাহিনি বর্ণিত বিষয় থেকে বাদ যায়নি। এর পাশাপাশি পাই আরবদের বিজ্ঞানচর্চার পরিচয়, তাদের বাণিজ্যের বিবরণ এবং সভ্যতায় তাদের অবদানের কথা। বাগদাদ ও জেরুজালেমের ইতিহাস এবং ইরাকের তীর্থস্থানের স্মৃতি আমাদের লেখকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। জামে আজহার ও আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার নিয়েও বিশেষ আলোচনা পত্রস্থ হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চা ইসলাম জগৎ-কেন্দ্রিক ছিল। এর বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত নিরুৎসাহী। 'ব্রহ্মরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'জাভার বিবরণ', 'মার্টিন লুথার' কিংবা 'ফ্রেডারিক লিস্ট ও তৎকালীন জার্মানী' প্রভৃতি রচনার কথা মনে রেখেও এ কথা বলা যায়। বাঙালি মুসলমানের বর্ণিত ইতিহাস একদিকে ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও উপাখ্যানধর্মী; অন্যদিকে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় মুসলমানের অবদান তাঁরা সন্ধান করেছিলেন, তবে সে অনুসন্ধান সর্বত্র বিশ্বপটভূমিকায় স্থাপিত হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে

সঙ্গে মুসলমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার উৎকৃষ্টতায় তাঁদের আস্থা ছিল দ্বিধাহীন। তাই খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিকতা এবং উমাইয়া ও আব্বাসিদের ব্যক্তিগত শাসন—দুয়েরই অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁরা করতে পেরেছিলেন একইসঙ্গে।[১৪]

ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায়ও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য লক্ষ করবার মতো। আরব-ইতিহাসের সূচনা তাঁরা যেমন ধরেছেন হজরত মুহম্মদের আবির্ভাবকাল থেকে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও তাঁদের পক্ষে সূচিত হয়েছে মুসলমান-অধিকারের সময় থেকে। 'আর্য্যজাতির ভারতে আগমন'-এর মতো দু-একটা রচনা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আভাস দেয় বটে, তবে 'ভারতের ইতিহাসে মুসলমানের দান', 'ভারতে মোসলেম আগমনে হিন্দুর অবস্থা', 'মুসলমান আমলে হিন্দুব অধিকার' প্রভৃতি প্রবন্ধ ইতিহাসের নির্বাচিত যুগ সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ করে দেয়। 'মুসলমানাধিকৃত ভারতের ইতিহাস' নামে *নবনূর*-এ এক দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন কেশবচন্দ্র গুপ্ত। মুসলমান লেখকেরা খণ্ড খণ্ড ভাবে সেই ইতিহাসেরই পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। অনিবার্যভাবে এ ইতিহাসচর্চার শুরু মুহম্মদ বিন কাসেম থেকে। আফগান শাসনামলে ভারতবাসীর অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ছাড়া পাই শাসকদের মধ্যে মুহম্মদ বিন তুঘলকের কথা; কীর্তির মধ্যে কুতুব মিনারের পরিচয়। সবটা জোরই পড়েছে মুঘল ইতিহাসের উপর। বাবর, আকবর ও জাহাঙ্গির সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে, আওরঙ্গজেব সম্পর্কেই হয়েছে খুব বেশি। তাঁর নানামুখী পরিচয় ছাড়াও পাই তাঁর আদর্শের বিশ্লেষণ, তাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা, তাঁর আমলের বিশেষ বিশেষ ঘটনার—যেমন গোলকুন্ডা অধিকার বা সত্নারামি বিদ্রোহ কিংবা আফজল খাঁর হত্যা—বিবরণ, তাঁর পুত্র-কন্যাদের কথা। দারাশেকো, মুরাদ বা শাহ্‌জাদা মুহম্মদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সম্পর্কিত; জেবউন্নেসা ও জাহানারা সম্পর্কে আলোচনাও তা-ই। মুঘল বিদুষীদের নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেকগুলো রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমানেরাও লিখেছিলেন। জেবউন্নেসা ও জাহানারা ছাড়া এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গুলবদন বেগম ও নূরজাহান। তাজমহল সম্পর্কে একাধিক রচনা ছাড়াও 'মোগল যুগের স্ত্রীশিক্ষা', 'মোঘল-যুগে চিত্র-চর্চ্চা' ও 'মোগল যুগের আগ্নেয়াস্ত্র' বিষয়ক প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাসের ক্ষেত্রে টিপু সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা চোখে পড়ে।

আওরঙ্গজেব সম্পর্কে রচনার আধিক্যের কথা বলেছি।[১৫] বস্তুত ইসলামের ইতিহাসচর্চায় বাঙালি মুসলমান যেমন বার বার হজরত মুহম্মদের জীবনীতে ফিরে গেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় তাঁদের লেখনী তেমনই আওরঙ্গজেবকে কেন্দ্র করেছে। মনে হয়, আওরঙ্গজেব এ গুরুত্ব লাভ করেছেন বর্তমান শতকে—তার আগে নয়; এবং প্রচলিত ইতিহাস ও সাহিত্যে বর্ণিত আওরঙ্গজেব-চরিত্রের কলঙ্কভঞ্জনের প্রয়াসই এই অনুরাগের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। উনিশ শতকে *হাফেজ* পত্রিকায় (১৮৯৭) যেমন আকবর সম্পর্কে সগৌরব আলোচনা দেখি, বিশ শতকে

তেমনই *ইসলাম-দর্শন*-এ (১৯২০) দেখি আকবরি ও আলমগিরি আদর্শের বিরুদ্ধতার উপর জোর দিতে। *জয়তী*-সম্পাদক যখন (১৯৩০) আকবর-প্রদর্শিত সমন্বয়পন্থা অনুসরণের সুফলের কথা ইঙ্গিত করেছেন, ততদিনে মনে হয়, *ইসলাম-দর্শন*-কথিত আলমগিরি আদর্শেরই আকর্ষণ বেড়েছে মুসলমান সমাজে। তবু *জয়তী*-র এই মন্তব্য ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও ইঙ্গিত দেয়।

বাঙালি মুসলমানের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-রূপই চিত্রিত হোক না কেন, বাংলার ইতিহাস তেমন ফুটে ওঠেনি। যে সামান্য আলোচনা হয়েছে, সেখানেও মুসলমান-আগমনের পূর্ববর্তী বাংলা দেশের ইতিহাসে তাঁদের অনাসক্তি বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসচর্চার সাধারণ ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে *সওগাত*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৯১৯) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের 'ইসলামাবাদ' একটি ব্যতিক্রম; আঞ্চলিক ইতিহাসও এটা ছাড়া আর পাই না। যা পাই তা হচ্ছে. বাংলার মুসলমান ও তাঁদের কীর্তি সম্বন্ধে দু-চারটে সাধারণ আলোচনা; পাঠান আমলের বাংলা দেশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং বাংলায় মুঘলবিজয় কীর্তিত করে লেখা দু-একটি রচনা। অমুসলমান লেখক বাংলার নৌসাধনার পরিচয় দিয়েছেন; সন্দীপের রাজা দিলওয়ারের পরিচয় দিয়েছেন যদুনাথ সরকার। ইসা খাঁ, শমশের গাজি, খান জাহান আলি খান এবং সিরাজউদ্‌দৌলা সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনাও লক্ষ করা যায়। তবে এসব ক্ষেত্রে অনেকসময়ে যে-আবেগপ্রবণতা ও জাতীয় গৌরবেচ্ছা তথ্যানুসন্ধানের পরিপন্থী হয়েছে, তা বোঝা যায় *নবনূর*-এর একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। রাজা রাজবল্লভের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সিরাজউদ্‌দৌলা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। এ জন্যে তাঁকে 'স্তাবক' আখ্যা দিয়ে *নবনূর* সম্পাদক কামনা করেছেন, 'রাজবল্লভের ন্যায় পাপীর জীবনকাহিনী অন্ধকারে ডুবিয়া যাউক...।'

আসলে ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে আমাদের লেখকেরা মুসলমানের গৌরবগাথা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই গৌরবগানের প্রবৃত্তির সঙ্গে বহির্মুখী মানসিকতার সংযোগ ছিল তীব্র। আরব-ইরান মিশর-তুরস্কের পুরাকাহিনি তাই তাঁদের কল্পনাকে যতটা উদ্দীপিত করেছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাস অতটা পারেনি; আবার বর্হিবাংলার ইতিহাস-আলোচনায় যতটুকু আগ্রহ সঞ্চয় হয়েছিল, বাংলা দেশের ক্ষেত্রে তার অনেকটাই গিয়েছিল হারিয়ে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা নিজেদের চেতনা থেকেই তাঁরা আহরণ করেছিলেন; প্রমাণগুলো শুধু তুলে ধরা হয়েছিল সাময়িকপত্রের পাতায়।

মুসলমান লেখকদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, বাংলা দেশের নানা দোষ ধরা পড়েছিল। গত শতাব্দীর শেষে *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০০) ইসমাইল হোসেন সিরাজি তার কয়েকটা তালিকাভুক্ত করেছিলেন:

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় বিধর্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা,

> পুরুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানোচিত নহে; তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিৎ বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা এবং লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। পরিচ্ছদ আদিও মুসলমান সভ্যতানুযায়ী নহে।

এর আগে *ভ্রমনিবারিণী* (১৮৮৯) লক্ষ করেছিলেন যে, এ দেশে ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে; *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯১) বাঙালি মুসলমানের ধর্মভাবের অভাব দেখে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ধর্মবিরোধী কার্যকলাপে *মিহির* (১৮৯২) বিলাপ করেছেন; বাঙালি মুসলমানের আলস্যকে তিরস্কার করেছেন *হাফেজ* (১৮৯৭)। *আল-এসলাম* (১৯১৫) বাঙালি মুসলমান সমাজকে অভিহিত করেছেন 'নানা পাপ-তাপ-জর্জ্জরিত' বলে; *মোসলেম ভারত*-এ (১৯২০) মুসলমানের 'বর্ত্তমান সঙ্কট'-এর কথা বলেছেন; *ইসলাম দর্শন*-এর (১৯২০) লেখকেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, ধর্ম ও পুণ্যের নামে মুসলমান সমাজে শেরেক ও বেদাত প্রবেশ করেছে।[১৬] সমাজব্যাধির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না; তবে মতভেদ দেখা দিয়েছিল রোগলক্ষণে ও তার প্রতিকার নির্ণয়ে।

সাধারণভাবে একটা উপায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল: তা হচ্ছে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা এবং ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তন। অনেকটা এই উদ্দেশ্যেই ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস-আলোচনার পাশাপাশি *হাফেজ*, *কোহিনুর* প্রভৃতি প্রথম যুগের সাময়িকপত্রিকায় সুফিদের জীবনালেখ্য-রচনার প্রয়াস দেখা যায়। এ ধারা পরবর্তীকালেও নিঃশেষিত হয়নি, তবে *আল-এসলাম* প্রভৃতি পত্রিকায় আবার সুফিবাদ ও পিরবাদের প্রবল বিরোধিতাও লক্ষ করা যায়। *আল-এসলাম*-এ সিরাজি লেখেন (শ্রাবণ ১৩২৬):

> সুফী ও দরবেশগণ প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ এছ্‌লামের যে বিকৃত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা দিয়া শত শত হাজার হাজার কেতাব লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত কেতাব পড়া বিদ্যায় ভূষিত তথাকথিত পীর ও আলেমগণ এছ্‌লামের মস্তক একেবারেই চর্ব্বণ করিয়া মোছ্‌লমান জাতিকে অধঃপতন (ও) ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন।

সম্পাদকীয় টীকায় এই বক্তব্যের মোটামুটি সমর্থনও দেখতে পাই।

এর আগে মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী পিরবাদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সংস্কারকামী চিত্ত কবর-দরগাহে মানসিক করা কিংবা শাস্তি দেওয়ার নিন্দা না করে পারেনি। এমনকী, ফুরফুরার পির আবুবকর-পৃষ্ঠপোষিত *ইসলাম-দর্শন*-এও 'পীর-পূজা, গোর-পূজা ও বৃক্ষপূজা'র নিন্দা দেখা যায়।

সুতরাং সুফিবাদ ও পিরবাদ বিরোধীরা ধর্মজীবনে প্রত্যাবর্তন বলতে বুঝিযেছিলেন শরিয়তের একনিষ্ঠ অনুসরণ। কিন্তু শরিয়তের ব্যাখ্যা নিয়েও একই ধরনের মতান্তরের

অবকাশ ছিল। যেমন, *ইসলাম-দর্শন*-এ মওলানা রুহুল আমিন কুরআন শরিফের ব্যাখ্যা দিয়ে সংগীতচর্চাকে স্পষ্টত হারাম বলে অভিহিত করেন। একই সময়ে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*-য় মোহাম্মদ কে. চাঁদ বলেন যে, শাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক 'পরস্পর প্রতিবাদকারী উক্তি' দেখা যায়। যেসব আয়াতের ভিত্তিতে মওলানা রুহুল আমিন এবং তাঁর সমর্থকেরা সংগীতকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেছিলেন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সেগুলোর আলোচনা করে *মোহাম্মদী*-তে (১৯২৮) বলেন যে, সংগীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই এবং অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়ে তিনি সংগীতচর্চাকে জায়েজ বলে আখ্যা দেন। সুদ-সমস্যা সম্পর্কেও এরকম দীর্ঘ বিতর্ক দেখা দিয়েছিল: যদিও অধিকাংশ লেখকই ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা সুদ ব্যাবসা সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিশেষ বিশেষ সমস্যার ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর তো ছিলই, উপরন্তু মজহাবি দ্বন্দ্বও ইসলাম ব্যাখ্যার বিষয়টা জটিল করে তুলেছিল। 'আহলে হাদিস' সম্পর্কে *ইসলাম-দর্শন* মন্তব্য করেছিলেন: 'ইহার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও উৎকট হানিফী-বিদ্বেষ মারাত্মক।' অন্যের সংকীর্ণতার নিন্দা করেও *ইসলাম-দর্শন* কেশগুম্ফশ্মশ্রু সম্পর্কে বিধান দিতে পেরেছিলেন। আবার, মোল্লাদের সম্পর্কে *সওগাত*-এর অভিযোগ ছিল আরও মারাত্মক: 'মোল্লারা শ্রেণীগতভাবে কখনও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম্মীয় মতভেদ সম্বন্ধে উদার মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস পান না...তাঁহারা তুচ্ছ মতভেদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্বপ্রদানপূর্ব্বক, মুসলমান সমাজকে শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।'

এই পরিবেশে *শিখা*-র (১৯২৭) লেখকেরা আরও একটা বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তাঁদের মতে, 'শরিয়ত যদিও সাধারণভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়।' শুধু তা-ই নয়, 'যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব-সমাজে উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে।' যেমন, আরেকজন বললেন, 'ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।' এই সাহসিক চিন্তার অভিব্যক্তি অচলায়তন সমাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল—প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাই মুসলমান সমাজের পরিধির মধ্যেই দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার অস্তিত্ব আমরা লক্ষ করি। *মাসিক মোহাম্মদী*-র প্রথম সম্পাদকীয়তে এই দুই ধারাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল সংকীর্ণচিত্ত প্রাচীনপন্থী ও মোহমুগ্ধ আধুনিক হিসেবে। *মোহাম্মদী* তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, তবে দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গেই তাঁদের বিরোধ স্পষ্টতর হয়েছিল।

ব্যাপক মতৈক্য দেখা দিয়েছিল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নে। শিক্ষাবিস্তার ছাড়া মুসলমান সমাজের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এ কথাটা নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী উভয় পক্ষই নানাভাবে বলেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মতানৈক্য ছিল না। তবে

পরদা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজি গত শতকের শেষে *ইসলাম-প্রচারক* পত্রে পরদা প্রথার সমর্থন করেছিলেন। *নবনূর*-এ নওশের আলি খান ইউসফজি প্রকারান্তরে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তবে *নবনূর*-এর লেখিকা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অন্যায় পরদার বিরুদ্ধে এবং আবশ্যকীয় পরদার পক্ষে যে-মতপ্রকাশ করেছিলেন, সেটাই সমর্থিত হয়েছিল বেশি।

বাল্যবিবাহ, বরপণ-প্রথা ও কৌলীন্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল সাময়িকপত্রের পাতায়। *নবনূর* ও *আল-এসলাম* থেকে *সওগাত* পর্যন্ত এর একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যাবে। বহুবিবাহ সম্পর্কে মানসিক বাধা সত্ত্বেও অনেক লেখক এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেননি। ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন যে, একবিবাহই এসব অনুশাসনের মূল লক্ষ্য—শুধু ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ সিদ্ধ।

সমাজসংস্কারের এসব ভাবনার মূলে দুটি শক্তিই ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মসংস্কারের যে পিউরিট্যানিক আন্দোলন এ দেশে দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাব আর ওই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামের সংগতিস্থাপনের যে-চেষ্টা দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব। সমাজব্যাধি আর তার প্রতিকার নির্ণয়ের আলোচনায় তাই কোথাও কোথাও তরিকা-ই-মুহম্মদিয়ার প্রতিধ্বনি, কোথাও কোথাও সৈয়দ আহমদ-আমির আলির ভাবনার প্রকাশ। ধর্মনিরপেক্ষ মানববাদী চিন্তার প্রকাশও দেখা গেছে—*সওগাত*, *শিখা*, *সাম্যবাদী*, *জয়তী*-তে। তবে এই ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়েও ইসলামের সঙ্গে একটি সংগতি সন্ধানের চেষ্টা দেখা যায়: কেননা শুধু ওভাবেই বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে তাঁদের কথা পৌঁছে দেওয়া যেত। অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন হলেও এই জনসমাজের কাছে ধর্মের নামটুকুও প্রেরণাস্বরূপ ছিল। এই সত্য সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় নজরুল ইসলামের *ধূমকেতু*-তেও দেখা যায়। শুধু *গণবাণী*-ই চেষ্টা করেছিলেন ধর্মবন্ধনের বাইরে শ্রেণিসত্তার ভিত্তিতে চেতনা বিকাশ করার। তবে যে ব্যাপক সংস্কার *ধূমকেতু* বা *গণবাণী*-র লক্ষ্য ছিল, তাকে সমাজসংস্কার বলা চলে না।

শ্রেণিচেতনা বিকাশের প্রায় এই নিঃসঙ্গ প্রয়াস দেখা দিয়েছিল অনেক পরে। তার আগে পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক চিন্তারই একাধিপত্য। যে-চেতনা ইতিহাসচর্চার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, সমাজসংস্কার-চেষ্টার মূলে প্রেরণাস্বরূপ ছিল, তুরস্কের প্রতি অসামান্য প্রীতিব উদ্‌বোধন করেছিল, সে চেতনা স্বভাবতই এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের বিরূপ সমালোচনা ও আংশিক ব্রাহ্মধর্মপ্রীতি এই চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ কখনো কখনো উগ্ররূপেও দেখা দিয়েছিল। *গো জীবন* পুস্তিকায় গোহত্যানিবারণের চেষ্টা করেছিলেন বলে মশাররফ হোসেনকে *আখবারে এসলামিয়া* ধর্মচ্যুত করেছিলেন। গো কোরবানি থেকে স্বেচ্ছায় যে বিরত থাকবে, তাকে 'মহাপাপী ও ধর্মচ্যুত' বিবেচিত করার বিধান *মোসলেম*

হিতৈষী-তে প্রকাশ পেয়েছিল। অন্য কারণে নজরুল ইসলামকে 'ধর্মদ্রোহী' ঘোষণা করা হয়েছিল *ইসলাম-দর্শন*-এ।

ধর্ম ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান সমাজের এই স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা আমরা উনিশ শতক থেকেই লক্ষ করি। তবু এই চেতনা সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের সন্ধান করেনি বলে মনে হয়। গত শতকের *আহমদী* (১৮৮৬), *হিন্দু মোসলমান সম্মিলনী* (১৮৮৭), *হিতকরী* (১৮৯০), *কোহিনুর* (১৮৯৮) এবং এই শতকের *নবনূর* (১৯০৩), *মোসলেম ভারত* (১৯২০), *ধূমকেতু* (১৯২২), *সহচর* (১৯২২), *গণবাণী* (১৯২৬), *শিখা* (১৯২৭) ও *জয়তী* (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করেছিলেন। *আল-এসলাম*-এর (১৯১৫) মতো ধর্মসচেতন পত্রিকায় সেখ হবিবর রহমান হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকে 'সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য' বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ঘটনাকে 'পাপকার্য্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২৮ সালে *মোহাম্মদী*-তে এস. ওয়াজেদ আলি হিন্দু-মুসলমানের এক স্বার্থের উপর জোর দিয়ে মিলনের আদর্শ প্রচার করেছেন। *জয়তী* প্রচার করেছিলেন যে, 'নানক-কবীর-আকবর-দাদু-রামমোহন' প্রমুখ সাধক-নির্দিষ্ট ভারতীয় জাতিত্বের ভাবধারাই দেশের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

এই ভাবধারা রাজনৈতিক কর্মপন্থার আলোচনায়ও প্রভাব বিস্তার করেছিল যথেষ্ট। *হাফেজ* (১৮৯৭) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সেখ ওসমান আলি মুসলমানদেরকে কংগ্রেস-সংগঠনে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯২৬-এও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছিলেন *সওগাত*। *নবনূর*-এ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনের চেয়ে বিরোধিতা করা হয়েছিল বেশি। খিলাফত আন্দোলনের কালে এই আন্দোলনের সমর্থক অমুসলমানদের সঙ্গে মিলন ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছিল। *আল-এসলাম* ও *ইসলাম-দর্শন* (১৯২০) পত্রিকাও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। ১৯২৩ সালে *সহচর* পত্রিকা স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদকে *শিখা* পত্রিকায় আকবরউদ্দিন 'ভয়ের দাবী' বলে এবং *জয়তী*-তে আবুল হুসেন 'দুর্ব্বলের নীতি' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*-য় (১৯১৮) গান্ধিজির চরকা-আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে *মোসলেম ভারত* (১৯২০) 'ভারতবর্ষের নেতা' এবং *শিখা* (১৯২৭) 'প্রকৃত দেশসেবক' বলে অভিহিত করেছিলেন। লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুতে *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯২৭) সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে *সাম্যবাদী*-র লেখক তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতমায়ের যোগ্যতম সন্তান' বলে।

এই মিলনপন্থা কাম্য হলেও তা যে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করছিল না, সে কথাটাও

আমাদের লেখকদের অগোচর ছিল না। কেউ কেউ এ জন্যে দায়ি করেছিলেন মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবকে। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দেই এ ধরনের দুটি রচনা চোখে পড়ে। *সওগাত*-এ মোহাম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরি বলেছিলেন: 'ভারতীয় মুসলমানগণ যে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রকাশে একান্ত সাম্প্রদায়িক, ইহা অতি বড় সত্য কথা।'[১৭] আর *শিখা*-য় আনোয়ারুল কাদির লিখেছিলেন: 'আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর একটা গলদ।' একই পত্রিকায় আবুল হুসেন অভিযোগ করেন যে, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।'

তবে এ ধরনের মনোভাব সাধারণভাবে আমাদের সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়নি। মিলনের আদর্শ প্রচারের পাশাপাশি বরঞ্চ দেখা দিয়েছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ। মিলনপন্থী সেখ ওসমান আলিই *কোহিনুর*-এ লিখেছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে একটা প্রধান অন্তরায় হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তার পুনরুত্থান। সমাজের একটা বৃহত্তর অংশে এই সন্দেহ প্রবল হবার সুযোগ পায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। *ইসলাম প্রচারক* প্রচার করেন যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানের কিছু সুবিধে হয়েছে এবং হিন্দুর স্বার্থে কিছু আঘাত লেগেছে বলেই হিন্দু সমাজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছেন। মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষের উল্লেখও করা হয়েছিল সেই সঙ্গে। *নবনূর*-এ একজন লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মুসলমানকে কাছে টানবার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনশেষে হয়তো আবার তাদেরকে দূরে ঠেলবেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনসাধনে কংগ্রেসের ব্যর্থতায় *আল-এসলাম* দুঃখপ্রকাশ করেন ১৯১৫ সালেই। শুদ্ধি-আন্দোলন ও হিন্দু মহাসভার কর্মপন্থা উল্লেখ করে *সওগাত*-এর লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, মুসলমান-বর্জিত হিন্দুস্থানই হিন্দু সমাজের লক্ষ্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরলোকগমন এবং সুভাষচন্দ্র বসুর কারাবরণের পরে স্বরাজ্য দলও যে মুসলমানের স্বার্থ বিস্মৃত হয়েছে, এ অভিযোগ করেছিলেন *সওগাত*-সম্পাদক। 'বন্দেমাতরম্' সংগীত সম্পর্কেও *সওগাত* আপত্তি জানিয়েছিলেন। অপর সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতাই যে মুসলমানকে স্বাতন্ত্র্যের পথে পরিচালিত করছে, সে সম্পর্কে *নওরোজ*-এর (১৯২৭) উক্তি সমকালীন মুসলিম লেখকদের ভাবধারাকে প্রকাশ করেছিল:

> প্রবল অংশ যদি দুর্ব্বল অংশকে পর বলে মনে করে এবং এদেশ 'হিন্দু'রই দেশ আর কারো নয় এই কথা সাহিত্য ও বক্তৃতায় প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, এক কথায় দুর্ব্বল অংশকে বাড়ী ছাড়া করে দেয়, তবে দুর্ব্বল অংশ ত একটা কোথাও তাদের বাড়ী ঠিক করতে চাইবে। ...এবং অনেক সময়ে লাচার ও হতাশ হয়েই যারা তাদের পর বলতে চায় তাদের পর ভাবতে বাধ্য হয়।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার যে-অভিযোগ *নওবোজ* এখানে করেছেন, তা নতুন ছিল না। বস্তুত রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে মুসলমান লেখকদেব চিত্তে ক্ষোভ জমেছিল। যেসব পত্রিকা হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রচার করেছেন, সেসব পত্রিকায়ও অমুসলমানেব বচনায় মুসলমানের পক্ষে অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, বিহারীলাল সবকার ও যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের মতো সৃষ্টিধর্মী লেখক যেমন তাঁদের উদারতাব জন্যে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথ থেকে সংকীর্ণতার দৃষ্টান্ত আহরিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটকে মুসলমান রাজা-বাদশাহ্‌র চরিত্রাঙ্কন ও তাঁদের অন্তঃপুরেব কাল্পনিক চিত্রনির্মাণ মুসলমান সমাজকে আঘাত করেছিল। হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকার প্রণয়কাহিনিও তাঁরা অপমানজনক মনে করেছেন এবং মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দু লেখকের অজ্ঞতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাব বার। হিন্দু নায়িকা ও মুসলমান নায়ক নিয়ে সমান্তরাল কাহিনি সৃষ্টি করে অনেকে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা হিন্দু লেখকদের দ্বারাই শুধু নিন্দিত হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদেরও ভর্ৎসনা লাভ করেছে।

এই পরিবেশে সরাসরি মিলনেব বাণী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে না মনে করেই অনেকে একটা নতুন ধ্বনি উত্থাপন করেছিলেন। তা হচ্ছে পারস্পরিক সহনশীলতা এবং মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবিকাশেব সুযোগের ভিত্তিতে অপর সম্প্রদায়েব সঙ্গে মিলন। এই ভিত্তিভূমি থেকে শুধু স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ দূরে ছিল না।

তাই বলা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলমানের ক্রমবর্ধমান সংশয় আর নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদের পথ সৃষ্টি করেছিল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন থেমে গেলে আবার এই স্বাতন্ত্র্যবাদ সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মনোভাবও এই স্বাতন্ত্র্যবাদ বা মিলনপন্থা নির্বাচনে ক্রিয়াশীল ছিল। ইংরেজবিরোধী চেতনা পরিব্যাপ্ত হলে মিলনেব কথা প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছিল; অন্যথায় ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের চেয়ে গুরুত্বলাভ করেছিল সাম্প্রদায়িক স্বার্থচেতনা। *মিহির ও সুধাকর* কি *আখবারে এসলামীয়া* বা *ইসলাম প্রচারক*-এব মতো পত্রিকা সাধারণভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রীতিই প্রকাশ করেছিলেন। *ইসলাম-দর্শন*-এর পৃষ্ঠপোষক ফুরফুরার পির আবুবকর নিজেকে 'বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হিতাকাঙ্ক্ষী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে *কোহিনুর* পত্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে ইংরেজের ভেদনীতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দেন ওসমান আলি। আর *মোসলেম ভারত*-এ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান লেখেন:

যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়,—সেও মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। ...স্বাধীনতার জন্য, সত্য ও মঙ্গলের জন্য যে অস্ত্র ধারণ করে, তাহাকে কেমন করিয়া ছোট বলিব? ...বর্ব্বর রাজশক্তিই স্বাধীনতাকামীকে চূর্ণ করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারে।...হে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান! মৃত্যু ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও।

এ অবশ্য ১৯২১-এর সময়ে লেখা। পর বছর নজরুল ইসলামের *ধূমকেতু* ইংরেজবিরোধী ভাবধারার প্রবল স্বাক্ষর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে *ধূমকেতু*-র এই সুস্পষ্ট ভূমিকাকে অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। এই চেতনার স্বাক্ষর অবশ্য *সওগাত*-এ প্রকাশিত (১৯২৭) *দি মুসলমান*-সম্পাদক মুজিবর রহমানের রচনাতেও পাই: 'যে পর্য্যন্ত কোন জাতি রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না।' *ধূমকেতু*-র পথ অনুসরণ করে *গণবাণী* (১৯২৬) বলেছিলেন: 'আমরা চাই ভারতবর্ষ পর-শাসন কবল হতে পূর্ণ বিমুক্ত হোক্, কিন্তু সে বিমুক্তির ভিত্তি ভারতের জনসাধারণের মতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—বিশিষ্ট শ্রেণীসমূহের মতের উপরে নয়।'

ইংরেজ শাসনের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, মনে হয়, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংরেজবিরোধী চেতনা পরিব্যাপ্ত হতে শুরু করে। এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলার অসুবিধা এই যে, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আমাদের সাময়িকপত্রে দেখা যায় না। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনায় তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মাঝে মাঝে—তার অতিরিক্ত নয়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক আলোচনার তুলনায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে বেশি; স্বাধীনতালাভের কল্পনার চাইতে সমাজসংস্কারের পরিকল্পনার ঘটেছে আধিক্য। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন-পরিক্রমার অপেক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনবীক্ষার পরিচয় পাই বেশি। আর সেই পরিচয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে নানা মতান্তরের ইতিহাস, নিজেদের স্বরূপ নির্ণয়ের দুরূহ ও জরুরি প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত।

১ নামটি যে *সমাচার দর্পণ*-এর অবিকল ফারসি অনুবাদ, তা লক্ষ না করে পারা যায় না।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িক পত্র*, ২ খণ্ড (২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৯), ১: ১২০-২২।

৩. ওই, ১:৫৫

৪ ওই, ১ ১২৩-২৪ দ্রষ্টব্য।

৫ ওই, ১:১৪৪ দ্রষ্টব্য।

৬. ওই, ১:১৪৪

৭ শিবলি নোমানির মিশর, তুরস্ক ও সিরিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত *ইসলাম প্রচারক*-এ ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হয়।

৮। Aziz Ahmed, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment* (Oxford, 1964), p. 64

৯. আবদুল কাদির, *মহাম্মদী আখবার*, *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র* (ঢাকা, ১৯৬৬), পৃ ১৮, ১৯ ও ২২।

১০. ওই।

১১. *তুরস্ক ভ্রমণ* (কলিকাতা ১৯১৩), 'তুর্কী নারী জীবন' (২য় সংস্করণ, ত্রিপুরা, ১৩২৫)।

১২. আমানুল্লাহ সিংহাসনচ্যুত হলে অবশ্য *মোহাম্মদী* সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

১৩. শিবলি নোমানির *আল মামুন* প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

১৪. আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্কের সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনায়ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও উপাখ্যানধর্ম লক্ষণীয়, তবে তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনায় বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতনতাও দেখা যায়। এই সচেতনতার তারতম্য লেখকদের মতদ্বৈধেরও কারণ।

১৫ *আল-এসলাম*-এ (১৯১৮) সেখ হবিবর রহমান *আলমগীর* নামে একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন।

১৬. শুধু তাই নয়। *ইসলাম-দর্শন*-এর লেখকেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, গুম্ফ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে এ দেশের মুসলমান হারাম কাজ করছেন, নতুন ফ্যাশনে চুল ছেঁটে বেদাতের ভাগী হচ্ছেন এবং কেউ কেউ যে স্ত্রীলোকের মতো দীর্ঘ কেশবিন্যাস করছেন, তা হারাম না হলেও বেদাত ও মকরুহ্ তো বটে।

আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* ১৮৩১-১৯৩০ (ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯) গ্রন্থের ভূমিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বাংলা পত্রিকার প্রচার: উনিশ শতকে

স্বপন বসু

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রকাশ যখন শুরু হয়, তখন বাংলার জনসাধারণের বিরাট একটা অংশই ডুবে ছিলেন অশিক্ষার অন্ধকারে। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত এইসব মানুষজনের সংবাদ-সাময়িকপত্রে কী বেরোল না বেরোল তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাহলে এই কালে বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়তেন কারা? মোটামুটিভাবে কলকাতা ও তার আশেপাশের শিক্ষিত মানুষজনই ওলটাতেন এইসব পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা। বাংলার নতুন রাজধানী কলকাতার ছাত্র ও যুব সমাজও এইসব পত্রিকা সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী ছিলেন। এদের সংখ্যা খুব একটা বেশি না হওয়ায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা পত্র-পত্রিকার প্রচার ছিল খুবই সীমিত। ১৮৩৪-এ *সমাচার দর্পণ*-এর প্রচারসংখ্যা ছিল ২৫০, আর ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র *জ্ঞানান্বেষণ*-এর মাত্র ১০০। ১৮৩৯-এ বাংলা পত্রিকার প্রচার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য মেলে সমকালীন একটি পত্রিকা থেকে। এই কালে বাংলায় নটি পত্রিকা প্রকাশিত হত (*সংবাদ অরুণোদয়* এই সময় সবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে)। পত্রিকাগুলিব মধ্যে *সংবাদ প্রভাকর* ছিল দৈনিক (যদিও রবিবার এটির কোনো সংখ্যা বেরোত না); *সমাচার দর্পণ*, *বঙ্গদূত*, *জ্ঞানান্বেষণ*, *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*, *সম্বাদ ভাস্কর*, *সম্বাদ রসরাজ*, *সংবাদ সৌদামিনী*—এই সাতটি সাপ্তাহিক। *সমাচার চন্দ্রিকা* বেরোত সপ্তাহে দু-বার। এইসব পত্রিকার প্রচারসংখ্যা কেমন ছিল তার বিবরণ *ক্যালকাটা ক্রিসটিয়ান অবজার্ভার* থেকে তুলে ধরছি:

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রচারসংখ্যা কলকাতায়	মফস্‌সলে (ডাকযোগে)	দাম (মাসিক) টাকা-আনা-পাই
সমাচার দর্পণ	জে. সি. মার্শম্যান	৩৫০	১৬০	১-০-০
সমাচার চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬	৬	১-০-০
জ্ঞানান্বেষণ	রামচন্দ্র মিত্র	৪৫	৪	১-০-০
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	উদয়চাঁদ আঢ্য	৭৭৮	৫৫	০-৪-০
সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৪	৭	১-০-০

সংবাদ সৌদামিনী	কালাচাঁদ দত্ত	৭৮	২	০-৮-০
সম্বাদ ভাস্কর	শ্রীনাথ রায়	৭০	১৫	১-০-০
বঙ্গদূত	রাজনারায়ণ সেন	৫০	০	০-৮-০
সম্বাদ রসরাজ	কালীকান্ত গাঙ্গুলি	১৫০	১	০-৪-০

তালিকাটি থেকে কয়েকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। পত্রিকা প্রকাশ মোটেই লাভজনক ব্যাপার ছিল না। নটির মধ্যে পাঁচটি পত্রিকার প্রচার ছিল একশোর নীচে। পত্রিকাগুলির প্রচার মোটামুটিভাবে কলকাতা ও তার আশপাশেই সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চলের কথা বাদই দিলাম, মফস্‌সল শহরগুলিতেও বাংলা পত্রিকার বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল না। বাংলা পত্রিকাগুলির মধ্যে মফস্‌সলে সবচেয়ে বেশি যেত *সমাচার দর্পণ*। এই কালে পত্রিকার যে ৯৬০টি কপি মফস্‌সলে পাঠানো হত, তার মধ্যে ৬৪টি যেত সাহেবদের কাছে, ৭১টি পাঠানো হত বিভিন্ন সরকারি অফিসারের কাছে, আর ২৫টি নিতেন বাংলার ধনী জমিদাররা। মফস্‌সলের সাধারণ মানুষ এইসব পত্রিকা দেখার সুযোগ পেতেন কি না সন্দেহ। কয়েক বছর পরেও অবস্থাটা থেকে যায় একই রকম। দেশীয় পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ৯.১.১৮৪৫-এ *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া* তাই মন্তব্য করে: 'Their circulation and influence are almost exclusively confined to the metropolis.'

কিন্তু পত্রিকাগুলি শহর কলকাতার গণ্ডির বাইরে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারল না কেন? আসলে এই কালে মফস্‌সল শহরগুলিতে শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। ডাকমাশুলের হার ছিল রীতিমতো চড়া। তা ছাড়া এই কালে বাংলায় যে-নবচেতনার সূচনা হয়েছিল তা একান্তভাবেই ছিল কলকাতা ও তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ। এইসব কারণে বাংলা পত্রিকা অন্তত এই সময়ে শহর কলকাতার বাইরে তেমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অবস্থাটা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। শিক্ষার আলো কলকাতার বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়াসের ফলে যেসব মেয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান, তাঁদের অনেকেই পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাঙালি মুসলমান সমাজের একাংশ বাংলাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বাংলা পত্র-পত্রিকা পাঠে ও প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রেলপথ চালু হবার পর যোগাযোগ ব্যবস্থাও সহজ হয়ে আসে।

পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয় উনিশ শতকের চল্লিশের বছরগুলি থেকে। ১৮৩৯ পর্যন্ত বাংলায় যতগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সবকটিই (*দিগদর্শন* ও *সমাচার দর্পণ* ছাড়া) বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে। ১৮৪০-এ রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয় *মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী*। রংপুর কুণ্ডীগ্রামের বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর উৎসাহে ১৮৪৭-এ

প্রকাশিত হয় *রঙ্গপুর বার্তাবহ*। মফস্‌সলের অন্যান্য শহরগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে রইল না। এমনকী গ্রাম বাংলার মানুষজনও সংবাদপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর সাহায্যে নিজেদের দাবিদাওয়ার অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করতে থাকেন। এইসব কারণে উনিশ শতকের ষাট-সত্তর ও আশির বছরগুলিতে মফস্‌সল থেকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির কোনো-কোনোটি দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কোনো-কোনোটি আবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবাদ পরিবেশনের গুণে সকলের সম্ভ্রম আদায় করে নেয়। ১৮৭৭-৮০—এই কালপর্বে মফস্‌সল থেকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

	১৮৭৭	১৮৭৯	১৮৮০
ঢাকাপ্রকাশ, ঢাকা	৪০০	৪০০	৩৫০
সাধারণী, চুঁচুড়া	৫১৬	৫১৬	৫০০
সংশোধিনী, চট্টগ্রাম	—	৫০০	৬০০
বরিশাল বার্তাবহ, বরিশাল	৩০০	৩০০	—
প্রতিকার, বহরমপুর	২৩৫	২৩৫	২৭৫
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, কুমারখালি	২০০	২০০	৫০০
সোমপ্রকাশ, চ্যাংড়িপোতা	৭০০	৭০০	১০০০
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, কাকিনীয়া	২৫০	২৫০	২৫০
ভারতমিহির, ময়মনসিংহ	৬৫৮	৬৫৮	৬৭১
মেদিনী, মেদিনীপুর	—	২৫০	২৫০

এই দশটি পত্রিকার মধ্যে *ঢাকাপ্রকাশ*-এর প্রচারসংখ্যা পরবর্তীকালে অনেক বেড়ে যায়। ১৮৯৪ থেকে পত্রিকাটির মুদ্রণসংখ্যা বেড়ে হয় ২৪০০।

মফস্‌সলের এইসব পত্রিকার তুলনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত অনেক সাপ্তাহিক পত্রেরই প্রচার ছিল বেশি। ১৮৭৯-৮৬—এই সময়কালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রচারসংখ্যার ছবিটা চোখের সামনে রাখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে:

	১৮৭৯	১৮৮৪	১৮৮৫	১৮৮৬
বঙ্গবাসী	—	১২০০০	১২০০০	২০০০০
সঞ্জীবনী	—	৪০০০	৪০০০	৪০০০
সময়	—	১৫০০	২৩৫০	৪০০০
আনন্দবাজার পত্রিকা	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০

নব বিভাকর	৯০০	৮৫০	৮৫০	১০০০
সহচর	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
সুলভ সমাচার	৫৫০০	৪০০০	৩০০০	৩০০০

পত্রিকার প্রচারসংখ্যার ওঠা-নামা অনেক ঘটনার ওপর নির্ভর করত। *সুলভ সমাচার*-এর কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে সস্তায় খবরের কাগজ প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দেবার পথ-প্রদর্শক কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৭০-এ তাঁর উদ্যোগে স্বল্পশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক কাগজ *সুলভ সমাচার* প্রকাশিত হয়। প্রকাশমাত্র পত্রিকাটি অভাবনীয় সমাদর লাভ করে। ব্যাপার দেখে উৎফুল্ল হয়ে ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৭-এ *সুলভ সমাচার* মন্তব্য করে:

> আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে এত অল্পদিনে এত সংখ্যা কাগজ বিক্রয় হইবে এবং এত আগ্রহের সহিত লোকেরা ইহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে। ...কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। প্রথমবার দুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে, দ্বিতীয়বারে প্রায় পাঁচ হাজার, এবার কি আট হাজার ছাপাইতে হইবে?

পত্রিকাটির জয়যাত্রা বেশ কয়েক বছর অক্ষুণ্ণ থাকে। একসময় এটি হয়ে ওঠে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সাপ্তাহিক। ১৮৭৯-র প্রথম দিকে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ৫৫০০-এ পৌঁছোয়। কিন্তু প্রচারসংখ্যার এই ঊর্ধ্বগতি ধরে রাখা পত্রিকাটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৭৯-র দ্বিতীয়ার্ধে পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার মানুষের কথ্য ভাষাকে বিদ্রূপ করে একটি লেখা প্রকাশ করে। এটির রেশ মেলাতে না মেলাতে আধুনিক মেয়েদের কুৎসিতভাবে আক্রমণ করে আর একটি লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। লেখা দুটির প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। পূর্ব বাংলার মানুষরা *সুলভ সমাচার* বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলে ১১.১০.১৮৭৯ থেকে পত্রিকাটির প্রচার এক ধাক্কায় ১৫০০ কমে গিয়ে দাঁড়ায় চার হাজার। পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভুল স্বীকার করার পরও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া *সুলভ সমাচার*-এর পক্ষে কোনোদিনই আর সম্ভব হয়নি।

পত্রিকার জনপ্রিয়তার পিছনে সম্পাদকের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সরকারি উদ্যোগে ১৮৫৬-য় *এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ* নামে একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ডবল্যু. ওব্রায়েন স্মিথের সম্পাদনাকালে পত্রিকাটির অবস্থা মোটেই সুবিধার ছিল না। ১৮৬৫-তে পত্রিকাটির

গ্রাহক ছিল মাত্র তিনশো ছ-জন। ১৮৬৬-র এপ্রিল মাসে প্যারীচরণ সরকার সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পর পত্রিকাটিকে ঢেলে সাজান। তাঁর আমলে গ্রাহকসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। একসময় পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা দু-হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৮৬৮-তে সরকারের সঙ্গে মতভেদের জন্য প্যারীচরণ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন। এই বছরের শেষদিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে গ্রাহকসংখ্যা কীরকম কমে যায়, সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক:

	১৮৭০	১৮৮০	১৮৮৫
এডুকেশন গেজেট	৭৫০	৭৪৫	৮০০

আসলে নির্ভীক সাংবাদিকতার যে-আদর্শ প্যারীচরণ তুলে ধরতে পেরেছিলেন, অনেক চেষ্টা করেও ভূদেব তার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারেননি। যে-কারণে সাধারণ মানুষ পত্রিকাটি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

প্রচারসংখ্যা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত তথ্য প্রচার করে পত্রিকাগুলি অনেক সময়ই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। ১৮৭৪-এ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ভারত শ্রমজীবী*। নতুন ধরনের এই পত্রিকাটি সমকালে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যে এর প্রচারসংখ্যা ৪০০০-এ পৌঁছোয়। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, ১৮৭৯-র ডিসেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটির প্রচার কমতে থাকে। একসময় তা কমে দাঁড়ায় ২১০০। গ্রাহকদের অনাগ্রহের জন্য পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১২৯২-এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে পত্রিকাটির দ্বিতীয় কল্প শশিভূষণ বিশ্বাসের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় কল্পের চতুর্থ সংখ্যায় সম্পাদক আক্ষেপ করে লেখেন: 'এখন বঙ্গদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকার তুফান উঠিয়াছে—এখন কি ভারত শ্রমজীবী আর আত্মগৌরব রক্ষা করিতে পারিবে...যে সময় ইহার ত্রিশ সহস্র গ্রাহক ছিল সে এককাল, আর এ এককাল।'

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব পত্রিকার কথা বললাম, তার প্রায় সবকটিই সাপ্তাহিক। দৈনিক পত্রিকার চাহিদা কেমন ছিল সেটাও একটু বলে নেওয়া যাক। ১৮৩৯-এর জুন মাসে বাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসাবে *সংবাদ প্রভাকর* আত্মপ্রকাশ করে, ১৮৩৯-এর ডিসেম্বরে বাংলার দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকা *সংবাদ অরুণোদয়*-এর আত্মপ্রকাশ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, উনিশ শতকে বাংলায় যত দৈনিক পত্রিকা বেরিয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছাড়া (*দৈনিক বার্তা*, হুগলি) সবকটিই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। এইসব দৈনিক পত্রিকার অধিকাংশই যে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি এগুলির প্রচারসংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে:

	১৮৭৭	১৮৭৯	১৮৮০	১৮৮৪	১৮৮৫
সংবাদ প্রভাকর	৫৫০	৫৫০	৭০০	২২৫	২২৫
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	—	—	৩০০	৩০০	৩০০
সমাচার চন্দ্রিকা	৬২৫	৬২৫	৬২৫	৬২৫	৬২৫
বঙ্গ বিদ্যা প্রকাশিকা	৬৫২	—	৫০০	৫২০	৫২০

প্রচারসংখ্যার দীনতা থেকে বোঝা যায়, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে পত্রিকাগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। যে-কারণে এইসব পত্রিকা সম্পর্কে লোকের কৌতূহল ছিল খুবই কম। কিন্তু উচ্চাঙ্গের দৈনিক পত্রিকার কদর করতে বাঙালি যে প্রস্তুত ছিলেন অন্য একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় *দৈনিক* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬-তেই পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা সাত হাজারে পৌঁছে যায়। প্রচারসংখ্যার এই ঊর্ধ্বগতি অবশ্য বেশিদিন বজায় রাখা পত্রিকাটির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সংবাদপত্রের পাশাপাশি অসংখ্য সাময়িকপত্রেরও আবির্ভাব হয়েছিল উনিশ শতকে। *বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক, নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা, জন্মভূমি, নবজীবন, প্রদীপ*-এর মতো বিখ্যাত পত্রিকা যেমন এই কালে বেরিয়েছে, তেমনই বেরিয়েছে স্বল্পখ্যাত বা অখ্যাত বহু পত্রিকা। এইসব পত্রিকা জনগণ কতখানি সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে এগুলির প্রচারসংখ্যা আমাদের সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৭৯-র বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় *বঙ্গদর্শন*। প্রথম দিকে পত্রিকাটি হাজার কপি করে ছাপা হত। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ১২৭৯-র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে মুদ্রণসংখ্যা বাড়িয়ে পনেরোশো করা হয়। ১২৮১-র কার্তিক মাস থেকে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় দু-হাজার। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ভারতী* প্রথম প্রথম পাঁচশো করে ছাপা হত। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে পত্রিকাটির প্রচার সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় সাড়ে আটশো। তুলনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর আমলে *ভারতী*-র প্রচার অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। ঠাকুরবাড়ির আঙিনা থেকে প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা *সাধনা*-ও ছাপা হত এক হাজার করে। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর *নব্যভারত* উল্লেখ করার মতো একটি পত্রিকা। এত উন্নত মানের মননশীল পত্রিকা উনিশ শতকে বেশি প্রকাশিত হয়নি। ১৮৮৩-তে পত্রিকাটির প্রথম আবির্ভাব। তখন পত্রিকাটিব মুদ্রণসংখ্যা ছিল এক হাজার। ১৮৯৭-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় আঠারোশো। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *প্রদীপ*-এর প্রচার ছিল রীতিমতো ভালো। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা তিন হাজার করে ছাপা হত। শিশু-কিশোরদের পত্রিকার মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনের *বালকবন্ধু* ভালো চলত। দু-হাজার করে ছাপা হত পত্রিকাটি। *মুকুল*-এর প্রচারসংখ্যা একসময়ে তিন হাজারে উঠেছিল। পরে অবশ্য তা এক হাজারে নেমে আসে। *বালক*-এর মতো উন্নত মানের কিশোর পত্রিকার কোনো সংখ্যাই হাজারের বেশি ছাপা হয়নি। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের *প্রবাহ* যে ভালো চলত, তা পত্রিকার মুদ্রণসংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে। ১৮৮২-তে পত্রিকার প্রতিটি

সংখ্যা দু-হাজার করে ছাপা হত। কালীপ্রসন্ন ঘোষের *বান্ধব*-ও খারাপ চলত না। প্রথম দিকে এটি ১২৫০ করে ছাপা হত। রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৮৪-তে প্রকাশিত হয় *প্রচার*। রাখালচন্দ্র ছিলেন নামেই সম্পাদক, কাজকর্ম সবই হত বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে। পত্রিকাটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার জন্য বাজারে এটির যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এইজন্য *প্রচার*-এর প্রতিটি সংখ্যা দু-হাজার করে ছাপতে হত। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *নবজীবন*-এর আত্মপ্রকাশ একই সময়ে। সম্পাদক হিসাবে অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন যথেষ্ট সফল। ১৮৮৪-তে পত্রিকাটির মুদ্রণসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। *প্রচার* আর *নবজীবন* এই দুটি পত্রিকাই হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ছিল ক্লান্তিহীন। এর কিছুদিন পরে *ইসলাম প্রচারক* ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। তবে প্রচারসংখ্যার দিক দিয়ে পত্রিকাটি *প্রচার* কিংবা *নবজীবন*-এর ধারেকাছে পৌঁছোতে ব্যর্থ হয়।

উনিশ শতকের সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো চলত *জন্মভূমি*। 'বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত' এই পত্রিকাটি প্রথম দিকে ছাপা হত পাঁচ হাজার করে। পত্রিকাটির প্রচার বাড়তে বাড়তে ১৮৯৭-এ দশ হাজারে পৌঁছোয়। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষরা কীভাবে এর প্রচার আরও বাড়ানো যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। *হিতৈষী* নামে একটি পত্রিকাও সেকালে ভালো চলত। প্রথম দিকে (১৮৯৫) পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসাবে বেরোত, পরবর্তীকালে এটি মাসিকে পরিণত হয়। মাসিকে রূপান্তরিত হওয়ার পর এটির প্রচারসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার। যে-কারণে পত্রিকাটি সগর্বে প্রচ্ছদে লিখত, 'এত অধিক প্রচার ভারতবর্ষের আর কোন মাসিক পত্রেরই নাই'। পত্রিকার এই দাবি যে যথার্থ নয়, *জন্মভূমি*-র প্রচারসংখ্যার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে-সমস্ত পত্রিকার কথা বললাম, সেগুলির প্রচার ছিল যথেষ্ট ভালো। কিন্তু এই কালে এমন কিছু পত্রিকা বেরিয়েছিল যেগুলির প্রচার ছিল নিতান্ত সীমিত। সীমিত প্রচারসংখ্যাব কোনো কোনো পত্রিকা রীতিমতো নাম করেছিল। *অবোধবন্ধু*-র কথাই ধরা যাক। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'পৌল ভর্জিনী' কিশোর রবীন্দ্রনাথকে কতখানি অভিভূত করেছিল তা তিনি নিজেই বলে গেছেন। এই পত্রিকাতেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর *নিসর্গ সন্দর্শন*, *বঙ্গসুন্দরী*-র মতো বিখ্যাত সব কাব্যগ্রন্থের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। *সাধনা*-য় *অবোধবন্ধু* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন:

> বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

উন্নত মানের এই পত্রিকাটির তেমন চাহিদা না থাকায় এটির প্রতিটি সংখ্যা মাত্র ৩৫০ কপি করে ছাপা হত। ১৮৬৯-এ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পূর্ববঙ্গ

থেকে প্রকাশিত হয় *অবলাবান্ধব*। প্রথম প্রথম এই পত্রিকাটি ছাপা হত পাঁচশো করে, পরে দ্বারকানাথ মুদ্রণসংখ্যা কমিয়ে চারশো করতে বাধ্য হন। এক সময়ে এর মুদ্রণসংখ্যা ২৫০-এ নেমে আসে। পূর্ববঙ্গের কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৭২-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *মিত্রপ্রকাশ*। প্রথম দিকে পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা আড়াইশো করে ছাপা হত, পরবর্তীকালে মুদ্রণসংখ্যা নেমে আসে একশো আশিতে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পঞ্চানন্দ* ব্যঙ্গপত্রিকা হিসাবে রীতিমতো সুনাম অর্জন করে। পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা কিন্তু দুশোতেই আটকে গিয়েছিল। বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে বনলতার সম্পাদনায় ১৮৯৮-এ *অন্তঃপুর* আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যাও কিন্তু আড়াইশোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বীণাবাদিনী*-র মুদ্রণসংখ্যা একসময় ২৫০-এ নেমে আসে। বিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক, কোরানের বাংলা অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন বাঙালি মেয়েদের মধ্য থেকে কুসংস্কার, অনীতি, দূষিত আচার-ব্যবহার দূর করার জন্য ১৮৯৫-এ *মহিলা* নামে একটি পত্রিকা প্রচার করেন। প্রথম দিকে এটি হাজার কপি করে ছাপা হলেও পরে প্রচারসংখ্যা চারশোতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ব্রাহ্মদের উদ্যোগে প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা *পরিচারিকা*-র অবস্থা ছিল আরও করুণ। এটি ছাপা হত মাত্র আড়াইশো কপি। ১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *ঐতিহাসিক চিত্র*। উন্নত মানের এই পত্রিকাটি গ্রাহকদের সহযোগিতার অভাবে বছর ঘুরতে না ঘুরতে বন্ধ করে দিতে হয়। হিন্দুধর্মের গোঁড়া সমর্থক *বেদব্যাস* পত্রিকাটি উগ্র মতামতের জন্য একসময় অনেকের নজর কেড়েছিল। প্রথম প্রথম এই পত্রিকাটি তিনশো কপি করে ছাপা হত, পরবর্তীকালে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা সামান্য হলেও বাড়ে। প্রচারসংখ্যার দীনতা ঢাকার জন্য কোনো-কোনো পত্রিকা ছলনার আশ্রয়ও নিত। মধু মিয়ার সম্পাদনায় ১৮৯৯-এ *প্রচারক* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রচ্ছদে লেখা থাকত: 'The only widely circulated Mahomedan Monthly Magazine in Bengal'। এই 'বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকা'-টির কোনো সংখ্যাই কিন্তু তিনশোর বেশি ছাপা হয়নি!

যত দিন গেছে বাংলা পত্রিকার সংখ্যা তত বেড়েছে, শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা ঢুকে পড়েছে গ্রাম বাংলার অনেক ঘরে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে। উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার সংখ্যা এবং সেগুলির প্রচারের কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ পত্রিকা প্রকাশে এবং পাঠে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহ উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির সংস্কৃতিমনস্কতার এক অভ্রান্ত পরিচয়।

সম্পাদক কী? কে? কেন? কোথায়?

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিশ বছর আগে বই সম্পাদনার পেশা গ্রহণ করার আগে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমারও জানা ছিল না। ত্রিশ বছর এই পেশায় নিবন্তর নিযুক্ত থেকে, এই ক্ষেত্রের প্রায় সর্বত্র মাথা খাটিয়ে, হাতেকলমে কাজ করে, এতদিনে মনে হয় ওই প্রশ্নগুলির কিছু উত্তর খুঁজে পেয়েছি। তাই বলে খোঁজার শেষ হয়েছে এমন বলব না। কারণ বইয়ের ইতিহাস এমনই অনন্ত পরিবর্তমান যে, উত্তরগুলোও পালটে পালটে চলে।

এই ত্রিশ বছরে সম্পাদনার বিধিবিধানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। কলকাতায় অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেসে যখন প্রথম কাজ শিখতে শুরু করি, তখন প্রথম শিক্ষাই ছিল, কোনো বইয়ের প্রস্তাব প্রথম উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বা পাণ্ডুলিপি হাতে পৌঁছোবার মুহূর্ত থেকে বই ছাপা বাঁধাই সম্পূর্ণ করে প্রকাশকের 'সেল্‌স্ স্টাফ'-কে 'ব্রিফিং' দেওয়া পর্যন্ত তো বটেই, তার পরও অর্থাৎ প্রথম বিজ্ঞাপনের বয়ান ও কোথায় কীভাবে কী বিন্যাসে তা প্রকাশিত হবে তা নির্দেশ করা, কিংবা কিছুদিন পরে যদি বিক্রিতে ঘাটতি পড়ে তারও সুরাহা করার উদ্যোগ নেওয়া, এ সবই কোনো একক সম্পাদকের দায়। সংগঠনের একাধিক বিভাগ, সহযোগী অন্য সম্পাদক, বাইরের 'ডিজাইনার', এঁদের প্রভৃত অপরিহার্য অবদান আমার বই তৈরিকে যে কতভাবে পুষ্ট করেছে, সমৃদ্ধ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটা বই শেষ পর্যন্ত যে-তিনজনের ধনপ্রাণ, অর্থাৎ লেখক, প্রকাশক ও পাঠক, সেই তিনজনের কাছেই জবাবদিহির দায় একা কিন্তু আমারই।

সেই দায় মেনে নিয়েই আমায় ভাবতে হয়, চিনে নিতে হয় আমার সেই বইয়ের পাঠক হবেন কারা, তাঁদের বয়স, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও রুচির মান, আকর্ষণ। সেই ধারণাটা একভাবে তৈরি করে নিয়ে তবেই ভাবতে পারি বইয়ের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি , ছাপা অক্ষরের মাপজোখ, পৃষ্ঠার বিন্যাস, প্রচ্ছদসহ বইয়ের অঙ্গসজ্জা, মুখবন্ধ-ভূমিকা ইত্যাদি কেমন হবে, টীকা-ব্যাখ্যা-নির্দেশিকা, গ্রন্থপঞ্জি, সারণি, চিত্রনিদর্শনের কতটা প্রয়োজন আছে। তার পর পুঙ্খানুপুঙ্খ কপি-এডিটিং ও প্রয়োজনীয় পরিপূরণ। এই ত্রিশ বছরে যে শ-দুয়েক বই সম্পাদনা করেছি, তার অন্তত দেড়শোটির দুটো করে প্রুফ দেখেছি। ছাপার ভুলের ভয় ও লজ্জায় এখনও বড়ো সংকুচিত হয়ে থাকি, আমার দায় কারো উপর চাপিয়ে স্বস্তি পাই না।

পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার অবধারিত যুক্তিতেই দ্রুততর উৎপাদনের অনিবার্য

তাগিদে সম্পাদকের এই একক সর্বত্রগম দায়বদ্ধতা ক্রমশই শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে চলেছে। যে-কোনো বড়ো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে এখন সম্পাদকীয় দপ্তরে নানা স্তরে অবস্থানের বৈষম্য ও দায়িত্ব বন্টন তথা বিভাজনের প্রসাদে বই তৈরির সমগ্র প্রক্রিয়াটিই খণ্ডবিখণ্ডিত। বছর দশেক আগে আমার এক ছাত্রী (সবে তখন সাংবাদিকতায় প্রবেশ করেছেন) পেংগুইন ইন্ডিয়ার প্রধান সম্পাদককে প্রশ্ন করেছিলেন: পেংগুইন ইন্ডিয়া প্রকাশিত বইতে এত মুদ্রণপ্রমাদ কেন? সম্পাদক রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে সবল রূঢ় কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন: 'তাতে আমার কী? তুমি কি দাবি করছ যে, সম্পাদককে প্রুফ দেখতে হবে?' আমি এই মুহূর্তে আমার পড়ার ঘরে যে-টেবিলে বসে এই লেখা লিখছি, সেখান থেকে চোখ তুললেই সামনের বইয়ের তাকে দেখতে পাচ্ছি ও.ইউ.পি. প্রকাশিত রিচম্যান-এর *মেনি রামায়নাস্* বইয়ের স্পাইন-এ প্রকট অশুদ্ধ বানান: *Many Ramanayanas*! পেংগুইন ইন্ডিয়ার সম্পাদনা-নির্বিকারতার (যার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত মারি সিটন-এর সত্যজিৎজীবনীর নতুন সংস্করণে পুরাতন Who's Who-র অসংশোধিত পুনঃপ্রকাশ, যাতে অনেক কুশীলবই আর is নন, was হয়ে গেছেন বহুদিন, আর বর্তমানের বিশিষ্ট চিত্রনির্দেশক অপর্ণা সেন নিতান্তই ছোটোখাটো ছবির অভিনেত্রী!) সঙ্গে এখনও ও.ইউ.পি. ইন্ডিয়া-র মানের কোনো তুলনাই হয় না, কারণ পেংগুইন ইন্ডিয়া কোনোদিনই তেমন কোনো মানের মর্যাদাই লাভ করেনি। আর সেই কারণেই ও.ইউ.পি.-র পদস্খলনমাত্রই এমন বেদনাদায়ক।

একটা বই নিয়ে ক্রমাগত ওই দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ-তন্নিষ্ঠ নাড়াচাড়া—শুধু নাড়াচাড়াই তো নয়, বইয়ের বিষয় যখন আমার অধিকারবহির্ভূত, তখন সেই বিষয়ে পড়াশুনো করে প্রাণপণে চেষ্টা করা যাতে অন্তত সামান্য পদক্ষেপ করতে পারি—কেবল তার মধ্যে দিয়েই ওই বই তৈরির নিজস্ব প্রকরণ আয়ত্ত হয়। পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠ, তার পর মূল বয়ানের সঙ্গে টীকা, উল্লেখনির্দেশের সংগতি পরীক্ষা, তার পর ভাষা সংস্কার, তার পর কম্পোজিটর বা টাইপসেটারকে অক্ষরবিন্যাসের নির্দেশ দেওয়া—বিশেষত অধ্যায়, অণু-অধ্যায়, অধ্যায়খণ্ড ভাগ ও তাদের শিরোনাম ও তার অক্ষরাকার নির্ধারণ, শেষে টীকা, প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট বা নির্দেশিকা, তথা ইনডেক্স।

লেখক ও সম্পাদক, দু-পক্ষেই সম্ভ্রম ও বিনয় ও একটা একান্ত সম্পর্ক ছাড়া একটা বই বোধ হয় কখনোই যথার্থ তৈরি হয় না। এই সম্পর্কের বিন্যাসে দুজনেরই লক্ষ্যবিন্দু কিন্তু পাঠক, কারণ তাঁর কাছে পৌঁছোনোর তাগিদেই তো বই তৈরির উদ্যোগ। অথচ দু-পক্ষেরই আত্মম্ভরী ঔদ্ধত্য প্রায়ই এই প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করে। আমি একদিক থেকে ভাগ্যবান, আমি যাঁদের লেখা নিয়ে কাজ করেছি, তাঁরা একদিক থেকে যেমন আমায় অপার প্রশ্রয় দিয়েছেন, তেমনই আবার আমায় এমন অনেক কিছু শিখিয়েছেন বা ধৈর্যভরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যা আমার চিন্তায় বা চর্চায় অমূল্য সম্পদ হয়ে থেকেছে।

অথচ বিপরীত অভিজ্ঞতা যে হয়নি, তা-ও তো নয়। একেবারেই আড়ালে থেকে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের একটি বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনায় হাত লাগাতে গিয়ে চেষ্টা করছিলাম বানানের সমতা রাখার—পারতপক্ষে সংসদ ও আকাদেমি বানান অভিধানের উপর নির্ভর করেই। আসল সম্পাদিকা একটি লেখা এনে দেখালেন, লেখক (লেখক হিসেবে তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, তবে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, থাকলে হয়তো সবিনয়ে তাঁর শরণার্থী হতাম) লিখিতভাবে জানিয়েছেন, তাঁর লেখায় কোনোরকম হস্তক্ষেপই তিনি মানবেন না। আমি পেশায় সম্পাদক, আবার ছোটো মাপের প্রাবন্ধিকও বটে। নিজের লেখার পাণ্ডুলিপি প্রকাশক বা অন্য সম্পাদকের হাতে তুলে দেবার আগে খুবই খুঁতখুঁতে থাকি, তবুও কোনোদিন কোনো প্রকাশক বা সম্পাদকের কাছে এমন দাবি জানাইনি। এ ক্ষেত্রে লেখাটি পড়তে গিয়ে দেখলাম, এটি রাজশেখর বসু বা শঙ্খ ঘোষের পাণ্ডুলিপির সগোত্র নয়। অথচ সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে লেখকের অবিসংবাদিত গুরুত্ব আমি লাঘব করব কোন স্পর্ধায়! তাই সম্পাদিকাকে উপদেশ দিলাম, একেবারেই অপরিহার্য সংস্কারটুকুই করা যাক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সম্পাদকীয়তে কৈফিয়ত দিতে হল:

> সম্পাদিকা হিসেবে একটা অতৃপ্তি থেকে গেল। বানানের সমতা রক্ষা যে-কোনো সুসম্পাদিত প্রকাশনার অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। সেই শর্ত পালনে আমাদের যথাসাধ্য সযত্ন প্রয়াস বাধা পেয়েছে প্রণয়কুমার কুণ্ডুর লিখিত 'নির্দেশ'-এ: 'এই লেখায় বানান, বাক্য, ছেদচিহ্ন এবং স্তবকবিন্যাস (paragraph) যেভাবে যেখানে আছে সেইভাবেই যেন ছাপা হয়।' স্বভাবতই বাকি যাবতীয় লেখার সঙ্গে এই লেখাটির বানানে যেমন অসংগতি থেকে গেল, তেমনি লেখাটির মধ্যেই রয়ে গেল অসংগতি, যেমন প্রায় পাশাপাশি 'চরিত্রাবলী' ও 'কার্যাবলি'। তবুও যা ও তা-এর পর ও ক্রিয়াপদের মধ্যে ঊর্ধ্ব কমা বর্জন ও 'কোন' ও 'কোনো'-র মধ্যে প্রভেদ করার জন্য আশা করি প্রণয়বাবু আমাদের ক্ষমা করবেন। 'আর্টিষ্ট' বদলে 'আর্টিস্ট', 'পাণ্ডুলি' বদলে 'পাণ্ডুলিপি', 'ধরণ' বদলে 'ধরন', 'আকৃতি' বদলে 'আকুতি' করে নেবার জন্যও আমরা তাঁর কাছে সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থী।

বানানের শুদ্ধতা ও সমতার উপর জোর দেওয়া, অক্ষরের মাপজোখের তারতম্য ভেবেচিন্তে স্থির করা, শিরোনামের শ্রেণিবিভাগ ও সেই শ্রেণিবিচারে টাইপনির্দেশ, এ সবেই চূড়ান্ত বিচার্য পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য। পড়তে গিয়ে পাঠ্যের পাঠে যাতে পাঠক কোথাও কোনো বাধা বা অস্বস্তি বোধ না করেন তা নিশ্চিত করাই সম্পাদকের কাজ।

অবশ্য সাম্প্রতিক কালে একটা ব্যাপার ভাবতে হচ্ছে। সব বই-ই যে পাঠ্য রূপেই পরিকল্পিত তা আর বলা যায় না। অনেক বই-ই তৈরি হচ্ছে বসবার ঘরে টেবিলে ফেলে রাখার জন্য, যাকে বলা হয় 'কফি টেব্‌ল বুক'। গৃহশোভন বইয়ের জাতই আলাদা, তার দামও অনেক সময় দামি আসবাবপত্র বা ঘরসজ্জার উপকরণের মতোই, বইয়ের শরীরে সেই দাম প্রকট হলেও মন্দ হয় না! এরকম বইয়ে পাঠস্বাচ্ছন্দ্য থেকে বাহাবিপনা বেশি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রকাশক ও সম্পাদককে খুব ঠান্ডা মাথায় তখনও স্থির করতে হয়, কার জন্য তিনি বা তাঁরা বই তৈরি করছেন। ধরুন সম্প্রতি সিগাল বুক্‌স প্রকাশিত মৃণাল সেনের *মন্টাজ: লাইফ্, পলিটিক্স, সিনেমা* বইটির কথা। সজ্জার বৈভবেই যাব দাম বারোশো টাকা, অথচ যার অবলম্বন মৃণালবাবুর প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকার, যা কিন্তু সিরিয়স পাঠকের পড়বার বিষয়—কার জন্য এই বই? ঘরসজ্জার বই কিনিয়েদের মধ্যে মৃণালবাবুর কি আদতেই সেই বাজার আছে? আর যাঁরা মৃণালবাবুর ছবিব গুণগ্রাহী বা তর্কের খাতিরেও তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী, তাঁদের কজন এই বই কিনতে পারবেন? অথচ এই বইয়ের মধ্যে ভাবনা ও চিন্তার যে-সম্পদ আছে, তা যদি লক্ষ্য-পাঠকের কাছে পৌঁছোত, তাহলে মৃণালবাবুর ছবি ও আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অন্য মাত্রায় পৌঁছোতে পারত। সেই সম্পাদকীয় ভাবনা এই বইটির পরিকল্পনায় দেখা গেল না।

সম্পাদকীয় কর্মবিধিব প্রামাণ্য আকরগ্রন্থের অভাব নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের যে-বোধ ও কল্পনা বই তৈরি করে (ভাবনা থেকে লেখা থেকে প্রকাশ), তার সম্ভাবনা ও ব্যাপ্তি এমনই বিপুল যে, বাব বার *শিকাগো ম্যানুয়াল* কিংবা নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি-র *রাইটার্স গাইড* পেরিয়ে সমস্যার সমাধানও খুঁজতে হয়, বই ধরে, বিশেষ পাঠকসম্প্রদায়ের কথা ভেবে। যেমন ধরুন, কল্যাণী দত্তের লেখার অসামান্য মৌলিকতা আবিষ্কার করে যখন আমরা *থোড় বড়ি খাড়া*-র বই তৈরিতে হাত দিই, প্রথমেই মনে হয় কল্যাণী দত্তের লেখায় স্মৃতি, শোনা কথার সম্পদ, বইয়ের উল্লেখ মিলিয়ে, একেকে অন্যের সাক্ষ্যপ্রমাণে-পরিপূরণে কাজে লাগিয়ে যে অন্য ঐতিহাসিক আখ্যান তৈরি হয়েছে, তাতে সরাসরি প্রামাণ্য নথি বা আলোকচিত্রের সাক্ষ্যের বাইরে অন্য একটা প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে ছাপা হরফের যান্ত্রিক ঋজুতার বাইরে একটা চিত্রল ক্ষেত্রের আভাস আছে। এই লেখার ভাষা ও তার কারিগরি যেন পাঠকের ভাবনাকে মুক্তি দিতে চায়, কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে একটা আবহ কল্পনা করে নিতে পাঠককে প্ররোচিত করে। এই বোধ থেকেই পূর্ণেন্দু পত্রীকে আহ্বান করি এই বইটির ওই বিশেষ চারিত্র্যকেই বইয়ের আকারে-প্রকারে আত্মস্থ করে দিতে। সেই ভাবনা থেকেই ২৪×১৮ সি.এম. মাপে পৃষ্ঠা, পূর্ণেন্দুর চিত্রকারিতে কালিঘাটের পটের রৈখিকতায় আরও পোক্ত জমি ও ভারের সংযোজন, যাতে আদি পটের সহজাত স্ফূর্তি কালের টানাপোড়েনে একটা বিচারশীলতার মাত্রা পেয়ে পাঠককেও সেই বিচারভাবনায়

নিয়োজিত করে। পরে কল্যাণী দত্ত যখন সেই একই মেজাজে, অতীতের মায়া ও বর্তমানের বিচারশীলতাকে বার বার অন্বিত করে সামাজিক মানুষের কল্পনা ও চিন্তায় পশুপাখির অস্তিত্ব-অবস্থানের বিবরণ রচনা করে যান, আর সেই রচনাগুলিকে সাজিয়ে আমরা *অষ্টরম্ভা* বই তৈরি করি, তখন মানুষ-পশুপাখির মধ্যে অব্যাহত আনাগোনা-দেওয়ানেওয়ার জৈবিক আবর্তের একটা বিচিত্র আবহ তৈরি করতেই শিল্পীবন্ধু প্রকাশ কর্মকারকে আহ্বান করি। কারণ তাঁর ছবিতে রেখার মোচড়ের এক একটা টানে মানুষ ও পশুপাখি, দুয়েরই শারীরিক গঠনে বার বার চারিত্রিক রূপান্তর ঘটে যেতে দেখেছি, আর তাতেই দেখেছি মানুষের কল্পনায় মানুষ-পশু-পাখি-ভেদের নিত্য অস্বীকৃতি। সেই অস্বীকৃতিই যেমন কল্যাণী দত্তের লেখায় লোককল্পনার প্রস্থানবিন্দু, তেমনই আবার প্রকাশের রেখাবিলাসেরও। সেই টানেই এই দুই এক হয়ে যায় *অষ্টরম্ভা*-য়।

বইয়ের সমালোচকেরা এসব লক্ষ করেননি। কেবল নবনীতা দেব সেনই তাঁর একটা লেখায় *থোড় বড়ি খাড়া*-র অবয়বে সমন্বয়ের ওই মাত্রাটি লক্ষ করেছিলেন। বই সম্পূর্ণ করে এনে শিল্পীকে প্রচ্ছদ এঁকে দেবার বরাত দেওয়ার সহজ পথ বা বইয়ের বিষয়টি মোটামুটি ধরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিছু ছবি আঁকিয়ে নেওয়ার সহজ পথ পরিহার করে যখনই বই তৈরিতে বইয়ের সামগ্রিক ভাব ও চরিত্র ধারণবহনে শিল্পীকে সহযোগী পেয়েছি, তখনই বই তৈরিও অন্য তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

আবার ধরুন থীমা-রই *না-এর মধ্যে হ্যাঁ* বইটি। লেখিকা চম্পাকলি বসুর অগ্রন্থিত বিচ্ছিন্নভাবে লেখা গদ্য ও কবিতার টুকরোগুলি যখন আমার হাতে আসে, তখন সেগুলিকে একটা কোনো স্বচ্ছন্দ, হালকা ধারাবাহিকতায় সাজিয়ে যখন বইটা গেঁথে তুলছি, ঠিক তখনই ঘটনাচক্রে শিল্পীবন্ধু শিপ্রা ভট্টাচার্য তাঁর একটি প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করা ছবি আমাকে দেখবার সুযোগ দেন, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ-এর সূত্ররচনাটি লিখবার দায়িত্ব দেন। ঘরবন্দি অথচ বাইরের টানে উচাটন এক নারীর একেবারেই ঘরোয়া ভাবনাধারার সেই ক্ষণভঙ্গুর লিখন আর ছাদের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে আকাশদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা শিপ্রার মেয়েদের মধ্যে একটা বহতা খুঁজে পেয়ে শিপ্রার হাতে বইয়ের এক সেট প্রুফ তুলে দিই, প্রচ্ছদ এঁকে দিতে বলি। ধরতে পারছিলাম, প্রবীণা চম্পাকলি ও তরুণী শিপ্রা খুবই কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন, হয়তো বা দুজনেরই প্রাইভেসি-র সহজাত প্রচ্ছন্ন আর্তির তাড়নায়। ১৯×১৩ সি.এম.-এর মাপে পৃষ্ঠার বিন্যাসে ওই চাপা পড়া, সংকুচিত জীবন ও অনুচ্চারিত দহনভাবনার সীমানা চিহ্নিত করে তারই আবদ্ধ পরিসরে চম্পাকলির যে-চিন্তার আবর্তন, প্রচ্ছদের বহির্দৃশ্যপটে শিপ্রা যেন তাকেই বাহিরে এনে দাঁড় করান, তখনও কিন্তু ১৯×১৩-র বাহুসীমায়!

থোড় বড়ি খাড়া ও *অষ্টরম্ভা*-র ২৪×১৮-র বিস্তার ও লেখা ও ছবির সাযুজ্য তথা মিথস্ক্রিয়ায় আমরা একটা বিশেষ পরিসর—বলা যায়—'আবিষ্কার' করি। ওই মাপটা বইয়ের পরিচিত মাপ, কিন্তু ফাঁকা জমি ও ছবির স্থাপন-বিন্যাসে, টাইপের

বাছাইয়ে (পূর্ণেন্দু পত্রী লেখা, ছবি ও অলংকরণেব স্বতন্ত্র দীক্ষায ও তাদের বিচিত্র বুদ্ধিদীপ্ত মেলবন্ধনে যে অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতায বলীযান ছিলেন, তাব পবিচয় পেয়েছিলাম --বলব, খানিকটা বুঝেছিলাম—ওই *থোড় বড়ি খাড়া* নিয়ে অনেকগুলো দিন জুড়ে অনুপুঙ্খ আলোচনায়) ওই পবিসরটাকে আমরা একটা চরিত্র দিতে পেরেছিলাম (যার প্রধান কৃতিত্ব নিঃসংশয়েই পূর্ণেন্দুর)---যা থেকে 'সমাজচিত্র' আখ্যানেব একটা গ্রন্থমালার পবিকল্পনা তৈরি হযে যায়।

কীভাবে একটা বইয়েব বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে তার চরিত্রের মৌলিকতা বইয়ের আকারে-বিন্যাসে ধারণ ও মর্ত করতে গিযে বইয়ের একটা বিশেষ আদল তৈরি হয়ে যায়, আবার বইয়েব বিশেষ দেহজ আদলটা ওই বইয়েব জাতিচরিত্রেরই যথার্থ আধারস্বরূপ হয়ে ওঠে এবং গ্রন্থমালায ওই আদি বইয়েব বীজভাবনার বিস্তার পায়, তার প্রক্রিযাটা কতটা স্পষ্ট করতে পারলাম ঠিক জানি না। কিন্তু বলতে পারি, বই তৈরির গতিক্রিয়াতেই একটা যুক্তিক্রম তৈবি হয়ে গেল—যার তাড়নায় আমবা পূর্ণেন্দুর তেভাগা পবিক্রমাব বিবরণ থেকে তৈরি কবতে লেগে যাই *অন্য গ্রাম অন্য প্রাণ*। বাংলায় তেভাগা আন্দোলন অবরুদ্ধ, শান্ত হয়ে যাবাব পাঁচ বছর পর পূর্ণেন্দু ওই আন্দোলনেব ঝটিকাকেন্দ্রগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন, আন্দোলনের অতীত ও বর্তমানকে একসঙ্গে চোখে দেখবেন বলে। গদ্যে কবিতায সেই অভিজ্ঞতাকে তখনই লিপিবদ্ধ করে যে-রচনাগুলি পূর্ণেন্দু লিখেছিলেন, তার মধ্যে যা তাঁব নিজের সংগ্রহে ছিল তা তিনি আমাব হাতে তুলে দেন বইয়েব বিন্যাসে সাজানোর দায়িত্ব দিয়ে। কথা ছিল, লেখাগুলি একটা বিশেষ পাবম্পর্যে সাজিয়ে দিলে পূর্ণেন্দু এখানে ওখানে সন্ধিস্থলে লেখাজোখা জুড়ে দেবেন, পুরোনো স্মৃতি থেকে ছবি আহরণ করে আঁকবেন নতুন করে এই বইয়ের জন্য।

পূর্ণেন্দু ও আমি দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, ইতিহাসের ঘটনাবর্তে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে ধারিত (না কি অভিজ্ঞতার রক্তক্ষরণে ব্যর্থতা-অসম্পূর্ণতাব ক্ষোভে-গ্লানিতে মথিত) যে জীবন্ত বৃত্তান্ত ইতিহাসকারদের আত্মপ্রত্যয়ী, বড়োই নিশ্চিন্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বার বারই নিহত হয, তাকে পুনরুত্থিত করে যেন ইতিহাসের পুনরুজ্জীবনের একটা সম্ভাবনা আমাদের হাতে এসে পড়েছে ভেবে। স্বভাবতই চিত্রণ বা অলংকরণ নয়, তাঁর লেখার আঁত ও আঁচ থেকেই ছবি তুলে আনতে চাইছিলেন পূর্ণেন্দু। বলাই বাহুল্য, নব্বুইয়ের দশকে সমাজতন্ত্রের নাটকীয় অধঃপতন ও কাছে দূরে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নৈমিত্তিক আপোশরফা দেখতে দেখতে তিতিবিরক্ত আমবা হারানো ইতিহাসের একটা অধ্যায় খুঁজছিলাম, সেই ইতিহাসের দিনমজুরদেব ভাষা ও বয়ান থেকে।

বইটা পুরোপুরি তৈরি করা যায়নি। পূর্ণেন্দু অসুস্থ হযে পড়লেন, মারা গেলেন। আমি ততদিনে খুঁজে বার করেছি পূর্ণেন্দুর আরও কিছু প্রাসঙ্গিক ওই সময়েরই লেখা—গদ্য ও কবিতা, দুই-ই। পর পর সাজানোও হয়েছে একভাবে। পূর্ণেন্দু মনোমতো ছবি

এঁকে তাকে পুষ্ট ও আরও শরীরী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন না। পূর্ণেন্দুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহযোগিতায় তাঁর পুরোনো ছবি অবাধে ঘাঁটবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তারই প্রসাদে লেখার সঙ্গে সংগতি রেখে যে-ছবিগুলো বেছে নেওয়া গেল, তাতে হয়তো পঞ্চাশের দশকে তেভাগা ভূমিতে পূর্ণেন্দুর পরিক্রমার তাৎক্ষণিক-তাৎকালিক কিছুটা সাক্ষ্য রইল, কিন্তু নব্বুইয়ের দশকের পূর্ণেন্দু তো চেয়েছিলেন তাঁর ছবিতেই তাঁর পুরোনো স্মৃতির নবায়ন ঘটবে, তার একটা ইন্টার্নাল ক্রিটীক তৈরি হবে।

সুধীর চক্রবর্তী যখন নিজেই তাঁর কয়েকটি প্রকাশিত কাহিনি সাজিয়ে *নির্বাস* বইটির পাণ্ডুলিপি আমাদের দিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই জাতিধর্মে তাকে আমাদের ওই গ্রন্থমালার অন্তর্গত ভেবে নিই। যে নির্বাসী মানুষদের মধ্যে একটা যোগ লক্ষ করে সুধীরবাবু একটা সমাজপ্রান্তীয় ক্ষেত্র যেন চিহ্নিত করছিলেন (সত্যিই করছিলেন কি, না কি তা আমারই পাঠ তথা অনুমান?) সেই ক্ষেত্রটি বড়ো গভীরভাবে চেনেন এমন দুজন শিল্পীকে বেছে নিই—খালেদ চৌধুরী (যাঁর চেতনা গবেষকের নির্মম অনুসন্ধিৎসা ও বিচারের, অথচ যিনি সেই অভিজ্ঞতার প্রাণধর্মে সহজদীক্ষিত) ও পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি তুলনায় অবিচারী, ওই জীবনদোলায় সাবলীল)—ওই ক্ষেত্রটিকে চিত্রিত করে তুলতে, সুধীরবাবুর লেখায় যা প্রচ্ছন্ন থেকে যায়, সেই আবহের প্রাণচেতনাকে রেখায়িত করতে।

লেখার সঙ্গে ছবি নয়, ছবি-লেখা জড়িয়ে, একের মধ্যে অন্যকে স্থাপন করে, বুননের ভাষায় একটা পুরোপুরি অর্থময় বই তৈরি করার ভাবনায়-প্রয়াসে প্রাণপাত করেও, এক একটি বই ধরে ধরে তার তৈরির দর্শনে ও পদ্ধতিতে সমস্যার জট ছাড়াতে ছাড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েও যে-কটি মনোমতো বই তৈরি করে আনন্দ পেয়েছি, তার পরও দেখি, প্রায় কেউই তার কিছুই লক্ষ করেননি। সান্ত্বনা বলতে মুষ্টিমেয় কিছু বন্ধুর উপস্থিতি যাঁদের সঙ্গে এইসব নিয়ে মতবিনিময় থেকে উত্তেজনাবিনিময় চলে, আর তাতেই বই তৈরির বড়োই একান্ত, অব্যবসায়িক, অপ্রাতিষ্ঠানিক—বলুন প্রাগৈতিহাসিক, প্রাক্‌প্রাযুক্তিক—আবেগে উদ্‌বেল হতে প্রাণিত হই। সম্পাদক হিসেবে বইয়ের প্রচ্ছদে বা নামপত্রে নাম দিতে আমরা এখনও ভয় পাই, সংকুচিত হই, নিতান্ত বাধ্য হলে বা দায়িত্বগ্রহণ কখনও আবশ্যক হলে, যতদূর ছোটো অক্ষরে ছাপা যায় ছাপতে দিয়ে নিয়মরক্ষা করি। পুরোনো রীতির সমগ্রসঞ্চারী সম্পাদকদের দ্রুত বিলীয়মান উপজাতিটির সংস্কার ও অভিজ্ঞতার দিকে একবার তাকালে বিপুলায়ত প্রকাশনা ব্যবসায়ের এখনও হয়তো কিছু শিক্ষার থাকতে পারে।

কল্যাণী দত্ত রচিত *থোড় বড়ি খাড়া* বইয়ের অলংকরণ। শিল্পীঃ পূর্ণেন্দু পত্রী।

কল্যাণী দত্ত রচিত *থোড় বড়ি খাড়া* বইয়ের অলংকরণ। শিল্পীঃ পূর্ণেন্দু পত্রী।

কল্যাণী দত্ত রচিত *অষ্টরম্ভা* বইয়ে 'গর্দভ' শীর্ষক পরিচ্ছেদের অলংকরণ। শিল্পী: প্রকাশ কর্মকার।

সুধীর চক্রবর্তী রচিত *নির্বাস* বইয়ের অলংকরণ। শিল্পী: খালেদ চৌধুরী।

যা পেরেছি, তা-ই পারি

অশোক মুখোপাধ্যায়

যখন সাধু বাংলায় লেখা হত, তখন মেদিনীপুর ও শ্রীহট্টবাসী পরস্পরের মুখের ভাষা না বুঝলেও, লিখতেন একইরকম। 'তুমি কবে পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে জানাইও।' 'সে উন্মত্ত পাগলের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল।' লেখার পক্ষে একটা মান্য রীতি ছিল। রীতিটা এতই মান্য যে, শ্রীহট্টবাসী এবং মেদিনীপুরবাসী কেউই তাঁদের মুখের ভাষাটাকে লিখবার সময় ব্যবহার করার কথা ভাবতেন না। আর যা-ই হোক, এতে একটা সমতা ছিল। চলতি বাংলায় লেখা শুরু হওয়ার পর সমতাটা ভেঙে গেল—তাকে আজ পর্যন্ত ঠিক করা গেল না। এ কথা অবশ্যই বলছি না যে, সাধু বাংলায় ফিরে গিয়ে আবার সমতা আনা হোক। উদ্ধৃতিবদ্ধ প্রথম বাক্যটা এখনও যতরকমভাবে লেখা হয় তা দেখানো যেতে পারে। 'তুমি কবে আসতে / আ'সতে / আসতে' পারবে / পা'রবে / পারবে' জানিও / জানিয়ো'। দ্বিতীয়টি—'সে উন্মত্ত পাগলের মত / মতো আচরণ করতে / ক'রতে / করতে' লাগল / লাগল' /লা'গল / লাগলো'। ঊর্ধ্ব কমা দেওয়ার রেওয়াজ কমেছে, তবে অসমাপিকা ক্রিয়াতে ওটা এখনও দিচ্ছেন অনেকেই। ক'রে, করে'; বলে, ব'লে। ক্রিয়াপদের শেষের ও-কার, কখনো সামনেরও, সমানে-সমান চলছে। হল / হলো / হোলো, করব / করবো / কোরবো, বলল / বললো / বোললো, ধরব / ধরবো / ধোরবো। যদিও বল্ল, বোল্লো, বোল্ল দেখা যায় না। কর্ছে, পার্ছে-ও চলে গেছে। কোনটা হওয়া সংগত? 'হল' না 'হলো'? 'বলল' না 'বললো'? ইংরেজি 'হল' আর বাংলা 'হল' গুলিয়ে যাবে বলে অনেকেই 'হলো'-র দলে। এই যুক্তি বেশি দূর টানা যায় না। কারণ ভিন্নার্থক এবং সমরূপ শব্দ ভাষা থেকে তাড়ানো যাবে না। প্রসঙ্গ থেকে মানে বুঝে নিতে হবে। 'হইল', 'বলিল', 'করিব', 'আনিয়াছ' প্রভৃতি সাধু রূপে ও-কার দেওয়ার কথা ওঠেনি। উচ্চারণে হইল্, বলিল্, করিব্, আনিয়াছ্ হয়ে যেতে পারে—এ আশঙ্কাও ছিল না। চলিত ভাষায় পরিবর্তনের জন্য মাঝের 'ই' 'ই-কার' চলে গেল। ফাঁকা জায়গায় কিছুদিন ঊর্ধ্ব কমা থাকল 'ই'-র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। কিন্তু শেষে ও-কার কেন? 'বলিল'-র স্বরান্ত উচ্চারণে ও-কার না লাগলে বলল-তেও তা লাগার কোনো কারণ নেই। ও-কার ছাড়াই লেখা হোক।

ঐ বনাম ওই

কপি সম্পাদনা করে, অসংগতি দূর করে, আগে থেকে হাউস স্টাইল ঠিক করে বাংলা বই ছাপানোর কথা প্রথম চিন্তা করে বিশ্বভারতী। এবং এখনও পর্যন্ত ওই একটি সংস্থাই ওই কাজ করে চলেছে, অন্য কোনো প্রকাশক ও পথে যান না। বিশ্বভারতীর অনেক বইতেই রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির ছবি পাই। তাতে যা আছে, আর যা ছাপানো আছে, এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বস্তুত, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখাই সম্পাদনার পর ছাপা হয়েছে। এ কাজ তিনি নিজেও যেমন করেছেন, অন্যেরাও করেছেন তার চাইতে বেশি। ফল খারাপ হয়নি। 'এমনকী' বানানে 'কী' না 'কি' তা নিয়ে বিতর্ক আজও শেষ হয়নি। কিন্তু বিশ্বভারতীর নির্দেশ 'এমন হাইফেন কি কমা', অর্থাৎ 'এমন-কি,'। সব বইতেই একইরকম। কিন্তু বিশ্বভারতীর ছাপা রবীন্দ্রনাথের বইয়ে গদ্য লেখাতে 'ঐ', কবিতা ও গানে 'ওই'। গল্পে 'ঐ দুর্বল লোকগুলি', 'ঐ-যে', 'ঐখানে', 'ঐটে'। গানে 'ওই আসনতলের'। কবিতায় 'ওই শুন দিশে দিশে...'। বিশ্বভারতী প্রকাশিত *সভ্যতার সংকট* বইয়ের শেষের গান 'ঐ মহামানব আসে'। গীতবিতানে এটিই 'ওই মহামানব আসে'। কবিতায় কিংবা গানে ছন্দের প্রয়োজনে 'ঐ'-কে 'ওই' করতে হয়েছিল, এটাও সর্বাংশে সত্য নয়। অবশ্য এখনকার লেখাতে 'ঐ' বিশেষ দেখা যায় না। আগে ছিল যথেষ্টই। প্রশ্ন কিন্তু সেটা নয়। 'ঐ' এবং 'ওই' দুটো শব্দই কি ঠিক? 'ঐ' বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করেছেন—ওঁরা কি জানতেন না? সে তর্কে যাব না। বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যাক। 'এ' একটা সর্বনাম। 'এ আমার ভাই'। 'ও' আর একটা সর্বনাম—একটু দূরের ব্যক্তি বস্তু বোঝাতে কাজে লাগে। 'যার কথা বলছেন ও আমার ছাত্র'। একটা আলগা 'ও' শব্দের পরে বসিয়ে শব্দটাতে জোরও দেওয়া হয়। 'খুব বৃষ্টি, একটা লোকও নেই রাস্তায়'। সর্বনামেও তাই। 'তিনিও আসবেন না মনে হচ্ছে'। এইরকম 'ও' 'এ' এবং 'ও'-র সঙ্গেও লাগানো যায়। 'এও ফেল করবে, ও-ও ফেল করবে'। আলগা 'ই'-ও বিশেষীকরণের কাজে লাগে। 'আমিই তো করলাম কাজটা'। 'কথাটা বলেই ফেললাম'। 'কী খেলাই না খেলল অভিজিৎ'। এইরকম 'ই' 'এ' কিংবা 'ও'-র সঙ্গেও লাগে। 'এই সেই বোধিবৃক্ষ'। 'এই তো তোমার আলোকধেনু'। ও-র সঙ্গে লাগলে হয় ওই। 'ওই তো ছাগলটা পাতা খাচ্ছে'। 'ওইখানে বাঘ থাকে'। 'ওই যায় মধুমাস্টার'। 'ওই মালতীলতা দোলে'। দেখা যাচ্ছে 'এই' এবং 'ওই' একই গোত্রের—একটা কাছের, অন্যটা দূরের। 'এই' দ্বিস্বর ধ্বনির জন্য কোনো বর্ণ নেই। 'ওই'-এর জন্য আছে—'ঐ'। সম্ভবত এ-কারণেই ওই-এর বদলে 'ঐ' লেখা হত কিংবা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 'ওই' লেখাই যুক্তিসংগত।

মত এবং মতো

বিশ্বভারতীর আর একটি রীতি এখনও নানান জায়গায় দেখা যায়। সদৃশ অর্থে 'মতো'-র কোনো স্থির বানান নেই। আলাদাভাবে লিখলে 'মতো'—'তোমার মতো এমন

টানে...', 'চাপা গলায় কান্নার মতো', 'আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো'। আবার 'রীতিমত', 'দস্তুরমত'। হাইফেন হলে আবার ও-কার। 'দস্তুর-মতো'। কারণটা জানবার সুযোগ হয়েছিল। আলাদা 'মত' লিখলে কেউ 'মৎ' পড়তে পারেন, তাই 'মতো'। 'রীতিমত'-কে কেউ নাকি 'রীতিমৎ' পড়বেন না। অতএব ও-কার অপ্রয়োজন। যুক্তিটা খুব টেকসই নয়। কে কী উচ্চারণ করবেন তার ওপর বানান নির্ভর করবে কেন? 'মতো' শব্দের যদি ও-কার-ওয়ালা বানানই হয়, তবে সবক্ষেত্রেই এক হবে। বিশ্বভারতী অবশ্য তাদের রীতি সর্বত্র ধরে রাখতে পারেনি। 'ঠিকমতো', 'বিধিমতো'-ও পাওয়া যায় অনেক জায়গাতেই। কোনো কোনো খবরের কাগজ অবশ্য 'মত'-ই লেখে: 'কোক-পেপসির মত বারোটি পানীয়...'। কিন্তু কী হওয়া উচিত? বিধান দেওয়ার জায়গায় আমি নেই—নিজে 'মতো' লিখি, আরও অনেকে লিখছেন। প্রকাশিত বানান অভিধানগুলোতেও 'মতো'। হোক রীতিমতো, রামের মতো, দস্তুরমতো।

তর, তরো

ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম। তারতম্যের এই তর, তম-তে ও-কার নেই। 'কে গো অন্তরতর-সে'। হঠাৎ মনে হয় এটা তারতম্যের তর। 'অন্তরতম'-ও করা চলে। কে গো অন্তরতম সে—এটাও হয়। কিন্তু কে গো অন্তব সে—হবে না। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, যেমন, ঠিক তেমন নয় অন্তর, অন্তরতর, অন্তরতম। প্রথমত অন্তর বিশেষণ নয়। তা ছাড়া যদি শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ কবতেই হয়, তবে মাঝামাঝি 'তর' কেন, 'তম'-ই তো লাগসই হত। নিশ্চিত যে, অন্তরতর-তে তারতম্যের 'তর' নয়, তরণ-এর তর। 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—'। অন্তরতর হল মনকে যিনি উন্নত করতে পারেন, অন্তরকে তরিয়ে দেন আর কী।

কিন্তু 'এই-যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো', এই এমনতরো-র 'তরো'? তরো মানে কী? প্রকারের, ধরনের। তিনরকম, নানারকম হয়। এমনরকম, তেমনরকম হওয়ানো যায়, একটু জোর করেই যদিও। কিন্তু তিনতরো, নানানতরো জোর করেও হওয়ানো যায় না, অন্তত এখনও পর্যন্ত। এমনতরো, তেমনতরো, কেমনতরো, অমনতরো—এইরকম কয়েকটি শব্দই পাওয়া যায়। কিছু অভিধানে একই অর্থে তর, তরো দু-রকমই আছে। আমরা '-তরো'-ই ব্যবহার করব।

কী, কি

প্রশ্নটা প্রায়ই শুনি—কখন 'কী', কোথায় 'কি'? এককথায় না হলেও, এর উত্তর দেওয়া যায়। কি অথবা কী কোনো-না-কোনো প্রশ্ন করে। উত্তর যদি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' তবে 'কি'। অন্য কিছু হলে 'কী'। যেমন 'তোমার নাম কী'? এর উত্তর নিশ্চয়ই 'হ্যাঁ' অথবা 'না' নয়। উত্তর হতে পারে, 'আমার নাম অবভাস মিত্র'। প্রশ্ন, 'তোমার নাম কি

অবভাস মিত্র?' এর উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। এইখানে 'কি'। প্রথম প্রথম জিনিসটাকে গোলমেলে লাগে। আর আমরা তাকে আরও গোলমেলে করে দিই এইসব বলে: যখন প্রশ্নবাচক অব্যয়, তখন 'কি'; প্রশ্নবাচক সর্বনাম হলে 'কী'। তা এটাকে অনেক অভ্যাস করে না হয় 'কি' 'কী' ঠিক হল, কিন্তু সেকি না সে কী না সে কি; এমনকী না এমনকি; বইকি, বইকী, বই কী, বৈকি, বৈ কি, বৈকী—কোনটা? সবগুলোর জন্যই যে বিকল্পহীন বিতর্কহীন সমতায় পৌঁছোনো গেছে এমন বলার দিন এখনও আসেনি। তবে অনেকটাই বলা যায়। সে কি আসবে?—হ্যাঁ কিংবা না। সে কি খাবে?—হ্যাঁ কিংবা না। সে কী খাবে?—ভাত না রুটি? সেকী, এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। এমনকি, এমনকী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। মনে হচ্ছে 'এমনকী' হবে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি না।

'বই কী' হবে, বড়োজোর 'বৈ কী'। মাঝের ফাঁক এবং 'কী' বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? কতকগুলি উদাহরণ নেওয়া যাক। কানু বিনা গীত নাই। কানু বই গীত নাই। কানু ছাড়া গীত নাই। সব বাক্যেরই এক অর্থ। অতএব, বিনা = বই = ছাড়া। প্রশ্ন করা যাক। কানু বিনা কী নেই? কানু বই কী নেই? কানু ছাড়া কী নেই? এর কোনোটারই উত্তর হ্যাঁ অথবা না নয়। অর্থাৎ এই 'কী' সর্বনাম। উত্তর হবে 'গীত'। সে যাবে বই কী? খাবে বই কী? যাওয়া ছাড়া আর কী করবে? খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ করবে? তাহলে 'কী' হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 'বই' না 'বৈ'? আমি মনে করি 'বই'। আবার বইকী না বই কী? আবারও উদাহরণ নেওয়া যাক। 'কানু বিনাকী'—হয় না। 'কানু ছাড়াকী'—হয় না। অতএব 'কানু বইকী'-ও হবে না। 'বই কী' অর্থাৎ ফাঁক দিয়েই লিখতে হবে।

কেন এইসব বিচ্ছিন্ন উদাহরণ?

খুব যে বিচ্ছিন্ন উদাহরণ তা বলা যায় না। এইভাবে বিচার করে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়, তা দেখানোই উদ্দেশ্য। এইভাবে এগোলে আরও অনেক প্রশ্নেরও মীমাংসা করা যায়। যেমন, বড় না বড়ো? বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর 'বড়' লিখেছেন। এখনও প্রায় সব বাংলা সংবাদপত্রেই 'বড়' লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বড়ো' লিখেছেন। বিশ্বভারতীর বইতেও তা-ই। সমতার জন্য যদি কোনো একটাকে বেছে নিতে হয় তো কোনটাকে নেব? কীভাবে এগোনো যায়? মনে করা যাক এইভাবে এগোব। বানানের সঙ্গে যদি উচ্চারণ মিলিয়ে দেওয়া যায়, ভালোই হয়। দেখা যাক। দুই বর্ণের বাংলা শব্দ. ব্যঞ্জন বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ, যার শেষের ব্যঞ্জনটি 'ড়'—এমন কত শব্দ আছে বাংলায়? খড়, গড়, চড়, ছড়, জড়, ঝড়, দড়, ধড়, নড়, পড়, বড়, ভড়, লড় প্রভৃতি। এর সব ক-টারই উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত, অর্থাৎ খড়্, গড়্, প্রভৃতি। তিনটি ব্যতিক্রম—দড় (দড়ো), বড় (বড়ো), জড় (জড়ো)। এর মধ্যে 'জড়' শব্দ তৎসম। ওর বানান পালটাবে না। বড়ো, বড় দুটি প্রচলিত বিকল্প থেকে 'বড়ো'-কে মেনে নিলে, এবং 'দড়ো' (বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়ো) লিখলে সমতা আনা যায়। ঠিক এইরকম কারণেই 'ভালো'। এখনও অনেকেই ভালো-র জায়গায় 'ভাল' লেখেন।

খবরের কাগজগুলোতেও 'ভাল'। বঙ্কিমে 'ভাল', বিদ্যাসাগরে 'ভাল'। রবীন্দ্রনাথে 'ভালো'। আমরা কী করব? আবারও পরীক্ষা হোক। ওইরকম শব্দ খোঁজা যাক। কাল, খাল, গাল, চাল, ছাল, জাল, ঝাল, টাল, ডাল, ঢাল, তাল, থাল, দাল, নাল, পাল, বাল, মাল, শাল, সাল, হাল—সবগুলোর উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ কাল্‌, খাল্‌, প্রভৃতি। তাই 'ভাল' লিখে এবং 'ভালো' উচ্চারণ করে শব্দটাকে দলছুট করে রাখব কেন? তা ছাড়া 'ভাল' একটা পৃথক শব্দও বটে, তবে ওটা কোনো বড়ো কথা নয়, কারণ সমরূপ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বাংলায় আছে ও থাকবে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ভালো, সেই কারণেই আমরা 'ভালো' লিখছি না, আবার বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন বলেই আমরা 'ভাল'-ও লিখছি না। যুক্তির বিচারেই 'ভালো' হচ্ছে।

সর্বত্রই এমন যুক্তি দেওয়া যাবে, তা নয়। কিন্তু অনেক জায়গাতেই যাবে। যেমন কোনো, কখনো বনাম কোনও, কখনও। বাংলা সংবাদপত্রে পাই এখনও কোনও কখনও। বাংলা আকাদেমির অভিধানে বিকল্প রয়েছে, অর্থাৎ কোনো, কোনও; কখনও, কখনো। সম্প্রতি ২০০৩ সালে আকাদেমি বানানবিধিতে অবশ্য কোনো, কখনো সুপারিশ করা হয়েছে। জানি না অভিধানের চতুর্থ সংস্করণে সুপারিশ কাজে লাগানো হবে কি না।

আমি কোনো, কখনো লিখতে চাই, যুক্তি তা-ই বলে। সেটা এরকম।

'কোন্‌' শব্দের মানে which, 'কোন' শব্দে 'ও' যোগ করলে 'কোনো' বলতে যা বোঝায় তা হয় না। এইরকম আলগা ও-লাগানো আরও কিছু শব্দ দেখা যাক। তখন-তখনও; এখন-এখনও; এমন-এমনও; তেমন-তেমনও। কিংবা তখনই, এখনই, এমনই, তেমনই। তখনও, এখনও, তেমনও—এদের পরে আর 'ই', 'টা', 'টি' লাগে না। কিন্তু কোনো, কখনো-র পরে লাগে। খবরের কাগজে দেখি কোনওটা, কখনওই, দেখতে শুধু খারাপ নয়, ভুলও বটে। কোনো, কোনোটা, কোনোটাই, কোনোটার, কোনোটারই, কোনোটারও—সব চলে। আলগা-ও দিয়ে কোনও লিখতে হলে এগুলো দাঁড়াবে—কোনও, কোনওটা, কোনওটাই, কোনওটার, কোনওটারই, কোনওটারও, এমনকী কোনওটাকেও। 'তখন' থেকে যে-রীতিতে 'তখনও', 'তখনই', 'কোন' থেকে সেরকম রীতিতে 'কোনও' হয় না। তাই তখনো, তখনি, এখনো, এখনি লিখব না, এখানে আলগা 'ও' এবং 'ই'। 'কখনও' হবে না, হবে 'কখনো', কারণ 'কখনোই' লিখতে হতেই পারে। এইরকম আরও অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে। তাদের মীমাংসার প্রথম ধাপ হিসেবে একটা বইও তৈরি হচ্ছে।

কতকগুলি শব্দ

যারা ফুটফাট ইংরেজি বলেন তাঁদের কথা বলছি না, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, এমনকী গ্রামের মানুষের মুখ থেকেও কতগুলো বাংলা শব্দ চলে গেছে। যেমন সময়, টুকরো, বিশ্রাম, ও আরও অনেক। ধারাটা দেখানোই উদ্দেশ্য, শব্দগুলো নয়। তাই

উদাহরণ বাড়াব না। সময় হয়েছে টাইম। ক-টা বাজে এখন হয়েছে টাইম কী হল। টুকরো হল পিস—দু-পিস মাছ, এক-পিস পাউরুটি। বিশ্রাম হল রেস্ট—রেস্ট নে নে কাজ করবি। একটু শিক্ষিত ঘরে কারো বয়স জিজ্ঞাসা করলে তেয়াত্তরে কি আশি সালে জন্মেছে বলা উঠে গেছে। সেভেন্টি থ্রি বর্ন, এইট্টি বর্ন। এক স্কুলবালিকা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ কবে বর্ন করেছিলেন। আমরা আমোদ পেয়েছি। কিন্তু নিজেদেরই অজান্তে বলে ফেলছি, 'তিনজনকে বললাম, কেউ টার্ন আপ করল না'। অভিধানের কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত। এসব বই ক্রমাগতই সংশোধন করতে হয়। কোনো একটা বাংলা অভিধানের প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠার এখানে-ওখানে দাগিয়ে পাঠালাম প্রেসে। ওঁরা ঠিকঠাক করে বইটা ফেরত পাঠালেন। দেখলাম, দাগানো জায়গাগুলোতে আবারও দাগ পড়েছে 'carry out হয়েছে'। 'কেনকী' প্রায় হটিয়ে দিয়েছে 'কেননা'-কে।

নেই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ব্যাকরণ-অভিধান বিষয়ে সেমিনার। বক্তারা হাহাকার করলেন একের-পর-এক। আমাদের অভিধান নেই, যা আছে তা পুরোনো, কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। ইংরেজিতে কত আছে, কত ধরনের অভিধান কত নতুন কায়দায় লেখা হচ্ছে, কতরকম স্তরের জন্য হচ্ছে তা-ও বক্তারা বললেন। বার বার উচ্চারিত হল অক্সফোর্ড, কলিনস, ওয়েবস্টার, চেম্বারস্। আবিষ্কার করলাম ভালো অভিধানে কী কী থাকতে হবে, কোথায় আমাদের খামতি, কেমন করে তা পূরণ করা যায় এ বিষয়েও বক্তারা সচেতন। তৎসত্ত্বেও নেই কেন?

এই কথাটাই ভাবছিলাম। ১৮৫৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত অভিধান তৈরির কোনো উদ্যোগ তাঁরা নেননি। দেশের প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়ই যদি ১৪৬ বছরেও এ কথা না ভাবে, তবে হবেটা কোত্থেকে? এখন তো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোজেক্টের বান ডেকেছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো প্রোজেক্টের কথা কি শোনা গেছে?

আসুন, ওদের আছে আর আমাদের নেই, এবং উলটোটা, আমাদের আছে কিন্তু ওদের নেই—এটার একটা তুলনামূলক বিচার হোক। ওদের কবিতা উপন্যাস গল্প আছে। আমাদেরও আছে, বরং একটু বেশিই আছে। ওদের গান বাজনা ছবি আছে, আমাদেরও আছে। ওদের অভিধান-সহ নানানরকম রেফারেন্স বই আছে, আমাদের নেই। আমাদের ফুটপাতে অজস্র শিব, হনুমান, শনির মন্দির আছে, এবং তাদের সংখ্যা ও রমরমা যাকে বলে গিয়ে বর্ধিষ্ণু, ওদের নেই। আমাদের পাড়ায় রাস্তার ওপর দোতলা-তিনতলা ক্লাব আছে, ওদের নেই। আমাদের টাকার অভাব আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্গাপূজা কালীপূজায় যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের ইমারত সাতদিনের জন্য

তৈরি করে ভেঙে ফেলা হয় তার জন্য টাকা ঠিকই জোটে। এটা ওদের নেই। আমাদের এবং ওদের এই আছে-নেই খেলাটা মোটামুটি ড্র হয়ে যায়। পড়ে থাকে একটা সারসত্য, আমরা যা পেরেছি সেটাই আমরা পারি। যেটার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি, অথচ আমাদের নেই, তার একটাই কারণ ওটা আমাদের সাধ্যের বাইরে। সবাই তো আর সব কাজ পারে না, এতে হাহাকার করারও কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। নতুন করে উদ্যম নেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কেউ নিলে নিতেও পারেন। ইউ.জি.সি.-র পয়সায় আয়োজিত সেমিনারে হাহাকার করা যেতেই পারে, শুধু পারে নয়, যেতেই হবে। কারণ এইসব সেমিনার-টেমিনার না করলে অধ্যাপকদের মাইনে বন্ধ করার আইন চালু হয়েছে; আমরাই চালু করেছি, কেননা সেটাই আমরা পারি।

এই যে কতগুলো উদাহরণ বিক্ষিপ্তভাবে নিয়ে এই লেখাটা শুরু করেছিলাম, তাদের সম্পূর্ণতা দেওয়া গেলে একটা বড়োসড়ো বই হতে পারে। যেমন নাকি ‘কেম্ব্রিজ ম্যানুয়াল’, ‘শিকাগো ম্যানুয়াল’। বাংলাতে এই ধরনের একটা বইয়ের খুব প্রয়োজন। কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি প্রেস ‘ইজ এ পার্ট অব দ্য ইউনিভারসিটি অফ কেম্ব্রিজ’, যার কাজ হল বিদ্যার প্রসার ঘটানো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এ ধরনের কাজে উৎসাহিত হয়নি। আর তা থেকেই সিদ্ধান্ত করা যায় তারা উৎসাহিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিও হবে বলে মনে হয় না। ওদের প্রেফারেন্সের তালিকায় এ জিনিস নেই। ফলে কোনো একজন দু-জনকেই করতে হবে এ কাজ। তাঁকে করে দেখাতে হবে যে, তিনি এ কাজ পারেন। উলটোটাও হতে পারে, তাঁর কাজ দেখে মনে হতে পারে যে, কাজটা করেই তিনি প্রমাণ করলেন যে, ও কাজটা তিনি পারেন না। এমন হয়েওছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে।

প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে একটি পত্র ও কয়েকটি প্রবণতা

শুভেন্দু দাশমুন্সী

এক

সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত সুধীন্দ্রনাথের *সংবর্ত* বইটির প্রচ্ছদ নিয়ে কিছু ভেবেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন প্রকাশক সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তকে একটি চিঠিতে। চিঠিটির তারিখ ১১ মে ১৯৫৩ সাল। প্রকাশক কবির কাছে তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য যে-নকশাটি পাঠিয়েছিলেন, কবি আর কবিপত্নীর দুজনেরই মনে হয়েছিল সে নকশাটি 'একটু বেশি ঘিঞ্জি'। তার বদলে তাঁরা তুলনামূলকভাবে সরল দুটি নকশার কথা বলেছিলেন। সেই দুটি নকশার একটি আবার সুধীন্দ্রনাথ চিঠির মধ্যে এঁকেও পাঠিয়েছিলেন। ছবির সঙ্গে জানিয়েছিলেন প্রচ্ছদে তাঁর কোন রং পছন্দ। অন্য নকশাটির কথা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র।

বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ-বৃত্তান্ত শোনাতে বসে শুরুতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-রাজেশ্বরী দত্ত প্রসঙ্গ টেনে আনা কেন? কেনই বা *সংবর্ত*-র প্রচ্ছদ বিষয়ে তাঁদের ভাবনার কথা পাড়া? আসলে লক্ষ করলে দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে যেভাবে ভাবছিলেন, সেই ভাবনার গতিপথেই বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদভাবনার একটা রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দেখা যাবে আমাদের প্রচ্ছদ বিষয়ক ভাবনার মধ্যে যেমন একটা স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা আছে, তেমনই আছে মোটামুটিভাবে একটা বাঁধা গড়নের ব্যাপারও। এই প্রথানুগত্য আর স্বাতন্ত্র্যসৃষ্টির টানাপোড়েনেই এগিয়েছে বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ।

সুধীন্দ্রনাথের চিঠিখানা পড়বার আগে বলে রাখা দরকার, আমাদের ধারণা সুধীন্দ্রনাথ যে-নকশাটিকে 'একটু বেশি ঘিঞ্জি' বলেছিলেন, সম্ভবত সেটিই ছিল *সংবর্ত*-র প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ—এঁকেছিলেন শুভেন্দু বসু। আর সুধীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত দুটি নকশার প্রথমটি অবলম্বনে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদটির পরিকল্পনা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। দিলীপকুমার গুপ্তকে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> মলাটের নকশা একটু বেশি ঘিঞ্জি মনে হচ্ছে। একটি মাত্র মোটা লাইন যদি কম্বুরেখায় পটের উপর থেকে নীচে নামে, প্রথম কুণ্ডলীতে বইয়ের নাম, দ্বিতীয়টিতে লেখকের স্বাক্ষর এবং তৃতীয়টিতে প্রকাশকের মুদ্রা নিয়ে—তাহলে কেমন দেখাবে?

পটভূমিতে শ্লেটের রং আর রেখা ও অক্ষর সাদাতে ছাপা যেতে পারে। কতকটা এরকম—
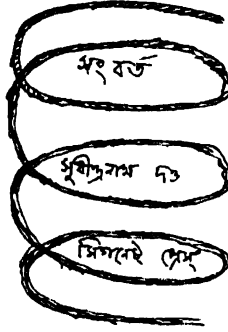
আইডিয়াটা আমার স্ত্রীর...মলাটের জন্যে উল্লিখিত নকশাটা যদি অচল ঠেকে, তাহলে মাঝখানে স্থূল কালো রেখায় একটা স্পাইরেল এঁকে উপরে ও নীচে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দিলেও হয়ত চলতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রস্তাবিত প্রথম প্রচ্ছদটিতে বইয়ের নাম আর লেখকের নামের সঙ্গে রাখতে বলেছিলেন প্রকাশন সংস্থার নামও। এর সঙ্গে লেখকের নামের জায়গায় পরামর্শ দিয়েছিলেন লেখকের স্বাক্ষর ব্যবহার করবার। অথচ ১৯৫৩ সালে বাংলা বইতে প্রচ্ছদে প্রকাশন সংস্থার নাম রাখবার রেওয়াজ তো প্রায় উঠেই গেছে আর লেখকের নামের জায়গায় তাঁর স্বাক্ষর ব্যবহারের একটা নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইগুলিতে যে-ধরন দেখা গেছে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকল্প যেটি পরে গ্রহণও করেছে। সুধীন্দ্রনাথের *উত্তর ফাল্গুনী*-র প্রচ্ছদেও এর আগে সেই ধরনটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে, সুধীন্দ্রনাথ সম্ভবত কিছুটা অসচেতনভাবেই একইসঙ্গে একটি সমকালীন আর একটি প্রাক্তন ধরনকে ব্যবহার করতে বললেন *সংবর্ত*-র প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদপটে কী, কী বিষয় উল্লিখিত হবে তার একটা ধারাবাহিক ফিরিস্তি তৈরি করা সম্ভব অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর নামপত্ররূপী প্রচ্ছদগুলি থেকে। সাধারণভাবে দেখা যাবে, গ্রন্থনাম আর গ্রন্থকারনামের সঙ্গে প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, মুদ্রকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, এমনকী বইটির দামও উল্লিখিত হত প্রচ্ছদেই। এর সঙ্গে কখনো গ্রন্থনামের নীচে সংরূপ, কখনো গ্রন্থকার পরিচিতি, কখনো গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্দেশক শ্লোক বা পয়ার আবার কখনো ছাপা বইয়ের পরিমাণও উল্লিখিত হতে দেখা গেছে। বইটি যদি কোনো অভিধান বা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত হয়, তাহলে বাংলা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা বিষয়টারই একটা ইংরেজি অনুবাদও করা থাকত। আবার নাটকের বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম নাট্যাভিনয়ের স্থান-কাল লেখা হত, তেমনই কোনো উপন্যাস

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিক হলে উল্লিখিত হত তা-ও।

প্রচ্ছদপটের ও নামপত্রের এই তথ্য সমাবেশকে বিভিন্নভাবে দেখা সম্ভব। যেমন, প্রথমত, ভাবা যেতে পারে বইকেও প্রথম থেকেই আর পাঁচটা শিল্পোৎপন্ন বস্তুর মতোই একটি বিশেষ পণ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কারণেই শুধু গ্রন্থালোচিত মুখ্য বিষয়টি ছাড়াও এর নির্মাণবৃত্তান্তও পাঠকের কাছে জানানো সমান দরকারি মনে হয়েছে। আবার দ্বিতীয়ত, তথ্য জানাবার সূত্রেই বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ হয়েও 'বই' যে স্বতন্ত্র একটি সত্তা সে সম্পর্কে ওয়াকিফ থাকতে হয়েছে বইয়ের প্রকাশক, মুদ্রক, পাঠক, সকলকেই। তৃতীয়ত, বিদেশিদের গ্রন্থ-পরিকল্পনায় তৈরি হওয়া বাংলা বইয়ের গ্রন্থ-পরিকল্পনা প্রথম থেকেই বিদেশীয় গ্রন্থ নিয়ন্ত্রিত। ফলে, কোনোদিনই বাংলা বইয়ের স্বতন্ত্র কোনো গড়ন আর গড়েই ওঠেনি। অর্থাৎ, সাধারণভাবে বাংলা পুথিতে লেখক নাম-লিপিকর নাম-রচনাকাল-রচনাস্থান-অনুলিপিকাল উল্লিখিত হত পুথির শেষ পৃষ্ঠায় লেখা পুষ্পিকায়। ইংরেজি বইয়ের আদর্শে বাংলা বইয়ের পরিকল্পনা হওয়ায়, বাংলা তথা ভারতীয় বইয়ের গোটা চেহারাটাই একটা অন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। চতুর্থত, প্রচ্ছদে সন্নিবিষ্ট তথ্যাদিকে বইয়ের বিভিন্ন অংশে ক্রমশ ছড়িয়ে দেওয়ার ইতিবৃত্তই পরবর্তী বাংলা গ্রন্থ পরিকল্পনা বা বুক ডিজাইনের ধারাবাহিকতা তৈরি করেছে। এই চারটি দিক নিয়েই বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা আপাতত মন দেব এর চার নম্বর বিষয়টিতে। কীভাবে প্রচ্ছদেব তথ্যাবলি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল বইয়ের মধ্যে আর কীভাবেই বা এর ফলে প্রচ্ছদপটে তৈরি হওয়া শূন্যস্থান ভরে উঠল নতুনতর উপাদান দিয়ে।

দুই
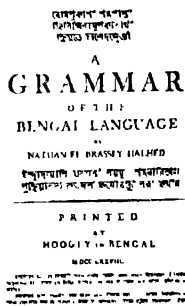
হলহেড প্রণীত ব্যাকরণ (১৭৭৮) *আইন-গ্রন্থ (১৮২৮)* *কবি-কাহিনী-র নামপত্র (১৮৭৮)*
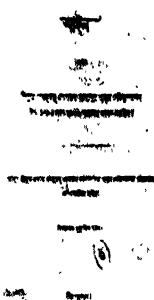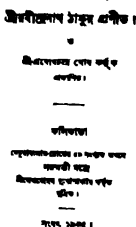
১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হল হলহেডের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, এখানেই প্রথম ব্যবহৃত হল বাংলা বিচল হরফ বা মুভেবল টাইপ। তার পঞ্চাশ বছর

পর, ১৮২৮-এ প্রকাশিত হল *আইন* বইটি, আর তার পঞ্চাশ বছর পরে ১৮৭৮-এ প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই *কবি-কাহিনী*। নামপত্র তিনটি পাশাপাশি রাখলে চোখের দেখায় হরফের বৈচিত্র্য ছাড়া বিষয়বিন্যাসে বিশেষ তারতম্য চোখে পড়বে না। উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলিকে পাতার ঠিক মাঝখানে, দুদিকে সমান ফাঁক রেখে লম্বালম্বি সাজানো। শুধু হরফের মাপে তারতম্য ঘটিয়ে উল্লিখিত বিষয়াবলির গুরুত্বের তফাত ঘটানো হয়েছে। বইয়ের নাম সবচেয়ে বড়ো হরফে, তার চেয়ে ছোটো হরফে লেখকের নাম। প্রকাশক-মুদ্রকের নাম-ঠিকানা লেখবার জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে ছোটো হরফ। মাঝে বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা অঞ্চলে রাখবার জন্য ব্যবহৃত সরু-মোটা লাইন। কখনো বা অলংকৃত লাইন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। এক গ্রন্থনাম ছাড়া বাকি সমস্ত কিছু লেখবার জন্য পূর্ণবাক্য ব্যবহৃত। সে ১৭৭৮-এর বইতে 'বোধ-প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী'-ই হোক বা ১৮২৮-এ লেখা '*আইন* অর্থাৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরেল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের ইং ১৭৯৬ লাং [বাং] ১৮০১ সালের তাবৎ আইন। তাহা শ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে সংশোধিত হইয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।'-ই হোক; কিংবা ১৭৭৮-এ 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত'-ই হোক— পূর্ণবাক্যের সাহায্যে বিষয় প্রকাশের রেওয়াজই তখনও পরিচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা যাবে প্রচ্ছদের চারদিকে চওড়া সুন্দর সব বর্ডার ব্যবহৃত হচ্ছে, আর সেই বর্ডারের সৌন্দর্য যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেইজন্য যে-বাক্যগুলি প্রায় সম্পূর্ণত লেখা হত তাকে নানাভাবে ভাঙার কাজও আরম্ভ হয়েছে। বইয়ের ডিজাইন ঠিক রাখবার জন্য যদি একটা শব্দকে হঠাৎ ভেঙে পরের পঙ্‌ক্তিতে পাঠাতে হয় সে-ও ভি আচ্ছা, কিন্তু ডিজাইন ঠিক রাখতেই হবে। যেমন, ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের লেখা *গোলেবকাঅলি*-র প্রচ্ছদে (ও নামপত্রেও) দেখা যাবে লেখা রয়েছে:

পারস্য বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গভাষা
য় পয়ারাদি নানা চ্ছন্দে শ্রীযুক্ত
উমাচরণ মিত্র তথা শ্রীযুক্তপ্রাণ
কৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত হই
য়া ইদানীং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকা
রের অনুমত্যনুসারে
শ্রীরামপুর।
চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
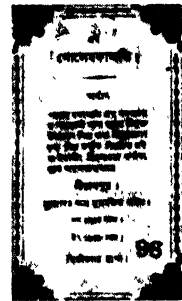
গোলেবকাঅলি-র নামপত্র (১৮৪৮)

পার্শ্ববর্তী ছবি দেখলেই বোঝা যাবে 'পারস্য বকাঅলি...মুদ্রাঙ্কিত হইল' বাক্যটিকে

নির্দিষ্ট প্রস্থের পঙ্‌ক্তিতে রাখবার জন্য প্রথম পঙ্‌ক্তির 'বঙ্গভাষায়' শব্দের 'য়'-কে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে পাঠানো হয়েছে আর ওই একই কারণে চতুর্থ আর পঞ্চম পঙ্‌ক্তির 'হইয়া' আর 'কর্ম্মকারের' শব্দের 'য়া' আর 'রের'-টুকুকে যথাক্রমে পঞ্চম আর ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে পাঠানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শেষ পঙ্‌ক্তিতে যে 'দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল' বা 'দ্বিতীয়বার ছাপা হইল'-র জায়গায় কেবল লেখা হল 'দ্বিতীয়বার ছাপা', সে-ও কিন্তু বিশেষ ডিজাইনটা মাথায় রেখেই। লক্ষণীয়, অন্য কোনো বাক্যে শেষ পঙ্‌ক্তিটি নামপত্রের দীর্ঘতম পঙ্‌ক্তি হয়ে পড়ত, যেটা ওই নকশাটির পক্ষে শোভন হত না। পাশের ছবিটি দেখে এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে 'চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল' পঙ্‌ক্তিটির প্রস্থ কেন বইয়ের নামপত্রে দীর্ঘতম রাখা হল? মনে রাখা দরকার সেকালের বইতে মুদ্রক-প্রকাশকের নাম লেখবার পর প্রকাশকাল সম্পর্কিত তথ্যাবলি একটি ছোটো লাইন বসিয়ে তার পর তার নীচে লেখা হত। এই বইয়ের প্রচ্ছদে অত চওড়া বর্ডারের পর মাঝখানে আরও একটি লাইন আঁকা দৃষ্টিকটু বলে এই দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিটিই ওই লাইনের কাজটি সেরে দিয়েছে।

হিন্দু কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটির সিলমোহর দেওয়া বই

স্কুল বুক সোসাইটি-কোম্পানি'স প্রেস আর হিন্দু কলেজ প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদে ছাপা হত তাদের নিজস্ব সিলমোহর। অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বইগুলিতে লক্ষ করা যাবে বিশেষ এক ধরনের বিন্যাস। সিলমোহরের বদলে প্রচ্ছদের বিশেষ এক
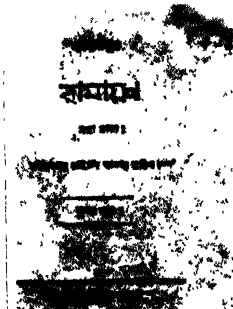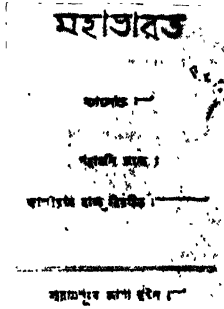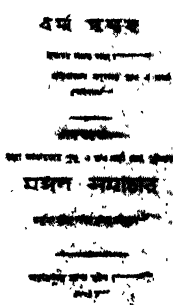
শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বইতে প্রকাশের স্থান ও কাল উল্লেখের বিশেষ ধরন

জায়গায় বিশেষভাবে লেখা বইয়ের প্রকাশস্থল ও প্রকাশকাল। প্রচ্ছদের নীচে একটা সরু লাইন বসিয়ে আর নীচে লেখা একটি পঙ্‌ক্তিতে: 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল'। পরের

পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশকাল। এই হরফে লক্ষণীয় হাতের লেখার একটা আদল রাখার চেষ্টা। সেই উদ্দেশ্যেই প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষে দীর্ঘ একটি তরঙ্গাকার রেখা টানা।

অন্যান্য প্রকাশনসংস্থা—যাদের নিজস্ব সিলমোহর ছিল, তাদের সিলমোহর বসাবার উদ্দেশ্যেই প্রচ্ছদে চিত্র সংযোজনের সূচনা। এই প্রকাশকের পরিচয়বাহী ছোট্ট চিত্রটিই পরবর্তীকালে হবে লেখকের পরিচয়বাহী আর আরও পরে তা হবে বিশেষ একটি বইয়ের পরিচয়-জ্ঞাপক। যে ছোট্ট ছবিটির ওপরে আর নীচে আগে থাকত গ্রন্থনাম-লেখকনাম এবং প্রকাশক-প্রকাশকাল যথাক্রমে, পরবর্তী সময়ে তার জায়গায় শুধু এল ওপরে গ্রন্থনাম ও নীচে গ্রন্থকারনাম। বিষয়টি একটু বিশদ করা দরকার। আগে দেখা যেত প্রকাশন সংস্থার সিলমোহর, পরে দেখা যাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তর বইতে বিশেষ একটি ধরনের ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাবে একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক ঘোড়া, অন্যদিকে প্রাচ্যের প্রতীক হাতি। মাঝখানে সূর্যকিরণে প্রস্ফুটিত পদ্ম। নীচে লেখা: শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যং বা সাধয়েয়ম্। যার অর্থ: মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

মধুসূদনের বইতে ব্যবহৃত সিলমোহর

গিরিশ ঘোষের বইতে তাঁর ছবি
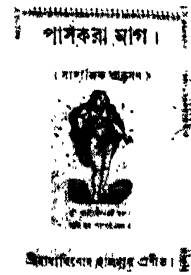
পাসকরা মাগ

অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটকের প্রচ্ছদে গিরিশচন্দ্রের ছবি ছাপাবার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে লেখকের পরিচয়ের সঙ্গে বইটির প্রচ্ছদচিত্রটি মিলিয়ে দেওয়া। আরও একটু পরে ১৯০২ সালে বটতলায় ছাপা রাধাবিনোদ হালদারের লেখা *পাসকরা মাগ* বইটির প্রচ্ছদ ও নামপত্র নিঃসন্দেহে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কারণ এখানে প্রকাশক বা লেখক নয়, বইটির বিষয়কেই সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। নামপত্রে নগ্ন নারী মূর্তি। পাতার ওপরে বইয়ের নাম তার নীচে সংরূপ নির্দেশ (সামাজিক প্রহসন)। মাঝখানে ছবিটি তার নীচেই ছোটো হরফে বিষয় নির্দেশ করে লেখা:

স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল।
পতি হয় পায়ের তল॥

আর সবচেয়ে নীচে শুধু লেখকের নাম। প্রচ্ছদ থেকে বর্জিত হয়েছে প্রকাশকের নামধাম-প্রকাশকাল। বস্তুত, ছুতমার্গ ছেড়ে, খোলা মনে দেখলে দেখব বিশ শতকের অনেক

কবিতার বই-ই কিন্তু এই গড়নটিতে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত যামিনী রায় পরিকল্পিত প্রচ্ছদে ওপরে গ্রন্থনাম আর নীচে গ্রন্থকারের স্বাক্ষর দিয়ে মাঝে একটি ছোটো ছবি ব্যবহার করা তো একটা বিশেষ প্যাটার্নই তৈরি করেছে। যামিনী রায়ের আঁকা *অন্নদাতা* (অমিয় চক্রবর্তী), *উত্তর ফাল্গুনী* (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) আর *হে বিদেশী ফুল* (বিষ্ণু দে) এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন*-এর প্রথম সংস্করণে শম্ভু সাহার প্রচ্ছদও মেনেছে এই গড়নটিকেই। আর এই ধরনটি সমকালীন অন্য একটি ধরনের সঙ্গে সুন্দর মেলানো হয়েছিল জীবনানন্দর প্রথম বই *ঝরা পালক*-এ। সেখানে দেখা যাবে জলপাই রঙের পুরু কাগজের ডানদিকের ওপরের কোণে আলাদাভাবে সাঁটা হয়েছে একটা নীল কাগজ, সেই কাগজে রিভার্সে বইয়ের নাম আর কয়েকটি ঝরে পড়ছে এমন পালকের ছবি। উনিশ শতকের শেষদিকে এক ধরনের বই তৈরি হচ্ছিল যার কাপড়ের বাঁধাইটাই ছিল নয়নলোভন বিষয়। সাধারণত লাল-নীল বা সবুজ কাপড়ে মোড়া বোর্ডে বাঁধা বই। এই কাপড়ের নীচে আবার হালকা নরম প্যাড দেওয়া। এর ওপরে সোনালি বা রূপোলি রঙে এম্‌বস্‌ করে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারনাম ছাপা। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করতে এসে একজন মনোযোগী সংগ্রাহক লিখেছেন: 'সে

যামিনী রায়ের আঁকা তিনটি প্রচ্ছদের বিশেষ গড়ন

বইয়ের মলাটের জাতই আলাদা—হাত দিয়ে অন্য অনুভূতি—সাজসজ্জার ঘনঘটায় যেন বনেদি রাজপুরুষের বেশ।' বলা বাহুল্য, এই ধরনটিই পরবর্তীকালে রচনাবলির প্রচ্ছদশিল্পের একটা আর্কেটাইপে পরিবর্তিত হয়েছে আর জমিতে ভারী সমতল আর কড়া রং ব্যবহারের এই ধরনটি *ঝরা পালক*-এর জমির একটা পূর্বসূত্রও বটে। এর সঙ্গে *ঝরা-পালক*-এর প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ রূপকার ওই পূর্বোক্ত গ্রন্থনামের সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার চিত্রসৃষ্টির গড়নটি মিলিয়ে দিয়েছেন।

আবার মনে করুন সুধীন্দ্রনাথ দত্তর চিঠিটিকে। বর্ণ পরিকল্পনায় তার একটা পূর্বসূত্র আছে *ঝরা পালক*-এ। আর প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খসড়াটির মৌলিক গড়ন আর যামিনী রায়ের প্রাগুক্ত প্রচ্ছদে উনিশ শতকের যে-গড়নটি ধারাবাহিক হয়েছে তার মৌলিক গড়ন কিন্তু হুবহু এক। মনে করে দেখুন সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন.

মাঝখানে স্থূল কালো রেখায় একটা স্পাইরেল এঁকে উপরে ও নীচে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দিলেও চলতে পারে।

অর্থাৎ এই পরিকল্পনা পার্শ্ববর্তী চিত্রের মতো।

সংবর্ত সুধীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত দ্বিতীয় নকশার সম্ভাব্য রূপ

তিন
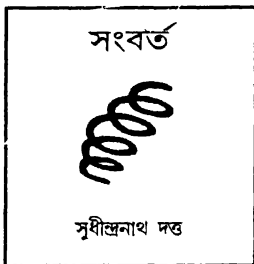
প্রচ্ছদশিল্পের এই গঠনগত ধারাবাহিকতাটি দৃষ্টির স্মৃতিতে ধারণ করলে বোঝা সম্ভব উনিশ আর বিশ শতকের প্রচ্ছদশিল্প একেবারে দুস্তর ব্যবধানে অনন্বিত নয়, বরং এ-ও এক ধারাবাহিক বৃত্তান্ত। বিশ শতকের শুরুতে যাঁরা প্রচ্ছদ করছেন তাঁদের চোখে রয়েছে উনিশ শতকের প্রচ্ছদ আর সেই সূত্রেই বিশ শতকের শেষে আর একুশের শুরুতেও সেই প্যাটার্নটি গড়িয়ে আসছে—পরিবর্তন ঘটছিল কিছু কিছু বিষয়ে আর নতুন কিছু কিছু কারিগরি শিল্পের অগ্রসৃতিতে। কিন্তু সে অন্য বৃত্তান্ত।

আমরা আগেই বলেছিলাম, সেকালের প্রচ্ছদে ও নামপত্রে উল্লেখনীয় বিষয়াবলির ক্রমহ্রাসমানতাই যেমন শূন্যস্থান তৈরি করছিল তেমনই ক্রমশ পূর্ণ করে তুলছিল ভেতরের পাতাগুলিকে। প্রচ্ছদে উল্লেখনীয় বিষয়াবলিকে বইয়ের ভেতরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে রাখবার চিন্তাই যে কেন বাংলা বইয়ের লে-আউট ডিজাইনের প্রথম ভাবনা এবার সে কথাটা একটু তলিয়ে দেখা যাক।
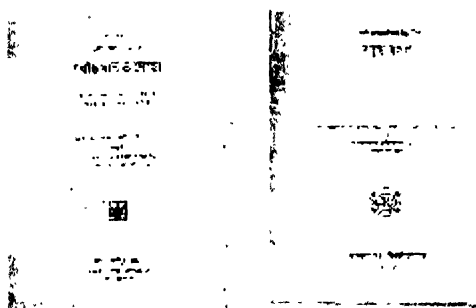
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বইতে পুরোনো প্রচ্ছদ রীতি প্রচলিত

বইতে মুদ্রণসংখ্যা উল্লিখিত, নীচে ডান দিকে লক্ষণীয়

এটা তো আমাদের অনেকেরই জানা যে, সেকালের প্রচ্ছদ আর নামপত্র বা আখ্যাপত্র দৃশ্যত আলাদা হলেও কার্যত একইরকম হত। দুই ক্ষেত্রেই বয়ান প্রায় একই—তাই কার্যত এক। কিন্তু প্রচ্ছদ তৈরি হত মূল বইয়ের থেকে অন্য রঙের কাগজে, কখনো প্রচ্ছদের বয়ান ছাপাও হত অন্য কোনো রঙের কালিতে—তাই দৃশ্যত আলাদা। সাধারণত সহজলভ্য লাল-গোলাপি বা হলুদ রঙের পাতলা কাগজে

বেশিরভাগ সময়ে কালো, নাহলে নীল বা খয়েরি বালাল কালিতে বয়ান ছাপা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বইগুলি এখনও ঐতিহ্যানুসরণ করে ওই গঠনটি, মায় প্রচ্ছদের নীচে প্রকাশনসংস্থা হিসেবে নিজেদের নাম-ঠিকানা উল্লেখসুদ্ধ ব্যবহার করে।

প্রচ্ছদপটে যে বইয়ের নাম-লেখকের নাম ছাড়াও প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম-ঠিকানা, বই ও লেখক সম্পর্কে দু-কথা, দাম আর প্রকাশকাল থাকত তা আমরা আগেই বলেছি। দেখেছি থাকত বইয়ের দাম, এমনকী *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* বইয়ে তার মুদ্রণসংখ্যাও উল্লিখিত। এখন দেখা যায় প্রচ্ছদ থেকে সেই তথ্যভার কমে এসেছে—লেখক ও বইয়ের নাম ছাড়া প্রকাশকের সিলমোহর আর নামটুকু গেছে আখ্যাপত্রের নীচে, পরবর্তী মুদ্রকপত্রে গেছে প্রকাশক-মুদ্রকের নাম-ঠিকানা-প্রকাশকাল-সংস্করণ বিষয়ক তথ্যাদি আর দাম। মুদ্রণসংখ্যা উল্লিখিত হলে এখানেই থাকে, না হলে নয়। মুদ্রণসংখ্যার অনুল্লেখই যে আমাদের বইয়ের বিপণনের ইতিহাস লেখার একটা বাধা সে কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। সেকালের রীতিমাফিক এখনও আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, ভারবি-র বইতে মুদ্রকপত্রে প্রকাশক ও মুদ্রক সম্পর্কিত তথ্যাবলি শুধু শব্দে নয়, পূর্ণবাক্যে লেখা হয়ে থাকে। তবে বেশিরভাগ প্রকাশন সংস্থাই এখানকার বয়ানকে শব্দ ও তথ্যে সংক্ষেপ করেছে। সেকালে সৃষ্টিশীল রচনা ছাড়া অন্যান্য তত্ত্ব ও শাস্ত্রগ্রন্থে বাংলা পরিচয়াবলি সম্পূর্ণত ইংরেজি অনুবাদে ছাপা হত। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল শাসকের নয়নগোচর করা বা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লাইব্রেরিতে প্রেরণ। এখন আন্তর্জাতিক গ্রন্থ সংলেখের কারণে মুদ্রকপত্রের মাথায় এই তথ্য-ভাষা পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

অন্যান্য প্রকাশন সংস্থা যেমন তাদের সিলমোহরটি রাখে আখ্যাপত্রের নীচে, বিশ্বভারতীর গ্রন্থ পরিকল্পনায় তেমনই এই সিলমোহরটি চলে গেছে পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদে। আর বইয়ের দামও বিশ্বভারতী উল্লেখ করে সেই পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদের সিলমোহরের নীচে। দাম লেখার জন্য এই স্থানটির নির্বাচন দোকানদারের জন্য ভালো, যখন এই ধরন চালু হয়েছিল তখন সব বই-ই বোর্ডে বাঁধানো বা কাপড়ে মোড়া হত বলে তখনকার মতো এই ব্যবস্থা বই আর ইতিহাসের পক্ষেও ভালো। কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ যবে থেকে পাতলা কাগজে মোড়া মলাট ব্যবহার শুরু করল তবে থেকে তাদের উচিত ছিল দাম লেখবার জন্য এই স্থানটির বদল করা। কারণ পাতলা কাগজে মোড়া মলাট ছিঁড়ে গেলে দামটাই ভবিষ্যতের তথ্য-সাগর থেকে যাবে একেবারে হারিয়ে। ওই যে বলছিলাম না, আমাদের বইয়ের ধবন এবং গড়ন প্রায়শই ঐতিহ্যানুসৃতি, এই দামোল্লেখ তারই একটা নমুনা। অবশ্য কেউ বলবেন, একই বই বোর্ডে বাঁধাই আর পেপারব্যাক হলে কি দুরকম বইয়ের দাম দুবার ছাপব মূল বইয়ের সঙ্গে? সত্যি বলতে কী, পাতলা

বইয়ের প্রচ্ছদে একইসঙ্গে বাংলা ইংরেজিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি

কাগজে মোড়া বই তো আর পেপারব্যাক নয়, ঠিকঠাক পেপারব্যাক করলে তো আর প্রচ্ছদ হারাবার ভয়ই থাকে না।

সেকালের প্রচ্ছদের সব তথ্যই তাহলে গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হল, বাকি রইল বই আর লেখক সম্পর্কিত বক্তব্য। বইয়ের ব্লার্ব হিসেবে বই সম্পর্কিত দু-চার কথা এখন জ্যাকেটে মোড়া বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে জায়গা করেছে আর লেখক সম্পর্কিত তথ্য জায়গা পেয়েছে পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে। এমনকী বইয়ের পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদটিকেও কখনো ব্যবহার করা হয় বই বিষয়ে ব্লার্ব লেখবার জন্য।

প্রচ্ছদশিল্প বিষয়ক যে-কোনো লেখাতেই দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সেকালের ও সামান্য কিছুকাল আগেকার বইতেও প্রচ্ছদশিল্পীর অনুল্লেখ। ব্যাপারটা দুঃখের হলেও এরও কারণটা কিন্তু ওই ঐতিহ্যানুসরণের অভ্যাস থেকে তৈরি। সেকালে মুদ্রকই বানাতেন প্রচ্ছদ, তাঁরই হাতে তৈরি হত প্রচ্ছদের হরফবিন্যাস, ফলে আলাদা করে প্রচ্ছদশিল্পীর নামোল্লেখ ছিল নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পৃথক লেখা দিয়ে পরে যখন প্রচ্ছদ তৈরি শুরু হল, তখন আর অভ্যাসে নেই বলেই এল না মুদ্রকপত্রে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম। আধুনিক ডি.টি.পি.-র যুগে বর্ণসংস্থাপক আর মুদ্রক আলাদা হয়ে গেছে। যদিও বর্ণসংস্থাপক সেক্ষেত্রে নিজের নামটি মুদ্রকপত্রে সংগত কারণেই ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এখনও বইয়ের বাঁধাইদার বা দপ্তরিখানার নাম রাখার রেওয়াজ চালু হয়নি—সিগনেট প্রেস অবশ্য জেলদকার-দপ্তরির নাম ঠিকানা দিত, কিন্তু সেই ধারা আর এগোয়নি। প্রস্তুতিপর্বের আরম্ভের কাগজের জোগানদার আর প্রস্তুতিপর্বের শেষ পর্যায়ের জেলদকার বাংলা গ্রন্থনির্মাণ বৃত্তান্তে আজও উপেক্ষিত। দেরিতে হলেও শিল্পীরা স্বীকৃতি পেয়েছেন, কিন্তু এঁরা?

চার

বইয়ের ভেতর থেকে আবার বেরোনো যাক প্রচ্ছদে। আবার ফিরিয়ে আনা যাক সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সেই চিঠিটিকে। এতক্ষণ ওই চিঠিটির সূত্রে প্রচ্ছদ বৃত্তান্তের বাঁধা পথটা পেলাম, এবার দেখা দরকার তার স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের গতি। বিশ শতকের মাঝখানে এসেও সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন প্রচ্ছদের নীচে প্রকাশকের নাম রাখতে বা লেখকের স্বাক্ষর রাখতে বা মাঝখানে একটা ছোটো স্পাইরাল এঁকে ওপরে-নীচে বইয়ের আর লেখকের নাম বসাতে তখন তিনি প্রচ্ছদের কম্পোজিশনটি বাঁধা গড়নে ভাবছেন। কিন্তু মূল যে-ছবিটি—অর্থাৎ ওই কম্বুরেখায় একটি মাত্র মোটা লাইনের ওপর থেকে নীচে নেমে আসার ব্যাপারটা—তার রহস্য
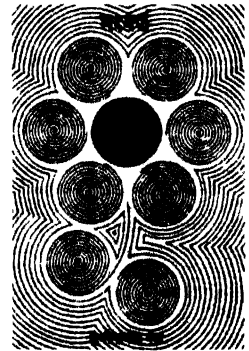
সংবর্ত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

কী? কেনই বা সুধীন্দ্রনাথ প্রচ্ছদের মাঝখানে রাখতে বলেছিলেন স্পাইরালটা? আর কেনই বা সুধীন্দ্রনাথরা পছন্দ করেননি প্রথম প্রচ্ছদটিকে?

প্রথম প্রচ্ছদটিতে ছিল কী? ছিল প্রচ্ছদের মাঝখানে একটি ঘন কালো বৃত্ত, তাকে ঘিরে আটটি সমান মাপের বৃত্ত, সেই আটটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ছড়িয়ে পড়া রেখা দিয়ে। সেই বৃত্তগুলির বাইরের রেখা এমনভাবে বইয়ের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে যা দেখে মনে হয় এ যেন কোনো শব্দের ক্রমিক বিস্তারের চিত্ররূপ। অথচ সংবর্ত বইয়ের নাম কবিতাটির মুখ্য বিষয় বিস্তার নয়, বরং এক অ-সম্ভব প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। কবিতা শুরু হয় 'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে' দিয়ে। ব্যক্তিজীবনে যখন 'বিমাই জীবন' আর সেই বিমার জন্য 'ঠিক মাসে মাসে কিস্তির জোগান দিতে গিয়ে বাজার খরচে টান পড়ে' যখন, তখন 'মানবেতিহাসে'-ও আসে 'মলমাস' আর বিশ্বমানচিত্রে তখন 'মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চিন, কবন্ধ ফরাসিদেশ'। এরই মধ্যে 'বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে'। আদৌ 'সে বেঁচে আছে কিনা' সে কথা জানেন না কবি, তবুও এই সংবর্তের কালে সে ফিরে আসে 'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি' হয়ে 'অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে'। যে-কাব্যে এই কাঙ্ক্ষিত অথচ অ-সম্ভব পুনর্মিলনের ইঙ্গিত তার প্রচ্ছদে ক্রমবিস্তারী রেখা গ্রহণ করবেন কী করে কবি? এই অসেতুসম্ভব পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষারই অসামান্য চিত্ররূপ ওই স্পাইরাল গড়ন। প্রতিটি বিন্দুই সন্নিহিত কিন্তু কোনোটিই স্পর্শযোগ্য নয়। সন্নিহিত বক্ররেখার মধ্যে মিলনের ঈপ্সা আছে, কিন্তু উপায় নেই—তারা ক্রমশ দূরগামী। অন্যদিকে 'সংবর্ত' শব্দার্থে যে-মহাপ্রলয়ের বার্তা আছে স্পাইরাল রেখাতেও তো সেই ঘূর্ণিঝড়ের ইঙ্গিত। আর 'সংবর্ত' শব্দের ধ্বনি-সাদৃশ্যে যে-'আবর্ত' শব্দটি মনে পড়ে এ তো তারও বার্তাবহ।

সুধীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন সত্যজিৎ—সেইমতোই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপটের অধোদেশে লেখা: 'সিগনেট প্রেস'। বস্তুত, সুধীন্দ্রনাথের বর্ণ-বিন্যাসও সত্যজিৎ গ্রহণ করেছেন তাঁর করা প্রচ্ছদে। শুধু ওই স্পাইরালটিকে সরাসরি আনেননি প্রচ্ছদে—তার বদলে গোটা প্রচ্ছদপট জুড়েই হালকা রঙে বহু স্পাইরাল ইমেজ ছড়িয়ে রেখেছেন তিনি। সত্যিই তো কবিতায় যে 'অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে' জেগে ওঠা

প্রচ্ছদেব লেখাঙ্কনে অঙ্কিত গ্রন্থনামেব আভিধানিক অর্থ

'রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি'-র কথা আছে, তাকে স্পষ্ট-দৃশ্য রেখায় কী করে মূর্ত করবেন শিল্পী?

লিপিচিত্রণ আর লেখাঙ্কনের সূত্রেই প্রচ্ছদশিল্পীর হাতে প্রচ্ছদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নের সূচনা। লেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা যায় মুখ্যত অলংকরণধর্মী সুষমামণ্ডিত নামাঙ্কন করেন শিল্পী; তবে কখনো দেখা যায় কাব্য বা গদ্যগ্রন্থের নামের বাচ্যার্থটিকে অবলম্বন করে নাম লেখেন শিল্পী। যেমন ১৯৪০-এ বুদ্ধদেব বসুর *নতুন পাতা* বইয়ের নামাঙ্কনে, আলফা বিটা ছদ্মনামে পরিচিত শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বইয়ের নামটি এমনভাবে লেখেন যে, দেখলে মনে হয় লম্বা বৃন্তের একপাশে সারবন্দি পাতা। এই ধরনের অলংকরণে পরবর্তী সময়ে অসামান্য দক্ষতা দেখাবেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা *পদাতিক* বা নবনীতা দেব সেনের *স্বাগত দেবদূত* বা বুদ্ধদেব বসুর *মরচে পড়া পেরেকের গান*-এ যার অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর *উলঙ্গ রাজা* বইয়ের প্রচ্ছদও এই ধারাতেই পড়বে। তবে স্বীকার করতেই হবে লেখাঙ্কনের এই ধারাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সত্যজিৎ রায়ের হাতে। ১৯৫২-তে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা *পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ*-র প্রচ্ছদ এক ধাক্কায় বাংলা লেখাঙ্কনকে অনেকটা এগিয়ে দিল। সরাসরি চিত্রণ নয়, বইয়ের ভাবটি গ্রহণ করে তাকে প্রচ্ছদে ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে এ এক আদর্শস্থানীয় উদাহরণ। তবে শুধু হাতের লেখাকে নয়, সত্যজিৎ শিল্পিত আকারে ব্যবহার করেছেন প্রেসের হরফকেও। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত দুটি বইতে দুভাবে প্রেসের হরফকে ব্যবহার করলেন তিনি। সুধীন্দ্রনাথের *অর্কেস্ট্রা*-র সিগনেট সংস্করণের নামপত্রে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির ফাউন্ট নিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে লিখলেন 'অর্কেস্ট্রা'। এর *অ*-এর প্রকৃতি সাধারণ, *র্কে*-এর আকার চওড়া

প্রচ্ছদের লেখাঙ্কনে অঙ্কিত গ্রন্থনামের আভিধানিক অর্থ

নামাঙ্কনে শুধু হাতের লেখা নয়, ছাপার হরফ ও ছাপার মতোই হাতের লেখার শিল্পিত ব্যবহার যথাক্রমে অর্কেস্ট্রা ও নীল নির্জন বইতে

আর *স্ট্রা*-র গড়ন লম্বাটে—অর্কেস্ট্রা যেমন বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের সহযোগ ও সংযোগে গড়ে ওঠা ঐকতান, এই নামাঙ্কন তেমনই বিবিধ প্রকৃতির হরফের সমবায়ে গড়ে ওঠা একটি চিত্র। পক্ষান্তরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর *নীলনির্জন* কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে প্রতিটি বর্ণকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে তাদের মধ্যে উচ্চাবচতা তৈরি করলেন শিল্পী। হরফের মধ্যবর্তী দূরত্ব হরফগুলিকে নির্জনতা দিল আর নীল সমুদ্রের তরঙ্গ সৃষ্টি করল তাদের উঁচু-নিচু অবস্থান।

পাঁচ

শুরু করেছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ১৯৫৩-তে লেখা একটা চিঠি দিয়ে, শেষ করব বুদ্ধদেব বসুর ১৯৬৩-তে লেখা একটা চিঠি দিয়ে। এই চিঠিটির প্রাপক পূর্ণেন্দু পত্রী। চিঠিটিতে বুদ্ধদেব বসু তাঁর *ভাসো, আমার ভেলা* বইটির প্রচ্ছদ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে লিখলেন:

> আমার আর একটা বই ছাপা হচ্ছে—আনুপূর্বিক আমার সমস্ত ছোট গল্প থেকে বেছে নিয়ে তিরিশটি গল্পের একটি সংকলন। ...নাম দিয়েছি—*ভাসো, আমার ভেলা*...সুপ্রিয় (প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার) কাপড়ে বাঁধাতে রাজি হয়েছে। একটা জ্যাকেট থাকবে, তার রূপসজ্জার জন্য তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি। আমি ভাবছি শুধু বইয়ের নাম ও লেখকের নামের লেটারিং থাকবে, কোনো হালকা রঙের জমির ওপর গাঢ় রঙে ছাপা। এ ছাড়া আরো একটা আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে—তা হল বইয়ের নামে যে দুটো 'ভ' আর একটা 'আ' আছে, সেগুলোকে, বা তার কোনো একটি বা দুটিকে যদি সাংকেতিক ও সূক্ষ্মভাবে, ভেলার ডিঙি নৌকার আকার দেওয়া যায়। ...এই তো গেলো জ্যাকেট: ভিতরে, কাপড়ের উপর আমি ভাবছি শুধু লেখকের নাম বা শুধু বইয়ের নাম সোনালি জলে engraved থাকবে, পুটে বইয়ের নাম প্রেস টাইপেও দেয়া যায়।

আবার লক্ষ করা যাচ্ছে সেই পুরোনো কাল আর নতুন ধরনের সমন্বয়। সত্যজিৎ এসে গেছেন প্রচ্ছদশিল্পে, লেখাঙ্কন নিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠিতও হয়ে গেছে বিবিধ নিরীক্ষা—সেখান থেকেই ওই *ভাসো, আমার ভেলা*-র লেটারিং নিয়ে নানাভাবে ভাবছেন লেখক আর বইয়ের জেলে কিন্তু ফিরে আসছে সেই কাপড়ের ওপর সোনালি জালে নাম এম্‌বস্‌ করবার পরিকল্পনা। আমরা ভাবছিলাম হরফের শিল্পিত ব্যবহারের কথা, তারও খেই ধরা আছে ওই চিঠিটির অন্য এক অংশের সঙ্গে বুদ্ধদেবের লেখা আরেকটি চিঠির বয়ানে।

এই চিঠিটিতেই বুদ্ধদেব বললেন, 'এই লেটারিঙে বিদ্যাসাগরি টাইপ চাই না—কিছুটা নতুন ধরনের কোরো'। আর পরে *অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ*-র প্রচ্ছদে বুদ্ধদেব বললেন পূর্ণেন্দু যেন 'দুটি কাব্যনাট্য' সংরূপটি ব্যবহার করেন এবং লিখলেন, 'তোমার ভালো মনে হলে লেখকের নাম ভিন্ন ছাঁদের অক্ষরে দিতে পারো', কিন্তু পরিষ্কার জানালেন, 'বইয়ের নামে সোজা বিদ্যাসাগরি চাই'। কেন চাইলেন এখানে বিদ্যাসাগরী ধরনের পুরোনো হরফ? আসলে এই বইয়ের নাট্যবিষয় যে পৌরাণিক আবহে আবর্তিত। এই প্রবন্ধের পাঠককে নিশ্চয়ই আর বলে দিতে হবে না গ্রন্থনামের নীচে রচনা সংরূপের উল্লেখ ('দুটি কাব্যনাট্য') কোন সময়ের বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের স্মৃতিবহ।

বাংলা হরফের পাঁচ পর্ব

পলাশ বরন পাল

হাতে লেখা পুথির সময় থেকে আজকের কম্পিউটারে ছাপার যুগ পর্যন্ত বাংলা হরফ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এই নিবন্ধ তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এর মধ্যে শেষ দিকের কথা খানিকটা বেশি গুরুত্ব পাবে, কেননা এই পর্ব এখনো অর্বাচীন। কম্পিউটারে ছাপা ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছে অতি সম্প্রতি, এর ফলে বাংলা হরফের যেসব দিকবদল হয়েছে তা নিয়ে লেখালেখি খুব বেশি হয়নি। এর আগে বাংলা ছাপা কেমন ছিলো তা নিয়ে অবশ্য প্রচুর আলোচনা হয়েছে (১, ২, ৩, ৪, ৫), তবু আমি আমার মতো করে সেই ইতিহাসও বলতে চাই।

যে-কোনো লিপিতে লেখা বা ছাপার কাজ করতে গেলেই বর্ণমালার বর্ণ ছাড়াও নানা জিনিস প্রয়োজন হয়—যথা সংখ্যা, যতিচিহ্ন, বিবিধ রকমের বন্ধনী বা ব্র্যাকেট, যোগচিহ্ন তারাচিহ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যাবতীয় চিহ্নের সমাহারকে আমি বলছি 'হরফ'। হবফের বিবর্তন তাই দু-ভাবে হতে পারে। কী কী চিহ্ন দরকার লাগছে তার তালিকা বদলে যেতে পারে, আর চিহ্নগুলোর চেহারা বদলাতে পারে। দু-রকম পরিবর্তনই এই ইতিহাসের উপাদান।

কীভাবে পর্ববিভাগ করা উচিত এই ইতিহাসের, তা নিয়ে মতান্তর হতেই পারে। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে বলে নিই গোড়াতেই। এই নিবন্ধটি বাংলা মুদ্রণের বা প্রকাশনার ইতিহাস নয়। মুদ্রণ প্রযুক্তির কথা প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই আসবে, কেননা হরফের উল্লেখযোগ্য বদল অনেক ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে। কিন্তু হরফের বদলের এটিই একমাত্র কারণ নয়। আবার নতুন মুদ্রণ প্রযুক্তি মানেই নতুন হরফ নয়। যেসব প্রযুক্তিতে হরফের চেহারা লক্ষণীয়ভাবে বদলায়নি, আমাদের এই কাহিনিতে তাদের ভূমিকা তুচ্ছ।

প্রথম পর্ব—ছাপাখানা আসার আগে

ছাপাখানা আসার আগে হরফ কেমন ছিলো, তা নিয়ে আলোচনা করার কিছু মুশকিল আছে। কারণ সে সময়ে ছিলো কেবল লোকের হাতের লেখা। কোনো দুজনের হাতের লেখা ঠিক একরকম দেখতে হয় না, তাই হরফের কোনো সর্বজনস্বীকৃত রূপ ছিলো না। এক এক জন্ এক এক রকম লিখতেন, এমনকী একই লোকও হয়তো বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন রকম লিখতেন। এ কথা শুধু বাংলা নয়, যে-কোনো লিপির সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

তবু এই সময়কে একটি আলাদা পর্ব হিসেবে গ্রহণ করা এবং তার আলোচনা করা প্রয়োজনীয় দুটো কারণে। প্রথমত, বিভিন্ন মানুষের হাতের লেখার প্রভেদ যেমন থাকে, মিলও তেমনই থাকে। তা যদি না থাকতো, তাহলে এক জনের লেখা অন্যদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব হতো। প্রাক্-মুদ্রণ যুগেও এমনই কিছু ন্যূনতম লিখনবিধি নিশ্চয়ই ছিলো, যার ভিত্তিতে 'বাংলা লিপি' কথাটার একটা অর্থ করা যেতো। সেই নিয়মগুলোর আলোচনা হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় কারণ, ছাপাখানা যখন শুরু হয়, সমসাময়িক হাতের লেখার অনুকরণেই তখন ছাপার হরফের ছাঁদ বানানো হয়। সেই সময়ের, বা তার ঠিক আগেকার কালের, হস্তাক্ষরের কথা না জানলে তাই আদিযুগের ছাপার হরফের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই প্রাক্-মুদ্রণ যুগে বাংলা হরফ কেমন ছিলো, তা জানা যাবে কী করে? উত্তর হলো—সেই আমলের বাংলা পুথি-পত্র বা দলিল-দস্তাবেজ থেকে, লিখিত বাংলার অন্য যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তার থেকে। পুথির লেখার বহু নিদর্শন সম্প্রতি সংকলন করেছেন অণিমা মুখোপাধ্যায় (৬), *পুথিপাঠ ও সম্পাদনা রীতি* গ্রন্থে। এই লেখার সঙ্গে আমরা দিলাম দুটি পুথি থেকে প্রতিলিপি। ১ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের একটি অংশ। ভারতচন্দ্র ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, সুতরাং এই লেখা অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার হতেই পারে না। অন্য যে-নমুনাটি আছে ২ নম্বর ছবিতে, তার হাতের লেখাও বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মোটামুটি সমসাময়িক, অর্থাৎ আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের। ছবিতে দুটি শব্দের মধ্যে একটি ফাঁক দেওয়া হয়েছে—এই রীতিটি অষ্টাদশ শতকের আগে তো ছিলোই না, অষ্টাদশ শতকেও ছিলো বিরল।

নমুনার ছবি দুটি লক্ষ করলে এর মধ্যে বাংলা লিপির এমন কয়েকটি লক্ষণ চোখে পড়ে, যেগুলো আজকের সমস্ত বাংলা হরফেও আমরা দেখতে অভ্যস্ত। যেমন ধরা যাক, লেখায় মাত্রা হয়েছে। মনে হতে পারে, এতে আর আশ্চর্য কী, ভারতীয় লিপিতে তো মাত্রা থাকেই! এ ধারণা ঠিক নয়, সমস্ত ভারতীয় লিপিতে মাত্রা থাকে না। গুজরাতি লিপিতে মাত্রা নেই, উড়িয়া লিপিতে সরলরেখার মতো মাত্রা দেখা যায় না। বাংলা বা দেবনাগরী লিপিতে মাত্রা থাকে, এবং যে-সব নমুনার ছবি দেওয়া হলো তাদের কালের আগে থেকেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো নিশ্চয়ই।

মাত্রার ব্যাপারে আরও সূক্ষ্ম কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায় নমুনার ছবি থেকে। আমরা জানি, বাংলার সমস্ত বর্ণে মাত্রা থাকে না। বস্তুত, দেবনাগরীর তুলনায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা বাংলায় অনেক বেশি। তেমনই, 'খ' কিম্বা 'শ' ইত্যাদি কিছু কিছু বর্ণচিহ্নে থাকে শুধু ডানদিকে একটি ছোট্ট মাত্রা। এগুলোকে বলা যেতে পারে অর্ধমাত্রিক চিহ্ন। নমুনার ছবির সঙ্গে মেলালে দেখা যাচ্ছে, কোন কোন বর্ণে মাত্রা থাকবে না, কোন কোন চিহ্ন অর্ধমাত্রিক হবে, এসব ব্যাপারে আধুনিক লেখা আর অষ্টাদশ শতাব্দীর হস্তাক্ষরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

যত রজপুত। রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত॥ পঞ্চম গড়েতে
দেখে
যত কেবা তত। তার কাছে বৈসে ভাট যাতায়াতে দূত॥ ষষ্ঠ গড়েতে
যত রোকদারের থানা। আটা আটি সেই গড়ে থাকে মান খানা॥
সেই গড়ে দেখে যত বৈসে মহাজন। লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খ অসংখ্য
কার ধন॥ ক্রমে২ ছয় গড় সকল দেখিয়া। প্রবেশে ভিতর
গড়ে অন্তর্যামী হইয়া॥ সম্মুখে দেখয়ে চকচাঁদনি সুন্দর। নহব
ত বাজিছে রাজার থানা বড়পর॥ চকের মাঝেতে কোতওয়ালি
চবুতরা। ফটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥ ডাকাতি ছিনাল
চোর হাজারে ২। বেড়ি পায় মাথ্যা খায় বাজারে২॥ বসিয়াছে
কোতওয়াল ধূমকেতু নাম। যমালয় সমান লাগিছে ধূম ধাম
॥ চকচকি হাতে বে কোড়ার পটপটি। ধর্ম্মড়ে চর্ম্ম পাদু
কার চটচটি॥ কেহো বা দোহাই দেয় কেহো বলে হায়। কে
ফাটে
হো বলে বাপ২ মোর প্রাণ যায়॥ ছাতি দিয়া নাদে কেহো
পানি। দেখিয়া সুন্দর অন্তরে ভবানী॥ ভাবিত হইছে
কেন আইল এখন। ঠেকিবে যখন দায় জানিবে তখন॥ ২
॥ ০ ॥ ০ ॥ হুঁয়াতান॥ অহে বিনোদ রায় ধীরে২ যাও। মধুর
অধরে হাসি বাঁশী বাজাও॥ নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্র

১নং ছবি॥ ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। [৭] নং সূত্র থেকে।

২নং ছবি ॥ 'বারমাস্যা' পুথির অংশ। [৭] নং সূত্র থেকে।

মাত্রা যেমন ওপরের দিকে একটি অনুভূমিক লাইন, তেমনই ডানদিকে একটি খাড়া লাইনও রয়েছে বাংলার বহু বর্ণে। অ, ক, ব, ষ ইত্যাদি মাত্রাযুক্ত বর্ণচিহ্নে, 'খ', 'থ', 'শ', 'প' ইত্যাদি অর্ধমাত্রিক চিহ্নে এর দেখা পাই। যে-যে বর্ণে এইরকম লাইন আমরা এখন দেখতে অভ্যস্ত, ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি অষ্টাদশ শতকের হাতের লেখায়।

এর পরে বাংলা লিপির যে বিশেষ লক্ষণ চোখে পড়ে, তা হলো কয়েকটি বিশেষ আকৃতির চিহ্ন। একটি ত্রিভুজাকার চিহ্ন, যার দেখা মেলে, 'ব', 'র', 'ক', 'ধ', 'ঝ' ইত্যাদি বর্ণে। ত্রিভুজটি ওপরদিকে পুরোপুরি সম্পূর্ণ না করে একটু বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দিলে পাওয়া যায় আরও কয়েকটি বর্ণচিহ্ন, যথা 'য', 'ষ', 'ঘ', 'খ' 'থ'।

লেখা যে-দিকে এগোচ্ছে, সেই লাইনের সঙ্গে মোটামুটি ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে দুটি লাইন রয়েছে এই সব বর্ণচিহ্নে। এ ছাড়াও আরও বহু বর্ণচিহ্ন আছে যাতে ৪৫ ডিগ্রি কোণওয়ালা রেখা থাকে। যেমন, 'হ', 'ছ', 'ই' ইত্যাদির নীচের দাগটা, 'দ'-এর মাঝখানের দাগ, 'গ', 'প', 'শ' ইত্যাদি বর্ণের বাঁ দিকের যে-অংশটা ডাইনের দাঁড়ির সঙ্গে এসে মিশছে সেই জায়গাটা। এগুলোও একইরকম ছিলো দুশো-আড়াইশো বছর আগে। অন্তত আমাদের নমুনা তো সেইরকমই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

যেসব লক্ষণের কথা বলা হলো, সেগুলো দেখতে আমরা এতোই অভ্যস্ত যে, এগুলো বাংলা হরফের প্রধান লক্ষণ বললে আমাদের অবাক লাগতে পারে। মনে হতে পারে, অতি মামুলি ছেঁদো কথাকে অকারণে প্রকাণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে।

তা কিন্তু নয়। এ লক্ষণগুলো অনিবার্য ছিলো সে কথা ভাবার কোনো কারণ নেই। পৃথিবীর বহু বহু লিপিতে এসব লক্ষণ নেই, বাংলা লিপিতে আছে। অতএব এগুলো বাংলা লিপিরই বৈশিষ্ট্য, একেবারে বুনিয়াদি স্তরের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য। বাংলা লিপি পড়তে জানেন না এমন একজনকে যদি এই লিপি দেখিয়ে বলা হয়, এর কী কী বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে পড়ছে, তাহলে এতোক্ষণ যে-কথাগুলো বললাম তিনি সম্ভবত সেগুলোর কথাই বলতেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলা লিপিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাকাপাকি হয়ে গেছে।

সেইসঙ্গে এ কথাও ঠিক, হাতের লেখার এইসব নমুনায় এমন কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, যেগুলোর সঙ্গে আজকে আমরা পরিচিত নই। যেমন ধরা যাক 'র' বর্ণটির চিহ্নের কথা। এখন আমরা যা লিখি, তাতে 'ব' বর্ণের মতো দেখতে একটি আকৃতির নীচে একটি ফুটকি দেওয়া হয়। ১ নম্বর ছবিতে যে-নমুনা দেখা যাচ্ছে, তাতে এই ফুটকি নেই। 'ব'-এর মতো চিহ্নের পেট কেটে লেখা হয়েছে 'র'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসমীয়া লিপি আর আধুনিক বাংলা লিপির মধ্যে দুটি মাত্র বর্ণের তফাত, তার একটি হলো 'র', অসমীয়া লিপিতে যা লেখা হয় পেটকাটা 'ব'-এর মতো। অর্থাৎ অসমীয়া এবং বাংলা লিপির মধ্যে যে-তফাত তা ১ নম্বর ছবির হস্তাক্ষরের কালে প্রকট হয়নি। ২ নম্বর ছবির নমুনায় অবশ্য ফুটকি দেওয়া 'র' চিহ্নই ব্যবহৃত হয়েছে।

ফুটকির কথা আরও একটু বলি। আধুনিক বাংলা লিপিতে গোটা চারেক বর্ণচিহ্নের তলায় ফুটকি আছে। অথচ খানিকক্ষণ আগে বাংলা হরফের যেসব বুনিয়াদি স্তরের বৈশিষ্ট্যের কথা বলছিলাম তার মধ্যে ফুটকির কথা বলিনি। না বলার কারণ, এই ফুটকিগুলো আধুনিক, শ-তিনেক বছর আগে ছিলো না। 'র'-এর ফুটকি ছিলো না তা তো বলা হলো। এ ছাড়া আর যেসব বর্ণে ফুটকি দিয়ে লেখা হয় আজকের বাংলায়, সেইসব বর্ণই ছিলো না কয়েক শতাব্দী আগে।

এদের মধ্যে প্রথমে অন্তঃস্থ 'য়' বর্ণটির কথাই বলা যাক। বিন্দুহীন যে-চিহ্নটিকে এখন অন্তঃস্থ 'য' বলা হয় এবং বর্গীয় 'জ'-এর মতো করে উচ্চারণ করা হয়, তার সঙ্গে আমাদের এখনকার বিন্দুযুক্ত অন্তঃস্থ 'য়' বর্ণের কোনো তফাত করা হতো না আগেকার বাংলা লেখায়। ১ নম্বর ছবির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, সেখানে 'ছয়'-এর জায়গায় লেখা হয়েছে 'ছয', 'দেখিয়া' না লিখে লেখা হয়েছে 'দেখিযা'। যে-শব্দটিকে এখন আমরা লিখবো 'যাতায়াত', সেটিকেও এই পাণ্ডুলিপিতে দেখতে পাচ্ছি 'যাতাযাত' রূপে।

তার মানে এই নয় যে, এই শেষের শব্দটির উচ্চারণ হতো 'জাতাজাত্'-এর মতো। 'দেখিয়া' শব্দটির উচ্চারণও 'দেখিজা' হতো না। সংস্কৃতে যেখানে মোটামুটি ইংরিজি 'y' বর্ণের মতো উচ্চারণ হতো, কালক্রমে সে উচ্চারণের দু-রকম পরিণতি ঘটেছিলো বাংলায়। 'জ'-এর মতো উচ্চারণ দেখা দিয়েছিলো শব্দের শুরুতে, যেমন 'যম', 'যোগ', 'যন্ত্রণা'—এবং 'র' ধ্বনির ঠিক পরে, যেমন 'সূর্য', 'বীর্য', 'দুর্যোধন'। অন্যত্র এর উচ্চারণ হয়েছিলো স্বরধ্বনির মতো। 'জ'-এর মতো উচ্চারণ অনেক শব্দে পরিষ্কার বর্গীয় 'জ'

লিখে দেখানো হতো, কিন্তু সব শব্দে হতো না। বহু শব্দেই অন্তঃস্থ বর্ণটি লেখা হতো, দু-রকম উচ্চারণের জন্যই লেখা হতো। অর্থাৎ দু-রকম উচ্চারণ আলাদা করে বোঝানো হতো না পুরোনো কালের লেখায়, যেমন হয়নি ১ নম্বর ছবিতে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পুথির যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, অনেকে এই দুই উচ্চারণের তফাত করছেন বর্ণটিকে দুভাবে লিখে—একটিকে বিন্দু নিয়ে, অন্যটিকে বিন্দু ছাড়া। এই দুটি রূপকে দুটি আলাদা বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বর্ণপরিচয়* লেখার সময়ে।

তেমনই, শব্দের গোড়ায় না বসলে সংস্কৃতের 'ড' এবং 'ঢ' মূর্ধন্য ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় না বাংলায়। এ কথা লক্ষ করে নতুন বর্ণচিহ্নের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো অনাদ্য 'ড' এবং 'ঢ'-এর জন্য। ফুটকিওলা এই দুটি চিহ্ন, 'ড়' ও 'ঢ়', বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে সংযোজিত হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের দ্বারাই। ১ নম্বর ছবিতে এই সব ফুটকিওলা বর্ণ দেখা যাচ্ছে না। আজ আমরা যে-কথাটিকে 'বেড়ি' লিখবো, এই ছবিতে সেটি লেখা হয়েছে 'বেডি'।

এ ছাড়া আরও অনেক তফাত আছে ১ নম্বর ছবির নমুনার সঙ্গে আধুনিক বাংলা লেখার। ছবির মাঝামাঝি জায়গায় 'ধূমকেতু' শব্দটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, 'তু', অর্থাৎ ত-য় হ্রস্ব- উ-কার, সে আমলে দেখতে ছিলো অন্যরকম—মোটামুটি 'ও' স্বরচিহ্নটির মতো, শুধু ওপরে মাত্রা দেওয়া। এখনকার কালে 'ত্+ত' লেখার জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহার হয়। তবে 'ন্+ত+উ' বা 'স্+ত+উ' লেখার সময়ে 'ত+উ' অংশটা এইভাবে লেখা হয় বহু ছাপার হরফে, হাতে লেখার সময়েও অনেকেই এইভাবে লেখেন। ১ নম্বর ছবির নমুনাটি যে-কালের, সে সময়ে সকলেই মাত্রাযুক্ত 'ও' চিহ্নের মতো করে ত-য় হ্রস্ব-উ-কাব লিখতেন কি না, একটি নমুনা দেখে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এ কথা বলা যায়, কেউ কেউ অন্তত লিখতেন, এবং চিহ্নটি নিশ্চয়ই চালু ছিলো। এখনকার কালে শুধু 'ত+উ' লেখার সময়ে এই বিশেষ চিহ্ন কেউ ব্যবহার করেন না, এ চিহ্নটি অচল হয়ে গেছে। এরকম আরও কিছু চিহ্নের কথা বলা যায়। দ্বিতীয় পর্বের, অর্থাৎ বাংলা ছাপাখানার শৈশবেব কথা আলোচনা করার সময়ে তার কিছু কিছু বলবো।

দ্বিতীয় পর্ব—প্রথম পঞ্চাশ বছরের ছাপা

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদের লেখা *A Grammar of the Bengal Language* প্রকাশিত হয় (৮)। সাধারণত এই ঘটনাটিকেই বাংলা মুদ্রণের জন্মলগ্ন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

লেখকের নামটা বাংলা হরফে নানাভাবে লেখা হয়। কেউ লেখেন *হলহেড*, কেউ *হালহেড*, কেউ *হ্যালহেড*। ইংরিজি বানানের মাছিমারা প্রতিবর্ণীকরণে সেইরকম কিছুই দাঁড়ায়। শ্রীপান্থ লেখেন *হালেদ* (৩)। যাঁর নাম নিয়ে এতো কথা, তিনি নিজে বাংলা হরফে

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গেজী

৩নং ছবি॥ *A Grammar of the Bengal Language* [৮] বইয়ের নামপত্রের অংশ।

এই বানানই লিখেছেন তাঁর বইয়ে। নামপত্রে পর্যন্ত—৩ নম্বর ছবি দেখুন। তিনি তো দিব্যি বাংলা জানতেন, তাই খোদার ওপর খোদকারি না করে এই বানানটিই ব্যবহার করছি।

হালেদ বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বই লিখলেন 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং'। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়ায় *ফিরিঙ্গিনাম্ উপকারার্থং*, অর্থাৎ ফিরিঙ্গিদের উপকারের জন্য। ইংরিজিতে লেখা বই, কিন্তু তার মধ্যে বাংলা বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে বাংলা লেখার নিদর্শন যা-যা আছে তা সবই বাংলা হরফে। সেই বাংলা ছাপিয়ে বাংলা মুদ্রণের জন্মলগ্ন সূচিত হলো।

এই কথাটার অর্থ ভালো করে বোঝা দরকার। এর আগেও বাংলা ছাপা হয়েছে। কিন্তু সে সবই ব্লক থেকে ছাপা। অর্থাৎ একটি বইয়ের একটি পাতা হাতে লেখা হলো, তার পরে সেই গোটা পাতাটার একটি প্রতিলিপি কাঠে বা ধাতুতে উলটো করে খোদাই করে নেওয়া হলো, তার পরে সেই কাঠ বা ধাতুর ব্লকে কালি লাগিয়ে বহু কপি ছাপানো হলো। কম্পিউটার আসার আগে পর্যন্ত ছবি ছাপানোর এইটিই ছিলো মোটামুটি নির্বিকল্প পদ্ধতি, এখনো রবার স্ট্যাম্পে নাম বা সই বা যা হোক অন্যকিছু ছাপতে গেলে এইভাবেই তা করা হয়। এমনই ছবির মতো করে গোটা পাতার লেখা ছাপানোর কাজ বাংলায় হালেদের বইয়ের আগেও হয়েছে।

হালেদের বইয়ে তাহলে নতুন কী হলো? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, এই প্রথম বিচল হরফে ছাপা হলো বাংলা বই।

'বিচল' শব্দটা বাংলায় খুব একটা ব্যবহৃত হয় না, যদিও এর বিপরীতার্থক শব্দ 'অবিচল' কথাটা বেশ চালু। 'অবিচল' কথাটার আক্ষরিক অর্থ, যাকে নাড়ানো-চাড়ানো যায় না। তাহলে 'বিচল' মানে, যাকে নাড়ানো-চাড়ানো যায়। আগেকার মতো একটা গোটা পাতার প্রতিলিপি নয়, হালেদের বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছিলো এমন হরফ যার প্রতিটি চিহ্নের একটি আলাদা ব্লক বা ছাঁদ থাকে, সেই ছাঁদগুলোকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে বসানো যায়। এই জন্যই বলা হচ্ছে 'বিচল হরফ'। এই চমৎকার পরিভাষাটির সৃষ্টিকর্তা সম্ভবত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১)।

বিচল হরফে ছাপা শুরু হওয়া মানে প্রযুক্তির যুগান্তর। ইউরোপে এই প্রযুক্তিটিরই

উদ্ভাবক হিসেবে আমরা ইয়োহানেস্ গুটেনবার্গের নাম স্মরণ করি। বাংলায় যাঁদের উদ্যোগে এই যুগান্তর এলো, তাঁদের মধ্যে হালেদ নিজে তো ছিলেনই, তা ছাড়াও ছিলেন চার্লস উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার প্রমুখেরা।

এতে প্রযুক্তির যুগান্তর হলো কেন, সে প্রশ্নটির উত্তর ভালো করে বোঝা যাক। ব্লক ছাপায় যেমন প্রত্যেকটি জিনিস ছাপাবার জন্য নতুন করে ছাঁদ বানাতে হয়, বিচল হরফ থাকলে তা করতে হয় না। হরফের যে-ছাঁদ খোদাই করে তৈরি করা হয়, সেই একই ছাঁদ থেকে বহুবার ছাপা যায়। অর্থাৎ ধরা যাক 'ক' বর্ণটির একটি ছাঁদ রয়েছে। এই পাতাটা ছাপার সময়ে সেই ছাঁদটা ব্যবহার করা হলো। এ পাতা ছাপা হয়ে যাওয়ার পরে সেই ছাঁদটাই খুলে নিয়ে অন্যকিছু ছাপার কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিবার 'ক' ছাপতে গেলেই একটা করে নতুন ব্লক তৈরি করতে হয় না, সুবিধে হয়।

এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় অবশ্য মুদ্রণ প্রযুক্তি নয়, হরফের আকৃতি। তবু, প্রযুক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বলে প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিক কিছু কথা উল্লেখ করতে হবে মাঝেমাঝে।

সত্যি বলতে কী, 'হরফের আকৃতি' কথাটা যে ব্যবহার করছি, এই কথাটাই প্রযুক্তির অবদান। একই ছাঁদ বা টাইপ ব্যবহার করে বার বার ছাপা যায় বলে বর্ণচিহ্নগুলোর একটা স্থায়ী রূপ হলো বিচল হরফ প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে। 'স্থায়ী' বলতে চিরস্থায়ী বোঝাচ্ছি না। ধাতু থেকে কেটে যে-চিহ্নগুলো বানানো হতো তার আকৃতি যে কালক্রমে বদলেছে, তা আমরা এক্ষুনি দেখবো। কিন্তু হাতে লিখতে হলে একই লেখকের হাতেও দুটো 'ক' ঠিক একরকম হয় না। ঢালাই করা ধাতুর হরফে এরকম কোনো বৈষম্য থাকে না। একই ঢালাইয়ের সমস্ত 'ক' দেখতে ঠিক একইরকম হয়। এবং সেই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে যতোদিন যতো 'ক' তৈরি হবে, তার সবকটিই একইরকম দেখতে হবে। এই অর্থে রূপটি স্থায়ী। ছাঁদ বদলালে তবেই রূপ বদলাবে, তার আগে নয়।

হালেদের ব্যাকরণ বই ইংরিজিতে লেখা। এর জন্য যে ইংরিজি হরফ ব্যবহৃত হয়েছিলো, তা সম্ভবত আগে থেকেই চালু ছিলো। কিন্তু বইয়ের বিষয় যেহেতু বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, তাই নানা আলোচনা বা উদাহরণ প্রসঙ্গে বাংলা বর্ণ, শব্দ, বা গোটা বাক্যও লেখা হয়েছে বইয়ে। এই বাংলা অংশগুলো ছাপার জন্য যে-হরফ ব্যবহৃত হয়েছিলো, তা তৈরি করেছিলেন চার্লস উইলকিন্স, তাঁর সহায়ক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার।

বইয়ের মধ্যে এক জায়গায় বেশ কয়েক পাতা ধরে উদ্ধৃত হয়েছে 'মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব মধ্যে এক অধ্যায়'—বাংলা ভাষার টানা লেখার নিদর্শন দেখানোর জন্য। তার একটি পাতার প্রতিলিপি দেখাচ্ছি ৪ নম্বর ছবিতে, আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে।

আলোচনা শুরু করার জন্য প্রথমেই তাকাবো এই ছবির একেবারে নীচের দিকে, শেষ লাইনের শেষ শব্দটিতে। ১ নম্বর ছবিতে *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের হাতে লেখা নমুনার আলোচনা করতে গিয়ে যেরকম 'ত-য় হ্রস্ব-উ-কার' দেখেছিলাম, এখানেও দেখছি ঠিক

BENGAL LANGUAGE.

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভুতি ভুসন অঙ্গ জটা তার কেশ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে।
বিবিধ পুকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
জতেক ভূপতি গন বসিয়া দেখিল॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হওক আমার সন্ততি॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি॥

F হর

৪নং ছবি॥ হালেদের ব্যাকরণ [৮] বইয়ের ৪১ পাতার প্রতিলিপি।

সেই জিনিস, 'তুমি' শব্দটি লিখতে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে, এই চেহারার 'ত-য় হ্রস্ব-উ-কার' চালু ছিলো বাংলা ছাপার এই শৈশবকালেও।

পেটকাটা 'ব' চিহ্নের মতো দেখতে 'র' বর্ণ আমরা দেখেছিলাম আগেকার কালের লেখার নমুনায়, ১ নম্বর ছবিতে। এখানেও দেখছি। কিন্তু এখন আমরা যেভাবে ফুটকি দিয়ে 'র' লিখি, সেই রূপও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ৪ নম্বর ছবিতে। তার মানে, দু-রকম রূপই চালু ছিলো। বইয়ের অন্যত্র হালেদ নিজেই পরিষ্কার করে বলেছেন, 'র' বর্ণটিকে 'ব' বর্ণের দিকে আলাদা করা হয় পেটে একটি দাগ বা তলায় একটি ফুটকি দিয়ে।

এইবার আর একটা বর্ণচিহ্নের দিকে ভালো করে তাকানো যাক। ৪ নম্বর ছবিতে বাংলায় লেখা প্রথম যে-লাইনটি দেখা যাচ্ছে, তার চতুর্থ শব্দের শেষ বর্ণটি কী? দেখতে অনেকটা দন্ত্য 'ন'-এর মতো। কিন্তু ভালো করে ভাবলে বোঝা যাবে, এটা আসলে 'ল'। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য পঞ্চম লাইনটি দেখতে পারি, সেখানে যা লেখা আছে তা হলো— 'সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।' লাইনটিতে 'ন' এবং 'ল' দুটোই আছে, যদিও তফাত করতে কষ্ট হয়। এটা ছাপার ভুল নয়, বর্ণের ছাঁদ তৈরি করার কোনো ভুলও নয়। আসল কথা হলো, তখনকার লেখায় এ দুটি বর্ণের মধ্যে তফাত ছিলো খুবই কম। এ কথার সপক্ষে প্রমাণের পাল্লা ভারী করার জন্য এখন তাকানো যাক ১ নম্বর ছবির দিকে। সেখানে যে-পৃষ্ঠাটি দেখা যাচ্ছে, তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি পঙ্ক্তি আছে—'যমালয় সমান লাগিছে ধূমধাম'। সেখানে 'ন' আর 'ল' দুটো বর্ণ দেখতে এতোই একরকম যে, সহজে তফাত করা যায় না। ২ নম্বর ছবিতে দ্বিতীয় লাইনে যেখানে লেখা হয়েছে 'মলয়া পবনে', সেখানেও তাই।

হালেদের ব্যাকরণের ছাপায় তবু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হচ্ছে, সামান্য হলেও দুটো বর্ণচিহ্নের মধ্যে পার্থক্য করার একটু চেষ্টা করা হয়েছে। 'ন' বর্ণের বাঁ প্রান্তে যে বড়ো ফুটকিটি আছে, সেটি কালি দিয়ে ভরাট করা। 'ল' লেখার সময়ে ফুটকিটি ভরাট নয়, ফুটকির পরিধিটা পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গোল হয়েও আসেনি। ফুটকি আর ডানদিকের লম্বা লাইনটার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে যে-লাইনটি, 'ন' লেখার সময়ে তা অনুভূমিক সরলরেখা, 'ল' লেখার সময়ে লাইনটিতে বৃত্তাভাস স্পষ্ট। এখন আমরা 'ল' লেখার সময়ে এই লাইনটিতে একটি খাঁজ দিই, সেটি কিন্তু ৪ নম্বর ছবির নমুনায় অনুপস্থিত। তবে খাঁজওলা রূপটিও চালু ছিলো হালেদের সময়ে, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে পরিচয় করানোর সময়ে হালেদ নিজেই সে কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে বলেছেন, এই 'ল' এবং 'ন' হামেশাই গুলিয়ে ফেলা হয় বাংলায়—শুধু লেখার আকৃতিতে নয়, উচ্চারণেও।

আমরা এখন যেরকম আকৃতি দেখতে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে তফাত লক্ষ করা যাচ্ছে আরও বেশ কয়েকটি বর্ণে। 'উ' লেখার সময়ে যে-টিকিটি ব্যবহার করা হয় তার চেহারা অন্য রকম, 'ট'-এর টিকিটিও খানিকটা নীচে থেকে শুরু হয়েছে। দশম এবং শেষ, এই দুটি লাইনের গোড়ায় 'এই' শব্দটি দেখে মনে হচ্ছে, 'ই' বর্ণটির তুলনায় 'এ' বর্ণটিকে যেন বেশি বড়ো দেখাচ্ছে। 'ই' বর্ণের মাত্রা আর 'এ' বর্ণের মাথা আমরা সমান উচ্চতায়

দেখতে অভ্যস্ত। ৪ নম্বর ছবিতে কিন্তু টিকিসুদ্ধ 'ই' বর্ণের উচ্চতা 'এ' বর্ণের সমান।

আজকের চেনা রূপের সঙ্গে কয়েকটি বর্ণের চিহ্নের তফাত এতো বেশি যে, এদেরকে চিনতে কষ্ট হয়। শেষ লাইনের 'আজ্ঞা' শব্দে 'জ্ঞ' যেভাবে লেখা হয়েছে, সে চিহ্নটিকে আমরা এখন হয়তো নবম লাইনের 'অঙ্গে' শব্দের 'ঙ্গ' চিহ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবো। এমনকী তৃতীয় লাইনে 'আনন্দিত সোমদত্ত' লিখতে গিয়ে যেভাবে 'ন্দ' যুক্তচিহ্ন লেখা হয়েছে, সেটার সঙ্গেও গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হয় তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দটি পড়তে গিয়ে। ৪ নম্বর ছবিতে যে-পাতাটির প্রতিলিপি আছে শুধু সেইটুকু যদি আজকের দিনে কাউকে দেখানো হয়, তাহলে আন্দাজে আন্দাজে তিনি 'চাঙ্গরে' বা এর কাছাকাছি কিছু বলবেন। বলেই বুঝবেন কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, কেননা এরকম তো কোনো শব্দ নেই! এই রহস্যের সমাধান হয় হালেদের ব্যাকরণের পূর্ববর্তী পাতাগুলো পড়লে। ব্যঞ্জনবর্ণগুলির পরিচয় দেওয়ার সময়ে হালেদ উচ্চারণ সহযোগে তাদের উপস্থাপিত করেছেন, কাজেই সেখান থেকে বোঝা সহজ কোন ধ্বনির জন্য কোন বর্ণচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এই বই ছাপার সময়ে। তা থেকে দেখতে পাচ্ছি, আলোচ্য শব্দের প্রথম বর্ণটি হলো 'ঠ'—হালেদের বইয়ে এই বর্ণটির টিকি খুব ছোটো, এতো ছোটো যে চট করে 'চ' মনে হয়। আর এই 'ঠ'-য় আ-কারের পরের অক্ষরে যে-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সেটি হলো 'কু'। এখনো যেমন অনেক ছাপায় 'শু' বা 'গু' দেখা দেয় বিশেষ চিহ্ন হিসেবে, হালেদের বইয়ের ছাপাতেই যেমন 'তু' লেখার জন্যও বিশেষ চিহ্ন, তেমনই 'কু' লেখার জন্যও তখন একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হতো, হালেদের ব্যাকরণে সে কথা পরিষ্কার করে বলা আছে আগেভাগেই। অর্থাৎ ছবিতে যে-পৃষ্ঠাটি দেখছি, তার তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দটি হলো 'ঠাকুরে'—অর্থের দিক থেকেও দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে কথাটা।

বিচল বাংলা হরফ ব্যবহার করে ছাপা প্রথম বই হালেদের ব্যাকরণ, প্রথম হওয়ার সম্মান তাকে দিতেই হবে। কিন্তু এ বইয়ের বাংলা ছাপা দেখে যে খুব ভালো লাগে, তা বলা যায় না। অধুনালুপ্ত বিবিধ বর্ণচিহ্ন ব্যবহারের জন্য এ কথা বলছি না। সেসব রূপ সে আমলে প্রচলিত ছিলো, সে আমলে এইসব রূপের ব্যবহার অস্বাভাবিক ছিলো না। আসল কথাটা হলো, সে আমলের দৃষ্টি দিয়েও যদি দেখতে চাই, অন্য কিছু কিছু ব্যাপার তবু চোখকে পীড়া দেয়। যেমন একটা ব্যাপার, বর্ণচিহ্নগুলো খুব বড়ো বড়ো। যেসব পৃষ্ঠায় বাংলা এবং ইংরিজি একসঙ্গে ছাপা হয়েছে সেখানে ইংরিজির তুলনায় বাংলা লেখা এতো বড়ো যে চোখে লাগে। এমনকী ৪ নম্বর ছবিতে যে-পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছি, তার শিরোনামে যে ইংরিজি হরফ ব্যবহার হয়েছে সেটিও বাংলা হরফের চেয়ে অনেকটা ছোটো। পরিষ্কার বোঝা যায়, ছোটো মাপের বাংলা হরফ কাটা তখনও সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো বর্ণচিহ্নের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের অভাব দেখা যায়। যেমন 'র' বর্ণটির ক্ষেত্রে—পেটকাটা 'ব'-এর মতো লেখা হয়েছে বহু জায়গায়, আবার ফুটকি দিয়ে এখন যেভাবে লেখা হয় সেভাবেও হয়েছে। হালেদ বলে নিয়েছেন, যে দু-রকমের রূপই

ব্যবহৃত হয় এই বর্ণটি লেখার জন্য। মানছি, কিন্তু সে কথা বলে নেওয়ার পরে বইয়ে কেন সেই দু-রকম ভাবেই ছাপতে হবে, তা স্পষ্ট নয়। আর তৃতীয় যে-কারণে এই ছাপা পরিণত মনে হয় না, তা হলো বর্ণচিহ্নগুলোর আকৃতিতে কিছু অসংগতি। 'এ' আর 'ই' এই দুটি বর্ণের মাপে এরকম অসংগতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শেষ শ্লোকে 'বর' শব্দটির দিকে তাকালে বোঝা যায়, 'ব' এবং 'র' বর্ণের ত্রিভুজাকার অংশটি সমান মাপের নয়। এইসব কারণে বলছিলাম, এ হরফের আকৃতি খুব পরিণত নয়।

প্রথম ব্যবহারের সময়েই পরিণতির প্রশ্ন উঠছে কেন? তার কারণ, বাংলা বিচল হরফের দিক থেকে দেখলে হালেদের বই প্রথম হতে পারে, কিন্তু ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় তার বহুদিন আগে থেকেই বিচল হরফে বই ছাপা হচ্ছিলো। গুটেনবার্গ বাইবেল ছেপেছিলেন ১৪৫৫-৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। অর্থাৎ বিচল হরফে ছাপার প্রযুক্তি, সে হরফের টাইপ বা ছাঁদ তৈরি করার প্রযুক্তি, ইউরোপে এ সবই তখন মোটামুটি তিনশো বছরের পুরোনো। তবু আরও ভালো হরফ তৈরি করা গেলো না, সম্ভবত অভিজ্ঞ ইউরোপীয় কারিগরদের এ কাজে সরাসরি নিয়োগ করা যায়নি বলে। আগেই বলেছি, হালেদের বইয়ের বাংলা হরফের সাট তৈরি করেছিলেন চার্লস উইলকিন্স। তাঁর সম্পর্কে যতোটুকু যা পড়েছি, তাতে বোঝা যায় তাঁর উৎসাহ ছিলো অসীম, ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান ছিলো বিস্তর, কিন্তু ছাপানোর হরফ তৈরি করার অভিজ্ঞতা বোধ হয় তাঁর খুব বেশি ছিলো না।

হালেদের বই বেরোবার কয়েক দশকের মধ্যেই ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়লো হু-হু করে। বই ছাপাও হতে লাগলো প্রচুর। অতুল সুর হিসেব দিয়েছেন (২), '১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কলকাতায় ছিল ১৭টা ছাপাখানা। ...১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাপা হয়েছিল ৩৬৮টা বই।' মনে রাখতে হবে, ছাপাখানার সংখ্যা যা উনি দিয়েছেন, সেটা শুধু কলকাতা নগরের। কলকাতার বাইরে বাংলার অন্যত্রও বহু ছাপাখানা ছিলো। হালেদের ব্যাকরণই তো হুগলি থেকে ছাপা হয়েছিলো। তাহলে সারা বাংলায় ছাপাখানার সংখ্যা ছিলো আরও বেশি। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলায় অবস্থিত ছাপাখানা মানেই বাংলা ছাপাখানা নয়। অর্থাৎ অতুল সুর কলকাতার যে ১৭টা ছাপাখানার কথা বলেছেন, তারা সকলেই বাংলা ছাপতো কি না তা তাঁর লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে না। মুদ্রিত বইয়ের যে-সংখ্যা দিয়েছেন, তা কি শুধু বাংলা বইয়ের, না কি কলকাতার যাবতীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত সমস্ত বইয়ের, সে কথাও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে আন্দাজে মনে হচ্ছে বাংলা বইয়ের হিসেবই দিয়েছেন, নইলে হালেদের বই আবির্ভাবের বছর অর্থাৎ ১৭৭৮ থেকে হিসেব শুরু করবেন কেন খামোকা? সে যা-ই হোক, সংখ্যার কথা বাদ দিয়েও একটা কথা নিশ্চয়ই অনায়াসে বলা যেতে পারে। তা হলো, হালেদের ব্যাকরণ থেকে শুরু হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তার লাভ করেছিলো বাংলা ছাপা। হালেদের ব্যাকরণ তো বাংলা বই ছিলো না, ইংরিজিতে লেখা বইয়ের মধ্যে বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিলো তাতে। কিন্তু পুরোপুরি বাংলায় লেখা বইও প্রকাশিত হতে থাকলো। আর প্রকাশিত হলো নানারকমের শব্দকোষ বা অভিধান,

কর্মসূত্রে যেসব ইংরেজ বাংলায় এসেছিলেন তাঁরা যাতে কাজচলা গোছের বাংলা শিখতে পারেন, তার জন্য।

এরকম একটি অভিধান ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি*, সংকলকের নাম এ. আপজন। মুদ্রণ হয়েছিলো ক্রনিকল প্রেসে, যেখান থেকে *ক্যালকাটা ক্রনিকল* নামে একটি সাময়িকপত্র বার হতো। ৫ নম্বর ছবিতে আপজনের বইটির একটি পাতার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। হালেদের ব্যাকরণে বাংলা এবং ইংরিজি ছাপার হরফের মাপের যে বিরাট তফাতের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা এখানেও রয়েছে। হ্রস্ব-উ কারের একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম রূপ দেখা যাচ্ছে, অনেকটা ব-ফলার মতো। হালেদের বইয়ে এরকম উ-কার ছিলো না। এখন আমরা যেভাবে হ্রস্ব-উ-কার লিখি, সেরকম চিহ্ন দেখা যাচ্ছে একটি শব্দে, 'পুর্ণমাসি'। তবে এটি হ্রস্ব-উ-কারের চিহ্ন হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, না কি দীর্ঘ-উ-কারের চিহ্ন হিসেবে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে ছাপার মান হালেদের বইয়ের মতোই, পনেরো বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও সেদিকে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

অতুল সুরের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে একটা প্রশ্ন তোলা যায়। তাঁর হিসেবের কালসীমা একদিকে ১৭৭৮ কেন, তা নাহয় বোঝা গেলো। কিন্তু অন্যদিকে কেন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে তিনি একটি সীমারেখার মতো ধরছেন? এর কারণ খুব সহজ— ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন জগতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিলো। ওই বছরে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার মিশনারিদের অনলস ও বহুমুখী কর্মকাণ্ড চলেছিলো তিন দশকের সামান্য বেশি সময় ধরে। শুধু শ্রীরামপুর নয়, পরে কলকাতাতেও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বিশপ্‌স্ কলেজ, আমরা যাকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে চিনি। এসব জায়গাতেও ছাপাখানা ছিলো, বাংলা মুদ্রণের অগ্রগতিতে এসব ছাপাখানার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম কেরি এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড, এই তিনজন ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের কর্মকাণ্ডের নেতা। এঁদের মধ্যে ওয়ার্ড ছিলেন মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞ, কেরিও মিশনে যোগ দেওয়ার আগে মালদায় ছাপার মেশিনে কাজ করেছেন। হরফ বানানোর অভিজ্ঞতা এঁদের ছিলো কি না জানি না, কিন্তু ছাপার কাজে অভিজ্ঞতা থাকার ফলে ভালো হরফ কীভাবে কাটানো যায় সে সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চয়ই খানিকটা ধারণা ছিলো। হুগলিতে উইলকিন্সের সহযোগী হয়ে পঞ্চানন কর্মকার যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তা কাজে লাগানোর জন্য মিশনারিরা তাঁকে শ্রীরামপুরে নিয়ে এলেন। পঞ্চাননের বাকি কর্মজীবন কাটে এই মিশনেই। তাঁর জামাই মনোহর, এবং মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও কালক্রমে একই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে শ্রীরামপুরেই কাজ করেন। এঁরা ছাড়া অন্য কারিগরও হয়তো ছিলেন।

এঁদের ছত্রছায়ায় বাংলা হরফের চেহারার উন্নতি হতে থাকে দ্রুত। শ্রীরামপুর মিশন

(221)

প

পুর্ব্বপর জানিতে — to know an old ſtory

পুর্ব্বক — wearineſs

পুরি — houſe and home

পুরিতে — to fill up, to ſtuff

পুর্ণিত — full, filled up

পুর্ন্নমাসি — full moon

পুর্ন্ন হইতে — to be filled up

পুরান জ্বর — an intermitting fever

পুরু — a bolſter

পুরুস — a man

পুরুসঅঙ্গ — the penis

পুরুসকার করিতে — to make a preſent, ſbeſtow upon

পুসন্ন — ſufficiently

পুসন্ন হইতে — to be ſatisfied

পুঁছিতে — to cleanſe, wipe off

৫নং ছবি॥ আপজনের লেখা *ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি* বইয়ের ২২১ পৃষ্ঠা। [১] নম্বর সূত্র থেকে।

৯ অধ্যায় ।] লূকলিখিত সুসমাচার। ১৬৩

এইরূপে লোকদিগকে বিদায় করুন ; তাহারা গ্রামেং ও পাড়ায়ং গিয়া বাসস্থান লইয়া এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ
১৩ করুক। তখন তিনি কহিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে ভোজন করাও। তাহাতে তাহারা বলিল, আমাদের ঠাই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য মাত্র আছে, কিন্তু উহারা প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক হইবে, অতএব এ সকলের নিমিত্তে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় না করিলে হয় না।
১৪ তখন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, পঞ্চাশ ২ জন করিয়া তাহা-
১৫ দিগকে সারি ২ বসাও। তাহাতে তাহারা তদনুসারে লোক
১৬ সকলকে বসাইলে পর তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধন্য প্রদান করিলেন, এবং ভাঙ্গিয়া
১৭ লোকদিগকে পরিবেশন করিতে শিষ্যদিগকে দিলেন। তাহাতে সকলেই খাইয়া তৃপ্ত হইল, এবং অবশিষ্ট গুঁড়াগাড়া কুড়াইলে বার ডালি হইল।

১৮ পরে এক দিন নির্জনে শিষ্যগণের সহিত প্রার্থনা করণসময়ে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকেরা আমাকে কোন ব্যক্তি করি-
১৯ য়া বলে ? তাহাতে তাহারা কহিল, কেহ২ যোহন অবগাহক করিয়া বলে, কেহ২ এলীয় বলে, এবং পূর্বকালীন কোন ভবিষ্যদ্বক্তা
২০ কবরহইতে উঠিয়াছে এমন কথাও কেহ২ বলে। তখন তিনি কহিলেন, ভাল, তোমরা কি বল ? তাহাতে পিতর উত্তর করিল, তুমি
২১ ঈশ্বরের অভিষিক্ত। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সাব-
২২ ধান, এ কথা কাহাকেও কহিও না। পরে তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজকবর্গ এবং অধ্যাপকগণকর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া শেষে হত হইতে হইবে ; কিন্তু তৃতীয় দিবসে কবর-হইতে উঠিবেন।

২৩ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপন ইন্দ্রিয় দমন করুক, এবং ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ২ আইসুক ;
২৪ কেননা যে কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে সে পরমায়ু হারাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার নিমিত্তে প্রাণ হারাইবে
২৫ সে পরমায়ু পাইবে। আর কেহ যদি সমুদায় জগৎ পাইয়া আপনার প্রাণ হারায় ও বিনষ্ট হয়, তবে তাহার লাভ কি ?
২৬ অতএব যে কেহ লজ্জা প্রযুক্ত আমাকে কি আমার বাক্যকে অগ্রাহ্য করে মনুষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার এবং দূতের তেজেতে বেষ্টিত হইয়া আসিবেন সেই সময়ে তিনিও তাহাকে
২৭ লজ্জা দিয়া অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি-

27 ২৭

৬নং ছবি॥ কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ছাপা *লূকলিখিত সুসমাচার* গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা। [৭] নং সূত্র থেকে।

স্থাপিত হওয়ার বছর কুড়ি, অর্থাৎ হালেদের বই ছাপা হওয়ার বছর চল্লিশেকের মধ্যেই ছাপার ভোল পালটে যায়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ছাপা বইয়ের দিকে তাকালেও মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর তিন সিকিভাগ পার করার পরেও বিচল হরফে যেরকম ছাপা হতো, তার সঙ্গে এর মানগত খুব একটা পার্থক্য নেই। মিশনারি প্রেসের কাজের বিস্তারিত নমুনা দেখা যাচ্ছে ৬ নম্বর ছবিতে—*লূকলিখিত সুসমাচার* বইয়ের একটি পৃষ্ঠা। এটি মুদ্রিত হয়েছিলো ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে। এর হরফ কেটেছিলেন ভিনসেন্ট ফিগিন্স, সম্ভবত বাণিজ্যিক বিক্রির জন্য তৈরি বাংলা হরফ এইটিই প্রথম।

এই নমুনাটি একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আগেই বলেছি, এটিকে অনায়াসে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম বা অষ্টম দশকের ছাপার নমুনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। এটা অবশ্য শুধুই মানগত বিচারের কথা। না বলে দিলেও অন্যান্য নানা কারণে বোঝা যায়, এ ছাপা পুরোনো কালের। শব্দের দ্বিত্ব বোঝাতে '২' সংখ্যাটির ব্যবহার এখন হয় না, আমরা এখন 'গ্রামে২' না লিখে খোলসা করে 'গ্রামে গ্রামে' লিখতে এবং দেখতেই অভ্যস্ত। লেখার পাশে মার্জিনের মধ্যে বাক্যের সংখ্যা দেখলেও আশ্চর্য লাগে, তবে বাইবেলের সুসমাচার গ্রন্থে এরকম বাক্যসংখ্যা লিখে দেওয়ার রেওয়াজ এখনো আছে। কিন্তু এসব নয়, প্রাচীনত্বের আসল চিহ্ন হলো কিছু কিছু বর্ণের চেহারা।

চোখে পড়ছে, অনুস্বর ছিলো অন্য রকম দেখতে। আজকের অনুস্বরের তলার দিকে যে-দাগটা থাকে, সেটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। হালেদের বইয়েও এই রকম অনুস্বর ছিলো, ৩ নম্বর ছবিটা যাঁরা খুঁটিয়ে দেখেছেন তা হয়তো তাঁদের চোখ এড়ায়নি। য-ফলা যোগে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের যে-চেহারা দেখা যাচ্ছে, তা-ও খানিকটা অদ্ভুত, যদিও বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না। 'শিষ্য' লেখার সময়ে য-ফলার যে-রূপ ব্যবহৃত হয়েছে সেটিই আজকের স্বীকৃত রূপ। কিন্তু এ ছাড়া 'খাদ্যদ্রব্য' শব্দে দেখছি 'দ্য' আর 'ব্য', 'মৎস্য' শব্দে দেখছি 'স্য', 'অধ্যাপক'-এ দেখছি 'ধ্য', শেষ থেকে চতুর্থ লাইনে 'বাক্য' শব্দে 'ক্য'—সবকটিতেই বর্ণের ডানদিকের খাড়া দাঁড়িটা আর য-ফলাটা মিলে কমলালেবুর কোয়ার মতো একটা আকার ধারণ করেছে। এমনকী ২২ নম্বর বাক্যের 'মনুষ্য' শব্দে 'ষ্য' লিখতেও এই কোয়ার মতো চেহারা ব্যবহার করা হয়েছে। দন্ত্য 'ন', দন্ত্য 'স' ইত্যাদির সঙ্গে য-ফলা যোগ করার জন্য এইরকম রূপ পরেও বহুদিন চলেছে, কিন্তু ৬ নম্বর ছবির পৃষ্ঠাটি দেখে মনে হচ্ছে, মিশনারিদের প্রেসে কোয়ার মতো করে য-ফলা দেওয়াই ছিলো স্বাভাবিক, আজকের মতো করে আলাদা য-ফলা ছিলো ব্যতিক্রম।

আর একটা বর্ণচিহ্নের প্রয়োগেও রূপভেদ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ঋ-কারের কথা বলছি। ১৬ নম্বর বাক্যের 'দৃষ্টি' বা ১৭ নম্বর বাক্যের 'তৃপ্তি', ২২ নম্বর বাক্যের 'তৃতীয়'—এইসব শব্দে ঋ-কারের দেখা মিলছে। দেখতে পাচ্ছি, আজকে আমরা যেরকম দেখতে অভ্যস্ত, সেভাবে ঋ-কার আলাদাভাবে বর্ণের তলায় গিয়ে বসেনি। ব্যঞ্জনবর্ণটির তলার দিকটাই দুমড়ে মুচড়ে তার সঙ্গে ঋ-কার জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

OF ANOMALOUS FORMS OF COMPOUND LETTERS.

4. By the practice of writing quick, some compounds of consonants and vowels have been contracted into a form peculiar to themselves.

Examples.

কৃ *kṛi*	ক্ল *klŏ*	ক্র *krŏ*	ক্ষ *kshŏ*	ক্ষ্ম *kshmŏ*	ঙ্ক *ngkŏ*
গু *gu*	গ্ধ *gdhŏ*	ঙ্গ্র *nggrŏ*	জ্ঞ *jnŏ*	জ্য *jyŏ*	ঞ্চ *nchŏ*
ট্ট *ṭṭŏ*	ণ্ড *ṇḍŏ*	ণ্ডু *ṇḍu*	ত্ত *ttŏ* or *tu*	ত্থ *t'thŏ*	ত্য *tyŏ*
ত্র *trŏ*	ত্রু *tru*	ত্ত্র *ttrŏ*	দ্ধ *d'dhŏ*	ন্ত *ntŏ*	ন্তু *ntu*
ন্ত্র *ntrŏ*	ন্ধ *ndhŏ*	প্ত *ptŏ*	ব্দ *bdŏ*	ভ্র *bhrŏ*	ভ্রূ *bhrū*
রু *ru*	রূ *rū*	শু *ṣu*	ষ্ণ *shṇŏ*	স্ত *stŏ*	স্তু *stu*
স্ত্র *strŏ*	স্থ *sthŏ*	হু *hu*	হৃ *hṛi*	হ্ন *hnŏ*	হ্ম *hmŏ*

৭নং ছবি॥ ১৮২১-এ প্রকাশিত *Rudiments of Bengali Grammar* বইয়ের একটি পৃষ্ঠার অংশ। লেখক গ্রেভ্স্ চেম্নি হটন্। [৭] নং সূত্র থেকে।

তবু, হালেদের ব্যাকরণের ছাপার তুলনায় এই ছাপার আকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক রূপের কাছাকাছি এসেছে। ৪ নম্বর ছবিতে যে বিশেষ রূপে 'তু' দেখেছিলাম, তা ৬ নম্বর ছবির নমুনায় দেখতে পাচ্ছি না, ২০ নম্বর বাক্যে যেখানে 'তুমি' লেখা হয়েছে, সেখানে দিব্যি এখনকার মতো রূপই দেখা যাচ্ছে। 'র' সর্বত্রই আজকের মতো ফুটকি দেওয়া চেহারায়।

'কু' বা 'জ্ঞ' এই পাতায় দেখা যাচ্ছে না, তাই হালেদের ব্যাকরণে এদের যে বিশেষ রূপ ছিলো তার বদলে আধুনিক রূপ এসেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না ছবি দেখে। তার জন্য দেখা যাক ৭ নম্বর ছবিতে একটি বইয়ের খানিকটা অংশের প্রতিলিপি—এ বইয়ের নাম *Rudiments of Bengali Grammar*, লেখক গ্রেভ্স্ চেম্নি হটন্, প্রকাশকাল ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশস্থল লন্ডন। হালেদের ব্যাকরণের মতো এ বইয়েও রয়েছে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের একটি তালিকা। তার মধ্যে 'কু' লেখার জন্য কোনো বিশেষ চিহ্নের কথা উল্লিখিত হয়নি, 'জ্ঞ' লেখার জন্য যে-চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে তার চেহারা আধুনিক রূপের মতোই। মনে হয়, অন্য যে-রূপগুলি আগে প্রচলিত ছিলো, এই সময় নাগাদ তা অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো।

একটি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছিলো 'স্থ' যুক্তবর্ণটির রূপে। ৪ নম্বর ছবিতে এই বর্ণটি রয়েছে ছ-নম্বর পঙ্ক্তিতে। সেখানে পরিষ্কার একটি 'স'-এর নীচে পরিষ্কার একটি 'থ' বসেছে। ৬ নম্বর ছবির দ্বিতীয় লাইনে 'বাসস্থান' শব্দে যেখানে এসেছে এই একই

যুক্তব্যঞ্জন, সেখানে 'স' পরিষ্কার নেই, মুড়ে গিয়ে ঢেউখেলানো রূপ ধারণ করেছে। তার নীচে যে-'থ' বসেছে, তার চেহারা হয়ে গেছে 'হ' বর্ণের মতো। অর্থাৎ যুক্তবর্ণের রূপটি দেখে বোঝার উপায় নেই কোন কোন বর্ণ জুড়ে সেটি তৈরি হয়েছে। হরফের আলোচনায় আজকাল এই ধরনের রূপকে বলা হয় 'অস্বচ্ছ'। 'স্থ' যুক্তবর্ণটির যে-রূপ দেখতে পাচ্ছি ৬ নম্বর ছবিতে, সেটি অস্বচ্ছ। হালেদের ব্যাকরণে অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের যে-তালিকা ছিলো, তার মধ্যে এটি ছিলো অনুপস্থিত, কিন্তু হটনের বইয়ের তালিকায়, ৭ নম্বর ছবিতে, এই অস্বচ্ছ 'স্থ' দেখা যাচ্ছে। তার মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই অস্বচ্ছ রূপটি চালু হয় বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই রূপটি এখনও চালু আছে, চালু আছে তার সঙ্গে আরও বহু যুক্তবর্ণের অস্বচ্ছ রূপও। স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ বর্ণের আলোচনা পরে বিস্তারিতভাবে করতে হবে, তখন এ সম্পর্কে আরও বলা হবে।

তৃতীয় পর্ব—বিদ্যাসাগরী আমল

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলেজের কর্তৃপক্ষের কেউ নাকি তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর খাবে কী করে?' লোকমুখে এ কথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেন, 'বোলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আনাজ বেচতে হয়নি বিদ্যাসাগরকে। জীবিকার জন্য তিনি একটি ছাপাখানা চালান। বাংলা মুদ্রণ এবং হরফের ব্যাপারে এই ঘটনাটির গুরুত্ব বিশাল। কিন্তু সে কথায় যাওয়ার আগে বর্ণমালা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনার কথা আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

বাংলা উচ্চারণের কথা ভেবে বাংলা বর্ণমালা যে নতুন করে নির্ধারণ করা উচিত, এ কথা প্রথম বলেছিলেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতের 'য়' বর্ণটি বাংলা শব্দে ক্ষেত্রবিশেষে দু-রকম ভাবে উচ্চারিত হতো, সে কথা এ লেখায় আগেই বলা হয়েছে। যেখানে এই উচ্চারণ 'জ'-এর মতো, সেখানে 'য' ব্যবহার করা, এবং সেই ফুটকিবিহীন রূপটিকে একটি আলাদা বর্ণ হিসেবে বিচার করা—এ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরই করেন, এবং *বর্ণপরিচয়* লেখার সময়ে বইয়ের ভূমিকায় সে কথা পরিষ্কার করে ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে একই জায়গায় ঘোষণা করেন, 'ড়', 'ঢ়' ইত্যাদি চিহ্ন, যেগুলো আগে 'ড' এবং 'ঢ'-এর রূপভেদ হিসেবেই গণ্য হতো, সেগুলোও আলাদা বর্ণ হিসেবে ধরা হবে। কারণ, এইসব চিহ্ন যেখানে ব্যবহৃত হতো, সেসব জায়গায় সংস্কৃতর নিয়ম মানলে 'ড' বা 'ঢ' উচ্চারিত হওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু বাংলায় সেরকম উচ্চারণ হয় না। আলাদা উচ্চারণের জন্য আলাদা বর্ণ।

যুক্তির এই ধারা অনুসরণ করলে আরও বেশ কিছু চিহ্ন যোগ-বিয়োগ করা যেতো হয়তো। বিদ্যাসাগর বর্জন করেছিলেন দীর্ঘ-ঋ আর দীর্ঘ-৯, এই দুটি বর্ণ। বলেছিলেন,

বাংলায় ওই দুটি বর্ণের 'প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।' কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এর পর আর খুব একটা এগোননি। তিনি জানতেন, শুধু দীর্ঘ-ঌ কেন, হ্রস্ব-ঌ, অর্থাৎ যাকে আমরা শুধুই 'লি' বলি, সেই বর্ণটিও বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। এ নিয়ে কিছু বলেননি। তিনি জানতেন, মূর্ধন্য 'ণ' বাংলা লেখায় ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু উচ্চারণের দিক থেকে দন্ত্য 'ন' বর্ণটির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই। এও জানতেন, 'শ-স-ষ' এই তিনটি বর্ণ তিনরকম উচ্চারণ বোঝায় না বাংলায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত বানানের আনুগত্য মেনে চলেছেন, ঘাঁটাবার চেষ্টা করেননি।

আধাখ্যাঁচড়া কাজ করার জন্য বিদ্যাসাগরের সমালোচনা যদি কেউ করতে চান করুন, কিন্তু তাঁকেও একটি কথা অন্তত মনে রাখতে হবে—বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কাজটা বিদ্যাসাগরই শুরু করেছিলেন। সংস্কৃতে যে-বর্ণমালা ব্যবহৃত হতো তা থেকে সরাসরি না টুকে বাংলা উচ্চারণের মতো করে বাংলার বর্ণমালা লেখা হবে, এটি একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত, এবং এর জন্য কৃতিত্ব যা পাওয়ার সেটা পুরোপুরিই বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য। বর্ণশিক্ষার জন্য যেসব বই আছে, তাতে বিদ্যাসাগরী এই সংস্কার স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়, পরবর্তী সংস্কারও কিছু হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিধানকারেরা আজ পর্যন্ত এ কথা মেনে নিতে পারেননি। এখনও অধিকাংশ বাংলা অভিধানে বর্ণক্রম নির্ধারণ করার সময়ে 'ড' এবং 'ড়' বর্ণ দুটিকে একই বর্ণ ধরা হয়, তাই 'ওডিকলোন' 'ওড়িয়া' 'ওড্র' এই তিনটি শব্দ এই অনুক্রমে পর পর আবির্ভূত হয় অভিধানে (৯)। অনমনীয়তার এই আশ্চর্য দৃষ্টান্তের পাশাপাশি যখন ভাবি, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের মুখ থেকে বর্ণমালা সংস্কারের কথাটি উচ্চারিত হয়েছিলো, তখন বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

হরফের আকৃতি সম্পর্কিত এই নিবন্ধে বর্ণমালার কথা বলছি কেন, সে প্রশ্নের উত্তর দিই এবার। আসলে বর্ণমালা নিয়ে বিদ্যাসাগরের এইসব চিন্তা তাঁর আর একটি বৃহত্তর চিন্তার অংশবিশেষ। সেই বৃহত্তর চিন্তাটি হলো—বাংলা ছাপার জন্য কতোগুলো এবং কী কী চিহ্ন দরকার হবে ছাপাখানায়? আগে বলেছি, বর্ণ ছাড়াও নানা চিহ্ন দরকার হয় ছাপবার জন্য। যতিচিহ্নের কথা ধরা যাক। মুদ্রণের যুগের আগে, এবং ছাপা শুরু হওয়ার পরেও প্রথম কয়েক দশক বাংলায় যতিচিহ্ন বলতে ছিলো শুধু দাঁড়ি আর ডবল দাঁড়ি—১, ২ বা ৪ নম্বর ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে আনুষঙ্গিক বিবিধ চিহ্ন আমদানি করলেন মিশনারিরা, উনবিংশ শতকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক নাগাদ। ৬ নম্বর ছবিতে দেখতে পাচ্ছি কমা-সেমিকোলোন-প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার। এমনকী, পাতার ওপরে যেখানে অধ্যায়ের সংখ্যা লেখা আছে, তার পাশে ব্র্যাকেটও দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত চিহ্নই খুব কার্যকরী হয়েছিলো ভাবপ্রকাশের কাজে, সুতরাং বাংলা ছাপার ডালায় এগুলো সবই প্রয়োজনীয়।

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। বাংলা বা অন্যান্য প্রায় সমস্ত ভারতীয় লিপিতে লিখতে গেলে এ সবকিছুর পরেও আরও বিশাল সংখ্যক চিহ্নের দরকার হয় যুক্তবর্ণের জন্য। সাধারণত আমরা যাকে 'যুক্তাক্ষর' বলি, একটু খুঁটিয়ে বললে তাকে বলা যেতে পারে

'যুক্তব্যঞ্জন'। এগুলো নিশ্চয়ই যুক্তবর্ণ, তবে এগুলো ছাড়া আরও যুক্তবর্ণ আছে। ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনি যুক্ত থাকলে স্বরবর্ণের বিশেষ চেহারা হয়, যাকে আমরা 'ই-কার' 'উ-কার' ইত্যাদি বলি। সে চিহ্নগুলোও যুক্তবর্ণের চিহ্ন, যুক্তব্যঞ্জনের থেকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য সেগুলোকে 'যুক্তস্বর' চিহ্ন বলা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের আগে সেসব হরফে বাংলা ছাপা হতো, তাতে এই দু-ধরনের চিহ্নের ক্ষেত্রেই কিছু কিছু রূপভেদ চালু ছিলো, তা আমরা দেখেছি। বিদ্যাসাগরের কাম্য ছিলো, এক ও অদ্বিতীয়ভাবে লেখা হোক প্রতিটি বর্ণচিহ্ন, সমস্ত রূপভেদ ঘুচে যাক।

এই সমতাবিধানের জন্য ছাপার হরফের নানা পরিবর্তন পরিমার্জন করতে শুরু করলেন তিনি। কোনোরকম কার্যপ্রণালী ঠিক করে এগিয়েছিলেন কি না, করলে কীরকম ছিলো তা, সে কথা কখনো ঘোষণার আকারে বলেননি বিদ্যাসাগর। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, কাজের ফলাফল থেকে তাঁর কাজের সূত্র আবিষ্কারের।

প্রথমেই একটা সূত্র বলে নেওয়া যেতে পারে, তা হলো, বিদ্যাসাগর ছাপার জন্য একটিও নতুন চিহ্ন তৈরি করেননি। ছাপায় এবং লেখায় তাঁর সময়ে যা যা চিহ্ন ব্যবহৃত হতো, তা থেকেই ঝেড়েবেছে সমতা আনার চেষ্টা করেছেন। কোথাও-কোথাও তাঁর পূর্বসূরিরাই কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছেন মাত্র। যেমন ধরা যাক 'র' বর্ণের চেহারার কথা। হালেদের বই প্রকাশের সময়ে বর্ণটি দু-রকমের চেহারায় লেখা হতো ঠিকই, কিন্তু ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফুটকি দেওয়া রূপটিই মোটামুটি সর্বত্র চালু হয়ে যায়। বিদ্যাসাগরও এই রূপটিই ব্যবহার করেন, পেটকাটা 'র'-এর কথা কোথাও উল্লেখ করেননি তিনি। যেসব বর্ণের বিভিন্ন রকম চেহারা আছে, *বর্ণপরিচয়* লেখার সময়ে তাদের রূপভেদ উল্লেখ করা প্রত্যাশিত ছিলো, যাতে শিক্ষার্থী ভিন্ন রূপ দেখলেও চিনতে পারে। কিন্তু কোথাও সেরকম কিছু বলেননি, পেটকাটা চিহ্নটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।

কোথাও কোথাও বিদ্যাসাগরের কাজ হয়েছিলো অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণের চিহ্নকে স্বচ্ছ করা। অস্বচ্ছ রূপগুলো যে সর্বসম্মত ছিলো তা নয়, পাশাপাশি অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ দু-রকম রূপই চালু ছিলো ছাপার হরফে। তার মধ্যে স্বচ্ছ রূপগুলোকে বেছে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ৬ নম্বর ছবিতে য-ফলা বসানোর জন্য বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের ডানদিক মুড়ে দেওয়া হয়েছে, সে কথা বলছিলাম খানিকক্ষণ আগে। এর জন্য য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বিশেষ ছাঁদ রাখতে হতো ছাপাখানায়। বাহুল্যবোধে এর অনেকগুলিই বর্জন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। 'ক্য' 'ধ্য' 'ব্য' ইত্যাদি যুক্তবর্ণ তাঁর সময় থেকে দুটি আলাদা চিহ্ন হিসেবেই ছাপা হতে লাগলো। ৭ নম্বর ছবিতে দেখছি, 'জ্য' এবং 'ত্য' লেখার জন্য বিশেষ অস্বচ্ছ রূপ আগে চালু ছিলো— এগুলোও স্বচ্ছ হয়ে গেলো বিদ্যাসাগরের পর থেকে। 'ষ্য' বোঝানোর জন্য ৬ নম্বর ছবিতে যে দু-রকম রূপ ছিলো, তার মধ্যে সরলভাবে 'ষ' লিখে তার ডানদিকে য-ফলার চিহ্ন দেওয়া যে-রূপটি, সেইটিই বিদ্যাসাগর গ্রহণ করলেন তাঁর হরফে।

ঋ-কারের জন্য যেসব বিশেষ রূপের দেখা পেয়েছিলাম ৬ এবং ৭ নম্বর ছবির

নমুনায়, সেসবও উঠে গেলো বিদ্যাসাগরী আমলে। 'কৃ', 'তৃ' 'দৃ' ইত্যাদি লেখার জন্য সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণটি লিখে তার তলায় পরিষ্কার ঋ-কারের চিহ্ন দেওয়ার বিধান চালু হলো। অর্থাৎ এই চিহ্নগুলি স্বচ্ছ হলো। ১ নম্বর ছবি থেকে শুরু করে 'তু' লেখার যে বিশেষ চিহ্নটি দেখেছিলাম, সেটিকেও সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রবর্তন করা হলো স্বচ্ছভাবে 'ত'-এর নীচে উ-কার দেওয়ার অবিকল্প রীতি। এইসব অস্বচ্ছ চিহ্ন এর পরে আর কোনোদিনই ব্যবহৃত হয়নি বাংলায়।

কিন্তু এই ধারায় সংস্কারের পথে খুব বেশিদূর এগোলেন না বিদ্যাসাগর। 'ধ্য' 'ষ্য' ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ রূপটি অবিকল্পভাবে চালু করলেন, কিন্তু 'দ্য', 'ন্য' বা 'শ্য' লেখার জন্য সেই কমলাকোয়ার মতো ডানদিক-মোড়া রূপটিই নিলেন। 'ত' বা 'দ' বর্ণে ঋ-কারের চিহ্ন স্বচ্ছ করে দিলেন, কিন্তু 'হ'-এর সঙ্গে ঋ-কার রয়ে গেলো অস্বচ্ছভাবে, ডানদিকে একটি আঁকড়ির মতো। 'তু' যেখানে পূর্ণ বর্ণ, সেখানে তার অস্বচ্ছ রূপটি তুলে দিলেন, কিন্তু 'ন্তু' 'স্তু' ইত্যাদি যুক্তবর্ণে সেখানে আরও একটি ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'তু', সেখানে তার রূপ অস্বচ্ছই রয়ে গেলো। বিদ্যাসাগরী এই সাটে এখনও ছাপা হয়, ৮ নম্বর ছবিতে সাম্প্রতিক উদাহরণ দেখা যাচ্ছে একটা। এতে দেখতে পাচ্ছি, প্রথম লাইনে 'দু' এবং শেষ থেকে তৃতীয় লাইনে 'ন্য' লেখার বিশেষ চিহ্ন। দেখতে পাচ্ছি, 'ঙ্+গ', 'ক্+ত', 'হ্+ম' ইত্যাদি লেখার জন্য অস্বচ্ছ চিহ্ন। শুধু এই কটি চিহ্নেই নয়, বিদ্যাসাগরী হরফে অস্বচ্ছতা আছে আরও নানা বর্ণচিহ্নের চেহারায়, সে কথায় পরে আবার আসবো।

মা ব্যাটাকে দু চক্ষে দেখতে পারনা। তাই ছেলেটার ভালমন্দ নিয়েও তোমার কোনো মাথাব্যথা নেই। সে এখন উপযুক্ত হয়েছে দেখছ কিন্তু তার বিয়ে দেবার জন্যে একটি মেয়ে খোঁজারও কোনো চাড় নেই তোমার!"
ব্রাহ্মণ বলল, "বল কি ব্রাহ্মণী? আমাদের ছেলের জন্যে পাত্রী? তোমার কি ধারণা সাপের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেবে?"

৮নং ছবি॥ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ছাপা একটি বইয়ের [১০] একটি পৃষ্ঠার অংশ।

কেন এরকম হলো, সেটা খানিকটা রহস্য। এক হতে পারে, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ কিছু ভাবনাচিন্তা করেননি বিদ্যাসাগর, যেখানে রূপভেদ ছিলো সেখানে এলোপাথাড়িভাবে একটি রূপ বেছে নিয়েছেন। অসম্ভব নয়, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের কথা বলা হচ্ছে বলে এই যুক্তি মনে ধরে না। হয়তো অন্য কোনো কারণ ছিলো, পরে এরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বিভিন্ন বর্ণচিহ্নের রূপ এইভাবে বেঁধে দেওয়ার পরে বিদ্যাসাগর করলেন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি। প্রশ্নটা হচ্ছে, বিচল হরফের বিভিন্ন বর্ণচিহ্নের ছাঁদগুলো কীভাবে রাখা হবে? ইংরিজি হরফের ক্ষেত্রে এর একটা সর্বসম্মত রূপ তার আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো—দুটি ডালায় বিভিন্ন খোপে রাখা হতো বর্ণচিহ্নগুলো। বাংলা হরফের ডালা কটা হবে বা কীরকম হবে, তার কোথায় কোন চিহ্ন থাকবে, তা নিয়ে খুব একটা চিন্তাভাবনা আগে হয়নি। কোন বর্ণচিহ্ন কীরকম ব্যবহার হয়, তা চিন্তা করে বিদ্যাসাগর মশাই এই ডালার একটা নকশা করেন। তিনি নিজে এই নকশা অনুযায়ী বর্ণচিহ্ন রাখতে শুরু করেন, এবং অন্য মুদ্রকদেরও সেই বিন্যাস গ্রহণ করতে উৎসাহ দিতে থাকেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং চেষ্টায় সেই ডালা কালক্রমে সকলেই ব্যবহার করতে থাকেন। বাংলা ছাপায় একটা সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়—একই ডালার একই খোপে একই বর্ণচিহ্ন রাখতে থাকেন সবাই।

চতুর্থ পর্ব—লাইনো ছাপা

বিদ্যাসাগরী ধাঁচে ছাপা চললো প্রায় এক শতাব্দী ধরে। এই সময়ের মধ্যে ছবি ছাপানো ইত্যাদি ব্যাপারে মুদ্রণপ্রযুক্তির উন্নতি হলো অনেক, কিন্তু হরফের চেহারার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরী ধাঁচ রয়ে গেলো এক ও অদ্বিতীয়। দু-একজন কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। তাও হরফের চেহারার বদল নয়, একই চেহারার চিহ্ন দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নেওয়া যায় কি না তার চেষ্টা।

এই প্রচেষ্টারও শুরু বিদ্যাসাগরের হাতেই। আগেই বলেছি, ছাপার হরফে বর্ণচিহ্ন যতিচিহ্ন সংখ্যাচিহ্ন ছাড়াও কিছু বাড়তি চিহ্ন থাকে। তার মধ্যে একটি হলো তারাচিহ্ন। এই চিহ্নটিকে একটি বিশেষ কাজে লাগালেন বিদ্যাসাগর। সংস্কৃতর নিয়মে বললে যেগুলো অ-কারান্ত শব্দ, বাংলা উচ্চারণে সেসব শব্দের কোনোটির উচ্চারণ হয় হসন্ত—যেমন 'চরণ', 'দিবস'—আবার কোনাটির উচ্চারণ হয় ও-কারান্ত—যেমন 'বিগত', 'চন্দ্র'। এই দুই গোত্রের শব্দের মধ্যে গুলিয়ে যাতে না যায়, শিক্ষার্থীরা যেন 'বিগত' শব্দটি 'বিগৎ' না উচ্চারণ করে, তার জন্য ও-কারান্ত উচ্চারণ হয় যেসব শব্দের, সেখানে একটি তারাচিহ্ন দিয়ে তা বোঝাবার ব্যবস্থা করেন বিদ্যাসাগর। ৬০-তম সংস্করণ থেকে শুরু করে *বর্ণপরিচয়* এইভাবেই ছাপা হতে থাকে। এই কৌশল গৃহীত হলে বাংলায় তারাচিহ্ন একটি স্বরচিহ্নের মতো ব্যবহৃত হতে পারতো। কিন্তু *বর্ণপরিচয়* বইয়ের বাইরে আর কোথাও এই চিহ্নের ব্যবহার ঘটেছে বলে জানি না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অনেক লেখক উর্ধ্বকমা চিহ্নটি এই একই কাজে ব্যবহার করতেন—শব্দের শেষে শুধু নয়, অন্যত্রও। এই ব্যবহারও এখন অপ্রচলিত।

আর একটি প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগরী হরফে এ-কার লেখার জন্য দুটি আলাদা চিহ্ন ছিলো। একটি মাত্রাওলা, শব্দের মধ্যে সেটি ব্যবহৃত হতো। অন্যটি

মাত্রাহীন, বসতো শব্দের গোড়ায় এ-কার থাকলে। রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করলেন এই দুটি চিহ্ন দুটি কাজে ব্যবহার করতে। বিশ্বভারতী প্রকাশনবিভাগ থেকে যে-সমস্ত বই বেরোতে লাগলো, তাতে তিনি মাত্রাওলা এ-কার ব্যবহার করতে শুরু করলেন 'এক' শব্দটির প্রারম্ভিক স্বরধ্বনিটি বোঝাবার জন্য। *সহজ পাঠ* বই যখন বার হলো, তার পুস্তানিতে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এ কথা। এই ধ্বনিটি সংস্কৃতে ছিলো না, বাংলায় এসে গেছে ধ্বনি-পরিবর্তনের নানান সরনি বেয়ে, অথচ এর জন্য কোনো বর্ণ তৈরি হয়নি বাংলায়—এই অভাবটি পূরণ করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাধু প্রচেষ্টা, কিন্তু বিশ্বভারতী ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশকই এ প্রস্তাবটিকে পাত্তা দেননি।

এ ধরনের পরিবর্তনের কথা আরও কেউ কেউ বলেছিলেন, সীমিত ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগও হয়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কিছুই চালু হয়নি। এইসব বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার বিস্তারিত ইতিহাসে আর যাচ্ছি না। দু-একটি যুক্তবর্ণ পরে যোগ করা হয়েছিলো বিদ্যাসাগরী সাটে, তাদের কথা পরে বলবো। বিদ্যাসাগরী হরফের চেহারার প্রথম বড়োসড়ো পরিবর্তন হয় ১৯৩০-এর দশকে, সেই কথাতেই আসা যাক।

ইউরোপে লাইনো ছাপার মেশিন চালু হয় উনবিংশ শতকের শেষ দিকে। এই মেশিনে বর্ণসংস্থাপন করার জন্য প্রতিটি বর্ণচিহ্নের আলাদা আলাদা টাইপ বা ছাঁদের দরকার হয় না। মেশিনের বাইরে থাকে টাইপমেশিনের মতো একটি কি-বোর্ড বা চাবির ডালা। একদিক থেকে লাইনো মেশিনটি টাইপ মেশিনের বৃহৎ সংস্করণ বলা যেতে পারে, এই চাবির ডালায় বর্ণগুলো টাইপ করে যেতে হয়। তফাতটা হচ্ছে, টাইপ মেশিনের মতো ভেতরে প্রতিটি চিহ্নের জন্য আলাদা আলাদা ছাঁদ বা টাইপ থাকে না, থাকে প্রতিটি চিহ্নের আলাদা ছাঁচ। টাইপে বর্ণের লাইনগুলো উঁচু হয়ে বেরিয়ে থাকে, ছাঁচে থাকে গর্তের মতো নিচু হয়ে। যেসব বর্ণ টাইপ করা হচ্ছে, তাদের ছাঁচগুলো এক লাইনে এসে জমা হতে থাকে। একটি লাইন টাইপ করা শেষ হলে গোটা লাইনের ছাঁচগুলো নিয়ে তার ওপরে গলিত ধাতু ঢেলে দেওয়া হয়। তাতে গোটা লাইনটারই একটা ছাঁদ তৈরি হয়ে যায়। এমনি করে লাইনের পর লাইন ছাঁদ তৈরি করে তা দিয়ে ছাপা হয়।

সাবেকি মেশিনে প্রতিটি বর্ণের ছাঁদ বসতো আলাদাভাবে। এমনি করে গোটা একটি পৃষ্ঠার সব লাইন একত্রে নিয়ে সেগুলোকে শক্ত করে বাঁধা হতো। তা থেকে ছাপা হতো। মুশকিল হচ্ছে, ছাপার সময়ে ধাক্কায় ধাক্কায় টাইপগুলো ক্রমশ নড়েচড়ে যেতো। বেশি কপি ছাপতে গেলে তাই মাঝেমাঝেই ভালো করে বেঁধে নিতে হতো টাইপগুলোকে। এতে সময় নষ্ট হতো, ছাপাও ভালো হতো না। তা ছাড়া বারংবার ব্যবহারের ফলে টাইপগুলোও ক্ষয়ে যেতো, ছাপা ভালো না হওয়ার সেটাও একটা কারণ।

লাইনো হলে এই দুই সমস্যা থেকেই রেহাই পাওয়া সম্ভব। প্রতিবার নতুন করে লাইন ঢালাই করে নিতে হয় বলে টাইপ ক্ষয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুই লাইনের মধ্যে সিসে ঢোকাতে হয় না, টাইপ নড়ে যায় না সহজে। তা ছাড়া এক পাতায় বেশি লাইন ছাপা যায়, কাজেই কাগজের সাশ্রয় হয়। এ কথা চিন্তা করে বাংলায় লাইনো মেশিন

প্রবর্তনের কথা চিন্তা করেন তৎকালীন প্রকাশকেরা। বিশেষ করে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী উদ্যোগী হন এ ব্যাপারে।

হলে তো ভালো হয়, কিন্তু বাধা বিশাল। লাইনো মেশিনে মেরেকেটে শ-আড়াই চিহ্ন বসানো যেতে পারে। বিদ্যাসাগরী হরফে যতো চিহ্ন দরকার হয়, তার সংখ্যা যে এর থেকে অনেক বেশি!

কতো চিহ্ন দরকার হতো বিদ্যাসাগরী পদ্ধতিতে, তার একটা ধারণা করা যাক। বিদ্যাসাগরের হিসেব অনুযায়ী বর্ণমালায় ১২টা স্বরবর্ণ আর ৪০টা ব্যঞ্জনবর্ণ। এর সঙ্গে সংখ্যাচিহ্ন ১০টা, যতিচিহ্ন গোটা দশেক, তারা ব্র্যাকেট ইত্যাদি হাবিজাবি নাহয় আরও গোটা পনেরোই হলো। এতে সব মিলিয়ে শ-খানেক চিহ্নও হচ্ছে না।

কিন্তু এ তো সবে শুরু! যুক্তব্যঞ্জনের চিহ্ন প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক, তা সহজেই বোঝা যায়। সহজে যা বোঝা যায় না তা হলো, এ ছাড়াও লাগবে প্রচুর পরিমাণ যুক্তস্বরের চিহ্ন, অর্থাৎ আমরা যেগুলোকে ই-কার উ-কার ইত্যাদি বলি তাদের চিহ্ন। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, এরকম যুক্তস্বরের চিহ্ন কটাই বা হবে! ১২টা তো মোটে স্বরবর্ণ, তারও আবার 'অ' আর '৯'-এর জন্য যুক্তস্বরের চিহ্ন দরকার হয় না। ও-কার লিখতে গেলেও আলাদা চিহ্ন লাগে না। তাহলে বাকি থাকে মোটে নটা।

ভুল হলো। হিসেবটা তার চেয়ে অনেক জটিল এবং লম্বা। তার প্রধান কারণ, ই-কার ঈ-কার বসে মাথার ওপরে ছাতার মতো, উ-কার ঊ-কার ঋ-কার বসে পায়ের নিচে। পাশাপাশি টাইপ বসিয়ে বসিয়ে যখন বর্ণসংস্থাপন করা হচ্ছে, তখন খাড়াভাবে টাইপ লাগানো যায় না। অর্থাৎ 'ক'-এর একটি ছাঁদ বসিয়ে তার তলায় একটি উ-কারের ছাঁদ বসানো যাবে না। সে জায়গায় ব্যবহার করতে হবে পুরো 'কু'-র জন্য একটি ছাঁদ। তেমনই লাগবে 'কূ'-র জন্যও আলাদা একটি ছাঁদ, 'কৃ'-র জন্য আরও একটি। এমনি করে সমস্ত ব্যঞ্জনের জন্য যদি হিসেব করা যায, তাহলে দেখবো কয়েকশো চিহ্ন এখানেই দরকার হচ্ছে। তার ওপরে যুক্তব্যঞ্জনেও এইসব স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে! চুলচেরা হিসেব করে কিছু বাদছাদ দেওয়া যায়, যেমন ধরা যাক 'চ' বা 'ঢ'-এ ঋ-কার দেওয়ার দরকার পড়ে না, 'ঞ'-এর সঙ্গে 'উ' বা ঊ কারের চিহ্নের কথাও ভাববার খুব দরকার নেই। তবু, সব হিসেবের শেষে যে-সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তা হাজারখানেকের কাছাকাছি।

করণ টাইপ প্রবর্তিত হয়ে এই সংখ্যাটা অনেকটা কমেছিলো। হরফের চেহারার তাতে কিছুই পরিবর্তন হয়নি বলে সে কথা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো না। শুধু বলে রাখি, করণ টাইপ মানে এক রকমেব কাটা টাইপ, যার কাটা দিকে অন্য বর্ণের ছাঁদ গুঁজে দেওয়া যায়। 'কি' লেখার জন্য একটা ছাঁদ না রেখে যদি ই-কারের জন্য একটি করণ টাইপ রাখা যায়, তাহলে প্রথমে সেটি বসিয়ে বসিয়ে তার ছাতার মতো অংশটির কাটা ফাঁকের মধ্যে 'ক'-এব টাইপ গুঁজে দেওয়া যায়। তাহলে এই একই ই-কারের টাইপ সমস্ত বর্ণের সঙ্গেই ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে কিছুটা সাশ্রয় হয়, কিন্তু তাহলেও মোট চিহ্নের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০-র কাছাকাছি।

কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা, বাঁশঝাড় যেন ঘোর আকাশেতে খোঁচা। মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ ভানু, তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু। দু-চোয়াল বহি পড়ে সাদা সাদা লোল, আহ্লাদি পাহাড়ি নাচে বিশ হস্তে ঢোল। ছাড়েন হুংকার প্রভু দন্ত কড়মড়ি, জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে দড়বড়ি। ভয় পাওয়া দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা, কহে—দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা। ইন্দ্র বলে ওরে বাপা কিবা বুদ্ধি দিলে, রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে। চক্ষু বাঁধ ফেট্টা বাপা কানে দাও তুই, ললাটে ভেজাওগো মুখা দাও চোক দুই।	কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা বাঁশঝাড় যেন ঘোর আকাশেতে খোঁচা। মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ ভানু, তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু। দু-চোয়াল বাহি পড়ে সাদা সাদা লোল, আহ্লাদি পাহাড়ি নাচে বিশ হস্তে ঢোল। ছাড়েন হুংকার প্রভু দন্ত কড়মড়ি, জীব জন্তু যে যেখানে ভাগে দড়বড়ি। ভয় পাওয়া দেবগণ ইন্দ্রে দেয় ঠেলা কহে -দেবরাজ হান বজ্র এইবেলা। ইন্দ্র বলে, ওরে বাপ! কিবা বুদ্ধি দিলে, রহিবে পিতার নাম আপুনি বাঁচিলে। চক্ষে বাঁধ ফেট্টা বাপা কানে দাও তুই ললাটে ভেজাওগো মুখা দাও চোক দুই।
(ক)	(খ)

৯নং ছবি॥ *পরশুরাম বচনাবলী*-র দুটি সংস্করণের [১১] ছাপার নমুনা। 'ক' অংশে বিদ্যাসাগরী সাটে ছাপা, 'খ' অংশে লাইনো ছাপা।

এই হলো বিদ্যাসাগরী ছাপার প্রধান মুশকিল। এই বিপুল সংখ্যার জন্য বাংলা কম্পোজ করতে সময় বেশি লাগে, খরচ বেশি লাগে, এই জন্যই বাংলা ছাপায় ভুল এতো বেশি হয়। এবং এই কারণেই লাইনো মেশিনেও বিদ্যাসাগরী ধাঁচের হরফ সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

১৯৩০-এর দশকে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর কর্ণধার ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা হরফের চেহারা বদলে তাকে লাইনো মেশিনোর উপযোগী করে তোলা যায় কি না, এ ব্যাপারে তিনি চিন্তাভাবনা শুরু করে দিলেন। উপদেষ্টা হিসেবে পেলেন রাজশেখর বসুকে।

কী করে বর্ণচিহ্নের সংখ্যা কমানো যায়? কয়েকটি সিদ্ধান্ত খুব সহজে নেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক, 'ন্য' যদি ৮ নম্বর ছবির মতো না ছাপি, 'ন্য' লেখার জন্য আলাদা একটি ছাঁদ লাগে না। একই কথা বলা যায় 'দ্য' 'শ্য' ইত্যাদির জন্য।

বানানের বিবর্তনে ইতিমধ্যে দু-একটি বর্ণচিহ্ন অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিলো। আগে 'সংগ্রহ' শব্দের বানানে ছিলো 'ঙ্+গ্+র', লেখা হতো ৩ নম্বর ছবির 'হালেদঙ্গেজী' শব্দটিতে যেভাবে লেখা হয়েছে সেইরকম করে। 'পুত্র' শব্দটির বানানে ছিল

'ত্+ত্+র'—যেভাবে লেখা হতো তা দেখা যাচ্ছে ৬ নম্বর ছবির তলা থেকে তৃতীয় লাইনে। এসব বানান উঠে যাওয়ায় এসব যুক্তিচিহ্নও ছাঁটাই করা যায় হরফ থেকে।

ঠিক, কিন্তু শুধু এভাবে এগোলে ব্যবহার্য মোট চিহ্নের সংখ্যা ডজনখানেকও কমবে কি না সন্দেহ। অথচ প্রয়োজন কয়েকশো চিহ্ন কমানোর। কাজেই আরও মূলে আঘাত না করে উপায় নেই, এবং বহু চিন্তাভাবনার পর তার জন্য দুটি অসাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন সুরেশচন্দ্র।

এর মধ্যে প্রথমটি যুক্তস্বর চিহ্ন সম্পর্কে। সুরেশচন্দ্র বললেন, মাথার ওপরে বা পায়ের তলায় এদের স্থান দেওয়ার দরকার নেই। পর পর যেভাবে বর্ণচিহ্ন বসে, এরাও সেভাবেই বসুক। অর্থাৎ 'বু' ছাপা হবে দুটি চিহ্ন পর পর বসিয়ে। প্রথমটি 'ব', তার পরে বসবে উ-কারের একটি চিহ্ন। অবশ্যই শেষের চিহ্নটি 'ব'-এর সরাসরি নীচে গিয়ে বসতে পারবে না। তলার দিকেই বসবে, কিন্তু একটু ডানদিকে সরে। ৯ নম্বর ছবিতে উদাহরণ দেখা যেতে পারে, *পরশুরাম রচনাবলী*-র দুটি সংস্করণ থেকে ছাপার নমুনা এতে দেখানো হয়েছে। একটি পুরোনো বিদ্যাসাগরী ছাপা, অন্যটি লাইনো ছাপা। এখানে আরও দেখছি, ই-কার মাথার ওপরে বসছে না। তৃতীয় লাইনে 'গিরি', চতুর্থ লাইনে 'সারি', তার পরের লাইনে 'বহি' বা পরে আরও যেখানে যেখানে হ্রস্ব-ই-কার আছে—সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, লাইনো ছাপায় আগে ই-কারের চিহ্ন বসছে। সেটি শেষ হয়ে যাওয়াব পরে শুরু হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ছবির ৮ নম্বর লাইনের 'জীব' শব্দটি লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসগরী হরফে ঈ-কার বসছে 'জ'-এর মাথার ওপরে, কিন্তু লাইনো ছাপায় 'জ' শেষ হওয়ার পরে ঈ-কারের চিহ্ন আলাদাভাবে বসছে ডানদিকে।

শুধু তা-ই নয়, যুক্তস্বর চিহ্নের ব্যাপারে যে-কয়েকটি ব্যতিক্রম রেখে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, সেগুলোও ছেঁটে বাদ দিয়ে দিলেন সুরেশচন্দ্র। ৯ক ছবিতে প্রথম লাইনেই দেখুন, 'দু' যেখানে ছাপা হয়েছে, 'দ'-এর তলায় উ-কারের চিহ্ন সেখানে বসেনি। একটি বিশেষ চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে এই যুক্তবর্ণটি লেখার জন্য, 'দ'-এর তলার দাঁড়ির মতো অংশটা তাতে মুড়ে উ-কারের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। তৃতীয় লাইনে দেখুন, বিদ্যাসাগরী ঢঙে 'গু' লেখার জন্যও 'গ' বর্ণের ডানদিকের দাঁড়িটাকে ছেঁটেকেটে মুড়ে দেওয়া হতো, এবং তার তলায় যা বসানো হতো, সেটি বাংলা উ-কারের চিহ্নও নয়, দেবনাগরী লিপির উ-কারের মতো দেখতে একটি চিহ্ন। 'শু' লেখার জন্যও একই রকম ব্যবস্থা ছিলো। উ-কারের ওই একইরকম চিহ্ন 'র'-এর সঙ্গেও বসতো, কিন্তু তলায় নয়, ডানদিকে—৯ক ছবির শেষ থেকে দ্বিতীয় লাইন দেখুন। সপ্তম লাইনের 'হুংকার' শব্দে দেখুন, 'হ'-এর সঙ্গে উ-কার দিতে হলে আবার 'হ'-এর ওপর দিকের গোল জায়গাটার মধ্যে একটা ভাঁজ দেওয়া হতো। শেষ লাইনে 'সু' দেখুন, সেখানে উ-কার বসাতে গিয়ে 'স' বর্ণটিই মুড়েমুচড়ে বিশেষ চেহারা নিয়েছে। সব মিলিয়ে শুধু উ-কার দেওয়ার জন্যই নানা রকমের ব্যবস্থা ছিলো বিদ্যাসাগরী ছাপায়। সুরেশচন্দ্র ঠিক করলেন, এতো বিচিত্র ব্যবস্থা নয়, একরকমেরই চিহ্ন থাকবে উ-কারের, সেইটিই সমস্তরকম ব্যঞ্জনের সঙ্গে বসবে।

সরাসরি নীচে নয়, সামান্য ডানদিকে সরে। ৯খ নম্বর ছবিতে লাইনো ছাপায় এইসব রূপান্তরিত উ-কারের উদাহরণ দেখা যাচ্ছে।

উ-কার এবং ঋ-কারের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমগুলো তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সুরেশচন্দ্র। 'র'-য় উ-কার যোগ করতে হলে ডানদিকে একটি আঁকড়ি বসিয়ে তা বোঝানো হতো। সেই আঁকড়ি কয়েকটি যুক্তবর্ণের সঙ্গেও যোগ করা হতো—'দ্রু' 'শ্রু' ইত্যাদি লেখার সময়ে। মজার কথা, এই একই আঁকড়ি 'হ' বর্ণের ডানদিকে বসানো হতো ঋ-কার হিসেবে। এইসব বিশেষ চিহ্ন সব বাতিল করে দেওয়া হলো লাইনো ছাপার পরিকল্পনা করতে গিয়ে। ঠিক হলো, 'র'-য় উ-কাব দিতে হলে 'র' ছাপিয়ে তার ডানদিকে একটি স্বাভাবিক চেহারার উ-কারই বসানো হবে। 'হ'-য় ঋ-কার দিতে গেলেও 'হ' ছাপিয়ে তার ডানদিকে একটি স্বাভাবিক চেহারার ঋ-কাব বসাতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম রাখা হবে না।

বলা বাহুল্য স্বরচিহ্নের এতোরকমের বদল মানে মুদ্রিত বাংলা হরফের চেহারারই আমূল বদল, কিন্তু সুরেশচন্দ্রের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটির কথা আলোচনা না করলে সেই বদলের ছবিটা সম্পূর্ণ হবে না। এ সিদ্ধান্তটি যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত। উদাহরণ দিয়ে শুরু করলে ব্যাপারটা বলতে সুবিধে হবে। ৯ নম্বর ছবির সপ্তম লাইনে 'দন্ত' শব্দটি লক্ষ করুন। বিদ্যাসাগরীয় ছাপায় দেখুন, লাইনো ছাপায় দেখুন। একটি যুক্তব্যঞ্জন আছে, 'ন্+ত'। পুরোনো ছাপায় সংশ্লিষ্ট দুটি ব্যঞ্জন বসেছে ওপরে-নীচে, দুয়ে মিলে একটি ছাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে ছাপার জন্য। লাইনোতে অন্যরকম। প্রথমে একটি ছোটো 'ন' রয়েছে, তার ডানদিকের হাতলটি নেই। তাব পরে বসেছে গোটাগুটি একটি 'ত'। এতে সুবিধে কী হলো, তা বোঝবার জন্য এর কয়েক লাইন পরের 'ইন্দ্র' শব্দটি লক্ষ করা যাক। এতে যে-যুক্তব্যঞ্জনটি আছে, তাতেও প্রথমে বসেছে একটি হাতলভাঙা ছোটো 'ন'—'ন্ত' লেখার সময়ে যে-চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছিলো সেইটিই। সুবিধেটা এইখানেই। 'ন্ত' এবং 'ন্দ্র' লেখার জন্য দুটো আলাদা ছাঁদ দরকার হয়েছে বিদ্যাসাগরী হরফে। লাইনোতে সে জায়গায় শুধু একটা ভাঙা 'ন' দিয়েই দুটোর কাজই চলছে। অর্থাৎ, শুধু 'ন্ত' আর 'ন্দ্র' এই দুটো যুক্তব্যঞ্জনের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলেই দেখতে পাচ্ছি সাশ্রয় হয়ে গেছে একটি চিহ্নের।

মনে হতে পারে যে, এ-ও তো বিন্দুমাত্র সাশ্রয়, কিন্তু তা নয়। কেননা শুধুই তো 'ত' আর 'দ্র'-এর সঙ্গেই 'ন' দিয়ে যুক্তব্যঞ্জন হচ্ছে না। 'ন্+থ' হবে, 'ন্+দ' হবে, 'ন্+ধ' হবে, 'পেন্সিল' লিখতে গেলে 'ন্+স' হবে, 'অন্বয়' লিখতে গেলে 'ন'-য় 'ব'-ফলা হবে। সবই লেখা যাবে সেই একই ভাঙা 'ন' দিয়ে। এক ঢিলে বহু পাখি।

আর শুধু তাই 'ন'-এর কথাই হচ্ছে না। প্রায় সমস্ত যুক্তব্যঞ্জনই এইভাবে ভেঙে লেখা যেতে পারে। হাতলভাঙা ছোটো একটি 'ম' দিয়ে 'কম্প' 'লম্ফ' 'বিম্ব' 'রম্ভা' সবই হবে, হবে 'সম্প্রীতি' 'সম্ভ্রান্ত' ইত্যাদিও। ছোট্টো একটি দাঁড়িভাঙা 'প' দিয়ে লেখা হবে 'লুপ্ত' এবং 'লিপ্সা' এই দুটি শব্দই।

আর উদাহরণের দরকার নেই সম্ভবত, যুক্তস্বর এবং যুক্তব্যঞ্জন সংক্রান্ত দুটি মূলগত উদ্ভাবনের ফলে যে বাংলা ছাপায় প্রয়োজনীয় বর্ণচিহ্নের সংখ্যা প্রচুর কমিয়ে ফেলা যায়, তা এতেই বোঝা যাচ্ছে আশা করি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে সুরেশচন্দ্র বলছেন, 'বাংলা লিপি ছাপার জন্য প্রায় ৬০০ বর্ণচিহ্ন দরকার হতো, সেই সংখ্যাটিকে কমিয়ে আমরা যেখানে দাঁড় করিয়েছি, তাতে চাবির ডালায় ১২৪টি চিহ্ন আর পাশের ডালায় বিবিধ ৫০টি চিহ্ন হলেই কাজ চলে যাবে' (১২)। চিঠিটি ইংল্যান্ডের লাইনোটাইপ কোম্পানিকে লেখা, তাঁরা যাতে বাংলা লাইনো মেশিন বানান, তার জন্য তদবির।

লাইনো মেশিন যথাকালে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছিলো বাংলায়, সে কথা বলা বাহুল্য। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে *আনন্দবাজার পত্রিকা* এইভাবে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিলো। সেইসঙ্গে বহু বইও ছাপা হয়েছিলো বিভিন্ন প্রকাশকের হাতে। আমরা ৯খ নম্বর ছবিতে যে-নমুনাটি দেখিয়েছি, সেটিই তো একটি বই থেকে।

নতুন প্রযুক্তির সুবিধে নেওয়ার জন্যই মুদ্রণ-সংস্কারের এইসব পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন সুরেশচন্দ্র, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা শুধু সেখান থেকেই আসেনি, এর ফলাফলও শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।

অনুপ্রেরণার কথাটাই ধরা যাক। বিদ্যাসাগরের নানাবিধ সংস্কারের কথা আলোচনা করতে গিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলাম, এইসব সংস্কারের পেছনে কি যুক্তির অনুপ্রেরণা ছিলো কিছু, না কি এলোপাথাড়িভাবে কিছু বদল করা হয়েছিলো?

যুক্তির অনুপ্রেরণা যে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, *বর্ণপরিচয়* বইয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ শাণিত ভূমিকাটুকুই তার প্রমাণ। কিন্তু সেইসঙ্গে অন্য একটা ব্যাপারও সম্ভবত ছিলো, অন্তত মুদ্রণের ব্যাপারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যখন বিদ্যাসাগর এই সমস্ত কাজ করছিলেন, তখন বাংলা ছাপাখানার শৈশব কেটেছে, কিন্তু সাবালক অবস্থা তখনও আসেনি। মুদ্রণের ফলে সুবিধে হচ্ছে সে ব্যাপারে কারুর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না তখন, কিন্তু সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা পুঁথিই তখনও বেশি দৃষ্টিনন্দন বলে বিবেচিত হতো। ছাপা অক্ষরকে তাই গ্রহণীয় হওয়ার জন্য হতে হতো সুন্দর হাতের লেখার মতো। হয়তো এই কারণেই বেশ কিছু অস্বচ্ছ চিহ্নে হাত দিতে পারেননি বিদ্যাসাগর এবং তাঁর সমসাময়িকেরা। ৮ নম্বর ছবিতে যেরকম 'ন্য' দেখেছি, সেই কোয়ার মতো পাকানো চিহ্নটি রেখে দিতে হয়েছিলো, কেননা যাঁদের হাতের লেখা সুন্দর, তাঁরা অনেকেই লেখার সময়ে 'ন' লিখে তাব পরে ওপর থেকে 'য'-ফলা শুরু করতেন না, 'ন'-এর দাঁড়ির সঙ্গেই মুড়ে তলার থেকে ওপরদিকে টান দিয়ে 'য'-ফলা লেখা শেষ করতেন। এখনো 'দু' লিখতে গেলে আমাদের হাতের লেখায় 'দ'-এর তলাটা দুমড়ে গিয়ে তার সঙ্গে উ-কার যোগ হয়, সে আমলেও হতো। তাই ৮ নম্বর ছবির মতো করে ছাপা হতো 'দু', তাতে হাতের লেখার মতো দেখাবে যে!

এই যে দার্শনিক পরিমণ্ডল, এইটারই আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো পরবর্তী শ-খানেক বছরে। বা হয়তো আরও আগেই। ছাপা হরফকেই আদর্শ বলে চিন্তা করতে

হিন্দুদের দেবতা!' আন্না চটে গেল, 'তা বললেই তো মানবনি, মা। আমরা হলাম গিয়ে চার পুরুষের খিশ্টান। আমরা বরাবর ষটা করে এসেছি এ-কথা কে না জানে! এর পর নারাণ হয়তো বলবে যে খিশ্টানদের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে নেই। হুঃ!'

১০নং ছবি॥ লীলা মজুমদারের *খেরোর খাতা* বইয়ের [১৩] একটি পৃষ্ঠার অংশ।

শিখেছিলো লোকে। হাতের লেখার মতো করে ছাপার হরফ তৈরি করতে হবে সে কথা তাই অবান্তর হয়ে গিয়েছিলো। বরং উলটোটা হয়েছিলো—ভালো হাতের লেখা দেখলে লোকে বলতে শুরু করেছিলো, 'একেবারে ছাপার মতো লেখা'। এখনও এইরকমই আমরা বলি।

মানসিকতার এই পরিবর্তনের ফলেই সুরেশচন্দ্রের মুদ্রণ সংস্কার সম্ভব হয়েছিলো। ছাপার সুবিধা অনুযায়ী ছাপার হরফ তৈরি হবে, হাতের লেখায় লোকে সেভাবে লিখুক বা না-ই লিখুক—এ কথা বিদ্যাসাগরের আমলে বলা সম্ভব ছিলো না, সুরেশচন্দ্রের আমলে সম্ভব হলো। হাতে যখন লিখি, 'বু' লিখতে হলে বোধ হয় আমরা সকলেই উ-কারটাকে পায়ের তলাতেই বসাই, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, একটু সরিয়ে ডানদিকে বসালেও দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। 'ন্+ত' লিখতে গেলে আপনি 'ন'-এর তলায় 'ত' লেখেন? লিখুন, আমিও লিখি। কিন্তু ছাপার সময়ে সেভাবে ছাপা হবে না, ভাঙা 'ন' আর গোটা 'ত' পাশাপাশি হবে।

আগেই বলেছি, দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। উ-কারের চিহ্ন বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কীভাবে লাইনোতে বসে, তা আগেই আলোচনা করেছি। তাতে দেখা গেছে, যেসব জায়গায় উ-কার আগে স্বচ্ছ ছিলো না, লাইনোতে তা স্বচ্ছ হয়েছে। যুক্তব্যঞ্জনের বহু চিহ্নেও সেইরকম স্বচ্ছতা এসেছে। ৯ নম্বর ছবির তৃতীয় লাইনের 'রক্তবর্ণ' শব্দটি দেখুন দু-রকম ছাপায়। বিদ্যাসাগরী হরফে এর দ্বিতীয় বর্ণটি লিখতে যে-চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা অস্বচ্ছ, কেননা চিহ্নটির মধ্যে 'ক'-ও নেই, 'ত'-ও নেই। লাইনোতে চিহ্নটি অন্যভাবে লেখা হয়েছে, ওপরে ছোটো করে 'ক' লিখে তার তলায় 'ত' লেখা হয়েছে। শুধু এই চিহ্নটির কথা যদি ধরা যায়, তাহলে সাশ্রয় কিছু ঘটেনি—বিদ্যাসাগরী হরফে লিখলেও এখানে একটি ছাঁদ রাখতে হতো, লাইনোতেও তাই। কিন্তু হাতের লেখার মতো চিহ্ন বসানোর তাগিদ নেই বলে চিহ্নটিকে স্বচ্ছ করা গেছে। শেষের দিক থেকে গুনতে শুরু করে দ্বিতীয় লাইনে 'ন্+ধ' এবং চতুর্থ লাইনে 'দ্+ধ' যুক্তব্যঞ্জনের রূপ দেখুন, এসব চিহ্নও স্বচ্ছ রয়েছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে স্বচ্ছতার পথ সুগম হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়। যুক্তব্যঞ্জন এইভাবে ভেঙে লেখার ফলে আরও একটা লাভ হয়েছে। দরকার হলে এমন অনেক যুক্তবর্ণ লেখা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো বিদ্যাসাগরী সাটে ছিলোই না। উদাহরণস্বরূপ ১০ নম্বর ছবি লক্ষ করা যাক। উচ্চারণের বিশেষ একটি ভঙ্গি বোঝানোর জন্য লীলা মজুমদার 'খ্রিষ্টান' বা 'খ্রিস্টান' বানান না লিখে 'শ্+ট' ব্যবহার করে লিখেছেন 'খিশ্টান'। সাবেকি কায়দার হরফে 'শ্+ট' যুক্তবর্ণটি থাকতো না, তাই

লীলা মজুমদারের এই বানান ছাপানো হতো অসম্ভব। লাইনোতে ছাপা হয়েছে বলে কোনো অসুবিধে হয়নি, ভাঙা 'শ' এবং গোটা 'ট' দুটোই থাকে বলে দুটো পাশাপাশি বসিয়ে কার্যোদ্ধার হয়েছে।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে হরফের ক্ষমতা বেড়েছে। আরও বেশি জিনিস লেখা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়। বিদ্যাসাগরী সাটে লীলা মজুমদারের ওই বানানটি ছাপাতে গেলে নতুন একটি যুক্তব্যঞ্জনের ছাঁদ যোগ করতে হতো। তা যে আগে হয়নি তা নয়, 'স্ট' বর্ণটিই সেইভাবে যোগ করা হয়েছিলো বিংশ শতাব্দীতে। সংস্কৃতে এই যুক্তব্যঞ্জনটি কোথাও ছিল না, বাংলা উচ্চারণেও ছিলো না। ইংরিজি থেকে আসা নানা শব্দের উচ্চারণ বোঝাতে এই যুক্তব্যঞ্জনটির দরকার হয়ে পড়লো যখন, তখন এটি ছাপা যেতো না। অনেকে 'স্‌টেশন' বা 'স্‌টীমার' এইরকম করে লিখতেন, বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে, একটি নতুন যুক্তবর্ণ প্রয়োজন। তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা অনেক হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত সেই বর্ণটি যোগ করা হয়েছিলো বিদ্যাসাগরী সাটে। অথচ তখন যদি লাইনো থাকতো, কিছুই অসুবিধে হতো না, ভাঙা 'স'-এর পাশে গোটা 'ট' লিখে অনায়াসে ছাপানো যেতো এই যুক্তব্যঞ্জন। যেমন ছাপানো গেছে লীলা মজুমদারের 'শ্‌+ট', যেমন ছাপানো গেছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নাম লেখার সময়ে 'ভ্‌+ল'।

তবে পিছুটান পুরোপুরি কাটাতে পারেননি সুরেশচন্দ্রও। 'ক্র'-র চিহ্ন স্বচ্ছ করেছেন 'ক'-এর নীচে সরাসরি র-ফলা দিয়ে, কিন্তু 'ত'-য় র-ফলার চিহ্নটিকে স্বচ্ছ করতে সংকোচ বোধ করেছেন। 'প' 'ব' ইত্যাদি যেসব ব্যঞ্জনবর্ণের ডানদিক ঘেঁষে একটা দাঁড়ি থাকে সেগুলোয় উ-কার দেওয়ার সময়ে উ-কার বসিয়েছেন ডানদিকে, অথচ ৯খ ছবিতে দেখুন. 'তু' বা 'ভু' লেখার সময়ে প্রাণে ধরে তা করে উঠতে পারেননি, তাই এইসব সমবায়ের জন্য আলাদা আলাদা চিহ্নের ব্যবস্থা তাঁকে রাখতে হয়েছে। অবশ্য এসব রেখেও লাইনো মেশিনে যতগুলো চিহ্ন ধরে তার মধ্যেই বাংলা লিখতে পেরেছেন, সুতরাং আর চিহ্ন কমানোর গরজ হয়তো তাঁর ছিলো না।

পঞ্চম পর্ব—কম্পিউটারে ছাপা

লাইনোটাইপের পরেও মুদ্রণশিল্পে নতুন কিছু কিছু প্রযুক্তির আবির্ভাব হয়েছিলো, যথা মনোটাইপ। তাতে হরফের চেহারা খুব একটা বদলায়নি। লাইনোর মতো করে হরফ তৈরি করা হয়েছে। আবার, লাইনো মেশিনোর দাম বেশি ছিলো বলে বহু ছাপাখানাতেই এই মেশিন বসেনি, সেখানে আগেকার প্রযুক্তি এবং পুরোনো বিদ্যাসাগরী ধাঁচের হরফই চলেছে।

১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে কম্পিউটারের খুব উন্নতি হয়। কম্পিউটারের প্রাথমিক কাজ ছিলো বিপুল সংখ্যাগণনা। কিন্তু এই কাজের জন্য যুক্তি এবং নিয়মের যে-অবকাঠামো থাকতো কম্পিউটারে, তা ব্যবহার করে কম্পিউটারকে দিয়ে অন্য কাজও

করানো সম্ভব। এই চেতনাটা যখন এলো, তখন নতুন নতুন কাজে কম্পিউটারের প্রয়োগ শুরু হলো। এর মধ্যে বিশিষ্ট একটি প্রয়োগ হলো ছাপার কাজে।

ছাপার একেবারে শেষ অংশটা, যেখানে অল্প সময়ে বহু প্রতিলিপি তৈরি করা হয়, সে অংশটার জন্য কম্পিউটার নয়। সেটা করবে ছাপাই মেশিন। কম্পিউটারের কাজ বর্ণযোজনা। একবার কম্পিউটার থেকে ছাপিয়ে বার করতে পারলে তার প্রতিলিপি বানানোর জন্য যেটুকু প্রযুক্তি দরকার, সেটা আগে থেকেই ছিলো। ছবি ছাপানোর কাজ তো আগেও হতো। গোটা একটা পৃষ্ঠা কম্পিউটার থেকে ছাপিযে নিয়ে সেটাকে ছবির মতো ছাপালেই হয়। সরল অঙ্কের হিসেবেই বলা যায়, তা করতে পারলে মুদ্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটে। প্রথম যুগের ছাপা হতো বিচল হরফে, তাতে প্রতিটি বর্ণচিহ্নের জন্য আলাদা আলাদা ছাঁদ ব্যবহার করতে হতো। লাইনো ছাপায় প্রতি লাইনের জন্য তৈরি কবা হতো একটা ছাঁদ। আর কম্পিউটারে ছাপার সময়ে প্রতিটি পাতার জন্য একটা ছাঁদ তৈরি হয়। একসঙ্গে যতো বেশি জায়গায় ছাঁদ তৈবি হবে, ছাপার কাজে ততোই সুবিধে হবে—এই অর্থে কম্পিউটারের ছাপা লাইনো মেশিনের চেয়েও আরও এক ধাপ ওপরে।

কিছু বড়ো রকমের সুবিধে হয় কম্পিউটারে ছাপা হলে। এর মূল কারণ, কম্পিউটারকে এমনভাবে নির্দেশ দেওয়া যায যাতে অনেক কাজ কম্পিউটার নিজে নিজেই করে নিতে পারে, তার জন্য আলাদা করে বার বার কাউকে খাটতে হয় না। পাতার নম্বর দেওয়া এরকম একটি কাজ। কম্পিউটাবকে বলে রাখা যায়, প্রতি পৃষ্ঠার অমুক জায়গায় নম্বর বসিয়ে যেয়ো। কম্পিউটারের স্মৃতিভাণ্ডারে একটি আস্ত অভিধান ভরে রাখা যায়, বর্ণযোজনা করার সময়ে সেই অভিধানবহির্ভূত শব্দ চোখে পড়লেই কম্পিউটার আওয়াজ করে আপত্তি জানাতে পারে। ছাপার ভুল করলে চেনা শব্দের জায়গায় আসবে অচেনা বর্ণগুচ্ছ—কম্পিউটারের আপত্তি শুনে সতর্ক হয়ে তা বদলে ঠিক করে নেওয়া যাবে। অবশ্য 'কমল' লিখতে গিয়ে যদি ছাপার ভুলে 'কলম' লেখা হয়, তাহলে কম্পিউটার আপত্তি করবে না, কেননা দুটোই অভিধানের শব্দ। তাই, বর্ণযোজনার সময়ে যে-কোনো ভুল করলেই যে কম্পিউটার তা বুঝতে পারবে, তা নয়। তবু অনেক ক্ষেত্রেই তো বুঝবে, এবং ভুল ধরিয়েও দেবে—সেটাও তো কম লাভ নয়!

সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হলো, বর্ণযোজনা করার সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যা ভুলভাল হয়, তা কম্পিউটারে শুধরে নেওয়া খুব সহজ। যেমন ধরা যাক, প্যারাগ্রাফ শুরুর আর শেষের লাইন ছাড়া অন্য সব লাইন বাঁদিকে একই জায়গা থেকে শুরু হয় এবং ডানদিকে একই জায়গায় শেষ হয়। হাতে বর্ণযোজনা করার সময়ে এই ডানদিক মেলানোটা একটি ভয়ংকর ঝামেলার ব্যাপার। একটি লাইনের শুরু থেকে বর্ণ বসানো শুরু করতে হয়, বসাতে বসাতে যখন লাইনের শেষের কাছাকাছি চলে আসে, মনে হয় পরের শব্দটি আর এই লাইনে ধরবে না, তখন কতোটা জায়গা বাকি থাকলো দেখে নিয়ে আন্দাজে আন্দাজে শব্দের ফাঁকে ফাঁকে ভাগাভাগি করে সেই বাকি জায়গাটুকু ভরাট করে দিতে হয়। এতেই

শেষ নয়। ধরা যাক প্রথম প্রুফে দেখা গেলো একটি শব্দ কোথাও বাদ পড়ে গেছে। তখন সেই শব্দটি ঢোকাতে হবে। লাইনে আগে থেকেই যা আছে, তার সঙ্গে বাড়তি এই শব্দটি ঢোকালে আর এক লাইনে ধরানো যাবে না। তখন কী করা হবে? নতুন শব্দটি ঢুকিয়ে লাইনের শেষে যেটুকু বেড়ে যাবে সেটা পরের লাইনে চালান করে দিতে হবে। তখন পরের লাইনটিও আবার নতুন করে গোছাতে হবে। হয়তো সে লাইনেও কিছু উদ্‌বৃত্ত থেকে যাবে। সেটি যাবে তার পরের লাইনে, এই করে চলবে। প্যারাগ্রাফের শেষ পর্যন্ত এই শব্দ চালান করার কাজ চলতে পারে, এবং হাতে হাতে বসে বসে তা করতে হয়।

কম্পিউটারে যদি বর্ণযোজনা করা হয়, তাহলে এসব ঝামেলা নেই। ডানদিক মেলানোর কাজটা কম্পিউটার নিজেই হিসেব করে করতে পারে। কোনো শব্দ যদি বাদ পড়ে যায়, পরে সেটি ঢুকিয়ে দিলেও কম্পিউটার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে হিসেব করে ডানদিক মিলিয়ে নেয়। তার জন্য শব্দ যদি অন্য লাইনে চালাতে হয়, চালিয়ে দেয়। বর্ণযোজনা যিনি করছেন, তাঁকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় না।

কম্পিউটারের আর একটা বড়ো সুবিধে, কম্পোজ করা জিনিসটা কম্পিউটারে সঞ্চয় করে রাখা যায়। পুনর্মূদ্রণ করতে হলে কম্পিউটারের স্মৃতিভাণ্ডার থেকেই গোটা জিনিসটা পাওয়া যায়, আবার নতুন করে বর্ণযোজনা করতে হয় না।

কিন্তু এ তো পরের কথা আগে বলা হচ্ছে। কম্পিউটার বর্ণযোজনার এইসব সুবিধে পেতে হলে প্রথমে চাই হরফ বানানো, বর্ণযোজনার ব্যবস্থা করা। লাইনো ছাপা বাংলায় আনার ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, কম্পিউটারের ব্যাপারেও এগিয়ে এলেন তাঁরাই—আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে তাঁবা ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানিকে বাংলা হরফ বানাবার বরাত দেন। হরফ তৈরি হয়, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিক থেকে কম্পিউটারে বর্ণযোজনা শুরু হয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য়।

এই হরফ বানানো হয়েছিলো বড়ো মেশিনের জন্য। ওরকম বৃহৎ মেশিন আনন্দবাজারের মতো বড়ো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই ব্যবহার কবা সম্ভব। ছোটো বা মাঝারি মাপের প্রকাশকদের কাছে এ প্রযুক্তি অধরা থেকে যেতো, যদি না প্রায় একই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতো। এই ঘটনাটি হলো ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় খুদে কম্পিউটারের আবির্ভাব। এই যুগান্তকারী উদ্ভাবনের ফলেই দেড়-দু দশকের মধ্যে হু-হু করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে কম্পিউটার, বাংলা ছাপার কাজে তার ব্যবহার এখন বেশ ব্যাপক।

কম্পিউটারে ছাপার প্রযুক্তিটা যেমন অভিনব, হরফ বানানোর কৌশলও তেমনই অভিনব। আগে ছাঁচ থেকে ধাতুর বর্ণচিহ্ন বানানো হতো। কম্পিউটারে ছাপা হওয়া মানে ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। এখানে হরফ তৈরি হয় কম্পিউটারকে বিশেষ এক প্রস্থ নির্দেশ দিয়ে। কম্পিউটারে ছাপা হয় বিন্দু বিন্দু করে। অর্থাৎ বুনিয়াদি স্তরে একটা কম্পিউটারের যেসব ক্ষমতা থাকে, তার মধ্যে একটা হলো কাগজের ওপর একবিন্দু কালি ফেলার
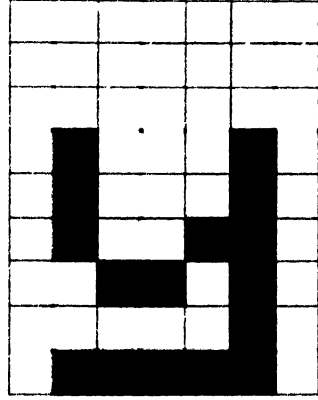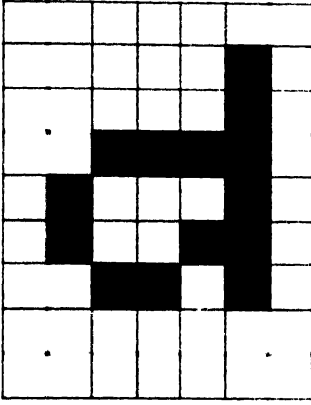
১১নং ছবি॥ মোটা মোটা বিন্দু দিয়ে কয়েকটি রোমক বর্ণের নকশা।

ক্ষমতা। কী করে বিন্দুর পর বিন্দু জুড়ে একটি বর্ণ ছাপানো হবে, তা বোঝানোর জন্য কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতে হয়। এই নির্দেশমালা বা প্রোগ্রাম লিখে লিখে বুঝিয়ে দিতে হয় কম্পিউটারকে।

দুটি ব্যাপারের ওপরে তাহলে নির্ভর করে হরফের চেহারা। এক—কম্পিউটার এবং সংলগ্ন ছাপাই মেশিন কতো ঘন ঘন বিন্দু ফেলতে পারে। দুই—সেই সব বিন্দু জুড়ে বর্ণচিহ্ন বানানোর জন্য কীভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটারকে।

খুদে কম্পিউটার যখন প্রথম চালু হয়, ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে, তখন যে-কোনো বর্ণচিহ্ন নির্মাণের জন্য যে-নির্দেশমালা দেওয়া হতো কম্পিউটারকে, সেটি থাকতো বিন্দুর নকশা দিয়ে, ডট ম্যাট্রিক্সের আকারে। ১১ নম্বর ছবিতে রোমক বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণের নকশা দেখানো হয়েছে, ১২ নম্বর ছবিতে বাংলা 'দ' বর্ণটির নকশা দেখানো হয়েছে, ওই ছবিগুলির দিকে তাকালে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। একই বর্ণের একাধিক নকশা আছে, তার ব্যাখ্যায় আসছি ক্রমশ।

কী মাপের হরফ ছাপাতে চাই আমরা, তার ওপর নির্ভর করবে এই নকশা। কেন, তা বোঝাবার জন্য হরফের একটা মাপ ধরে নেওয়া যাক। ছাপার কাজে হরফের মাপ বোঝানো হয় যে একক দিয়ে, তাকে বলে 'পয়েন্ট'। মোটামুটি ৭২ পয়েন্টে ১ ইঞ্চি। হরফের চেহারা বোঝার পক্ষে ইঞ্চি বড্ডোই বড়ো মাপ, তাই পয়েন্ট এককটা ব্যবহার করা হয়। মিলিমিটার ব্যবহার করলেও মন্দ হতো না, ১ মিলিমিটার হলো মোটামুটি ২.৩৫ পয়েন্ট। আলোচনার সুবিধের জন্য ধরা যাক, আমরা ১২ পয়েন্টের হরফ ছাপাবো ঠিক করেছি।

১২ পয়েন্টের হরফ মানে প্রত্যেকটা বর্ণের উচ্চতা ১২ পয়েন্ট নয় কিন্তু। কোনো

বর্ণচিহ্ন ওপরের দিকে অনেকটা উঁচু হয়ে থাকে, কোনোটা নীচের দিকে নেমে থাকে। রোমক বর্ণমালায় 'day' শব্দটি যদি লেখা যায়, তাহলে উচ্চতার দিক থেকে তিনরকম তিনটি বর্ণ পাচ্ছি। প্রথমটির বিস্তার ওপর দিকে, শেষটির তলার দিকে, আর দ্বিতীয়টির কোনোদিকেই বিস্তার নেই, মাঝামাঝি তার অবস্থান। তিনটি বর্ণেরই উচ্চতা ১২ পয়েন্ট
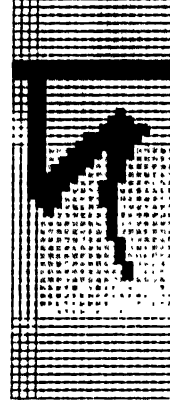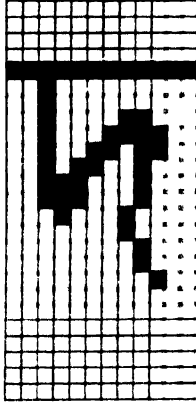
১২নং ছবি॥ দুই মাপের বিন্দুতে 'দ' বর্ণটির গঠন। বিন্দু যতো সূক্ষ্ম হয়, বর্ণচিহ্নের চেহারা ততো মসৃণ হয়।

হতে পারে না তো! ওপরের দিক তলার দিক সব ধরে যতোটা বিস্তার হয় একটি হরফের অন্তর্গত বিভিন্ন চিহ্নের, সেইটা হলো হরফের মাপ। সেইটাকে ১২ পয়েন্ট ধরেই আমরা এগোচ্ছি।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আসলে বর্ণচিহ্নগুলোর সবকটারই উচ্চতা ১২ পয়েন্টের কম। ১২ পয়েন্ট উচ্চতার মধ্যে খানিকটা রাখতে হবে মূল অংশ হিসেবে, খানিকটা হবে আগার দিক, খানিকটা গোড়ার দিক। রোমক বর্ণমালা লেখার সময়ে 'm' 'n' ইত্যাদি বর্ণেরই কিছু না কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। এই মূল অংশের ওপরে বড়ো হাতের বর্ণগুলো যতোদূর ওঠে, সেইটা হলো আগার দিক। আর ছোটো হাতের 'j' 'y' ইত্যাদি বর্ণ যতোটা নামে, সেইটা হলো গোড়ার দিক।

সাধারণত রোমক হরফে আগা থেকে গোড়া এই তিনটি অংশের অনুপাত ধরা হয় ৩০-৪০-৩০, অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ আগা, ৪০ ভাগ মূল, ৩০ ভাগ গোড়া। বাংলা হরফ বানাতে গেলেও এরকম তিনটি ভাগ করতে হবে অবশ্যই, কিন্তু তাদের অনুপাত আলাদা হতে হবে। কেননা বাংলা হরফে মূল অংশেই প্রায় সমস্ত কাজ। আগার অংশে শুধু ই-কার ঈ-কারের ছাতার মতো অংশগুলো, রেফ, চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি। গোড়ার অংশে উ-

কার উ-কার ঋ-কার ইত্যাদি সামান্য কয়েকটা জিনিস। তাই বাংলায় ভাগ করা হয় অন্য রকম, ২০-৬০-২০। তার মানে, আমরা যদি ১২ পয়েন্টের হরফ বানাতে চাই, তাহলে তার মূল অংশের উচ্চতা হবে ১২ পয়েন্টের ৬০ শতাংশ, অর্থাৎ ৭.২ পয়েন্ট, বা মোটামুটি আড়াই মিলিমিটার।

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রিন্টারের বিন্দুগুলো কতো বড়ো, আড়াই মিলিমিটারের মধ্যে প্রিন্টার কতগুলো বিন্দু বসাতে পারে? প্রথম দিকের প্রিন্টারে বিন্দুগুলো হতো খুবই বড়ো বড়ো, তাদের মধ্যে দূরত্ব থাকতো বেশি। ১১ নম্বর ছবিতে যে-নকশাগুলো দেখানো হয়েছে, তা যে প্রিন্টারের জন্য, সেটি মোটামুটি ১ ইঞ্চিতে ৫০টি করে বিন্দু ফেলতে পারতো লম্বালম্বি। ১২ পয়েন্ট মানে ১ ইঞ্চির ৬ ভাগের এক ভাগ, তাই লম্বালম্বি আটটা করে বিন্দু হলে ১২ পয়েন্টের কাছাকাছি হচ্ছে। পর পর দুটি লাইনের লেখায় যাতে ঠোকাঠুকি না লেগে যায় সেইজন্য আরও একটি ফাঁকা সারি। এই ৯টি বিন্দুর উচ্চতার মধ্যে কীভাবে বিভিন্ন রোমক বর্ণের নকশা করা যেতে পারে, তার নমুনা দেখানো হয়েছে ১১ নম্বর ছবিতে।

ছবিটার দিকে তাকালেই একটা কথা মনে হওয়াটা অনিবার্য। তা হলো, ওই রকম খোঁচা খোঁচা চৌকো চৌকো হয়ে লেখা হবে নাকি? এখানে মনে রাখতে হবে যে, বোঝবার সুবিধের জন্য ছবিটার অনেক বড়ো সাইজ করে দেখানো হয়েছে, ছাপটা আদৌ এই সাইজে হবে না, হবে এর চেয়ে অনেক ছোটো। ছোটো করে নিলে এই খোঁচা খোঁচা ভাব অতোটা বোঝা যাবে না। অবশ্য একেবারে মসৃণও দেখাবে না। এখনও অনেক অফিস কাছারি বা ব্যাংকে ব্যবহৃত হয়ে এইরকম প্রিন্টার। তাতে বিন্দুগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে দেখা যায়, লেখা প্রায় চৌকো চৌকো হয়ে বেরোয়, তা হয়তো অনেকেই লক্ষ করেছেন।

ক্রমশ উন্নতি হলো প্রিন্টারের, বিন্দু আরও ঘনিষ্ঠ করা সম্ভব হলো। বিন্দুর সংখ্যা বাড়ালে কীভাবে বর্ণচিহ্নের নকশার উন্নতি করা যেতে পারে, তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছে ১২ নম্বর ছবি থেকে। এখানে দুটি নকশা দেওয়া হয়েছে বাংলা 'দ' বর্ণের। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রিন্টারের ক্ষমতা ইঞ্চিতে ১৫০টি বিন্দু, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ৩০০টি বিন্দু। এই নকশায় হরফ আমিই বানিয়েছিলাম। যতোদূর মনে পড়ে, বাঁদিকের মাপের যে-হরফ, তা জনমসক্ষে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৮৬-তে। IBM বা তার সমতুল কম্পিউটারের জন্য সম্ভবত তার আগে বাংলা হরফ ছিলো না। আর ছবির ডানদিকের মাপের হরফ প্রচারিত হয়েছিলো তার কিছুদিন পরে, লেজার প্রিন্টার বাজারে বেরোবার পরে।

মনে মনে কল্পনা করে দেখুন, ছোটো করে ১২ পয়েন্টে নিয়ে এলে কী চেহারা দাঁড়াবে নকশাগুলোর। খোঁচা থাকবে, কিন্তু ১১ নম্বর ছবির বর্ণের মতো অতোটা থাকবে না নিশ্চয়ই। বিন্দু সূক্ষ্ম হয়ে যাওয়াতে খোঁচাগুলো চোখে কম দেখা যাবে, ডানদিকের ছবিতে যে-নকশা দেখানো হয়েছে তাতে বিন্দু এতো বেশি যে তাতে আর বোঝাই যাবে না বিন্দুর উপস্থিতি, সব মিলিয়ে একটি মসৃণ চেহারার জায়গার মধ্যে কালি ফেলা হয়েছে মনে হবে।

এখন আর এই বিন্দুর নকশা দিয়েও হরফ তৈরি হয় না। কীভাবে হয়, তা বোঝার জন্য ১৩ নম্বর ছবির দিকে তাকানো যাক। প্রচলিত একটি কম্পিউটার হরফে (১৪) কী করে 'দ' বর্ণটি বানানো হয়েছে, তা এখান থেকে বোঝা যাবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, 'দ'-এর আকৃতির ওপরে কয়েকটি বিন্দু চিহ্নিত করা আছে, এবং উল্লেখ কবার সুবিধার জন্য তাদের নামও দেওয়া হয়েছে। ছাপায় এইসব বিন্দু দেখা যাবে না, চৌকো চৌকো যে-দাগগুলো আছে সেগুলোও না। এইগুলোর সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে 'দ' বর্ণের চেহারা।
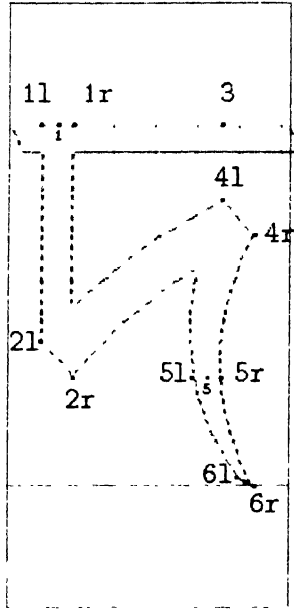
১৩নং ছবি॥ আনুপাতিক হরফে 'দ'-এর নকশা। [১৪] নং সূত্র থেকে।

কম্পিউটার 'দ'-এর পুরো আকৃতিটা জানে না, জানে শুধু এই কটা বিন্দুর অবস্থান। তাও আবার এর মধ্যে বেশিরভাগ অবস্থানই জানানো আছে আনুপাতিক হিসেবে। যেমন ধরা যাক '21' লেখা বিন্দুটির কথা। 'দ'-এর জন্য যে-চৌখুপি নেওয়া হয়েছে, তার ওপরের বা নীচের প্রান্ত থেকে এই বিন্দুটি ১ মিলিমিটার দূরে না আধ মিলিমিটার দূরে বসবে, তা বলা হয়নি নির্দেশমালায়। বলা হয়েছে, ডানদিক-বাঁদিক বিচার না করে যদি শুধু খাড়া দূরত্ব হিসেব করা যায়, তাহলে 'l' থেকে '2l' বিন্দুর মধ্যে খাড়া দূরত্ব যেন '6r' থেকে '2l' বিন্দুর খাড়া দূরত্বের দেড়গুণ হয়। আবার যেমন, '4l' বিন্দুটির অবস্থান ঠিক করে দেওয়ার পরে '4l'-এর জন্য বলা হয়েছে, '4l' আর '4r' যোগ কবে যে-সরলরেখাটা পাওয়া যাচ্ছে, সেটা যেন '2l' আর '2r'-এর সংযোগকারী রেখাব সমান্তরাল হয়,

দৈর্ঘ্যেও সমান হয়। এই ধরনের অঙ্কের হিসেব বলে দিয়ে বিন্দুগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার পরে যা বলা হয়েছে, তা অনেকটা এইরকম। বলা হয়েছে, বিন্দুগুলো তো বসালে, এবার কী করতে হবে বলি। '1l' থেকে খাড়া একটা দাগ টানো '2l' পর্যন্ত। তেমনই আর একটা খাড়া দাগ টানো '1r' থেকে '2r' পর্যন্ত। মাঝখানের জায়গাটা ভরাট করে দাও। এবার আর একটা দাগ টানো, '2l' থেকে '2r' পর্যন্ত চওড়া, যার দু-প্রান্ত শেষ হবে '4l' আর '4r' বিন্দু দুটিতে। এই লাইনটি কিন্তু ঠিক সোজা হবে না, একটু বাঁক থাকবে। কতোটা থাকবে, তা বোঝানোর জন্য শুধু বলে দিচ্ছি, '2l' থেকে যখন শুরু করবে, তখন কিন্তু তোমার তুলির মুখটা '4l'-এর দিকে থাকবে না, থাকবে '3' লেখা বিন্দুটির দিকে মুখ করে। এই কথা মেনে দাগটা টেনো। আর শেষ পর্যন্ত একটা দাগ টেনো, '4l' থেকে '5l' হয়ে '6l' গিয়ে, সেখান থেকে সোজা পথে যাও '6r', তার পর আবার '5r' হয়ে '4r', সেখান থেকে সরলরেখা বরাবর '4l'-এ ফিরে এসো। মাঝখানটা ভরাট করে দিও। ব্যস্ বাপু, এই তো শুনলে, এবার বুঝেশুনে করো, বাকিটা তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এভাবে বলে কী লাভ, কম্পিউটারকে তো খাটতে হচ্ছে এর পর 'দ'-এর চেহারাটা বানানোর জন্য। এর উত্তর হচ্ছে, খাটতে যা হচ্ছে সেটুকু তুচ্ছ, তার বদলে সুবিধে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বিশাল। কী সুবিধে? চৌখুপিটার উচ্চতা যদি বদলে দেওয়া হয়, তাহলে ঠিক ওই একই নির্দেশমালা থেকে তৈরি হবে অন্য মাপের হরফ। কিংবা যদি বলে দিই, বিন্দুগুলোর উচ্চতা মাপার সময়ে ১৩ নম্বর ছবির মতো ঠিক খাড়াভাবে মেপো না, একটু তেরচা লাইন বরাবর মেপো। তাহলে নির্দেশমালার পরবর্তী অংশটুকু অনুসরণ করে গেলে কম্পিউটার তৈরি করবে হেলানো হরফ। ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বিশাল সুবিধে, কেননা ছাপার কাজে ব্যবহার করতে হলে হরফ দেখতে সুন্দর হতে হয়, নানা মাপের হরফ দরকার হয়। সেই সঙ্গে সুবিধে হয় যদি নানারকমেরও হরফ থাকে—রোগা হরফ, মোটা হরফ, বাঁকা হরফ ইত্যাদি। একটি হরফ বানিয়ে দিলেই তা থেকে কম্পিউটার আরও নানা হরফ বানিয়ে নিতে পারবে, এটা বিরাট লাভ। যখন খুশি মুহূর্তের মধ্যে যে-কোনো মাপের হরফ বানিয়ে নেওয়া যাবে, এ কথা কম্পিউটারের আগে কল্পনারও অগম্য ছিলো।

১৪নং ছবি॥ আনুপাতিক হরফে উ-কারের নকশা। [১৪] নং সূত্র থেকে।

এই ধরনের হরফকে ইংরিজিতে বলে 'scalable font', বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ

করতে হলে বলতে হয় 'মাপ বদলের ক্ষমতাসম্পন্ন হরফ', আমি ছোটো করে বলার জন্য 'আনুপাতিক হরফ' বলছি।

সুবিধে শুধু এইটুকুই নয়, আরও অনেক। লাইনোতে উ-কার, ঊ-কার ইত্যাদির চিহ্ন সরাসরি তলায় বসতো না, বসতো একটু ডানদিক করে, সে কথা আগে বলেছি। কম্পিউটারে তার আর দরকার রইলো না। কম্পিউটারকে নির্দেশ দিয়ে রাখা যায়, কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ লেখার পরে উ-কারের চিহ্ন বসাতে হলেই একটু বাঁদিকে সরে যেয়ো, সেখানে চিহ্নটা বসিয়ে আবার জায়গামতো ফিরে এসো। ১৪ নম্বর ছবিতে এই কথাটার একটা চিত্ররূপ দেখানো হয়েছে। এতে খাড়া যে-দাগটি আছে, সেটি ছাপা হওয়ার জন্য নয়, কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য। ১৩ নম্বর ছবিতে যেমন 'দ'-এর জন্য একটা চৌখুপি ছিলো, এখানে সেই চৌখুপিটাই একটা খাড়া লাইনে পর্যবসিত, অর্থাৎ চৌখুপির বাঁ প্রান্ত আর ডান প্রান্ত একটি জায়গায়। উ-কারের এই চিহ্নটি ছাপাতে হলে কম্পিউটার তাহলে কী করবে? ধরা যাক, আগে একটা 'দ' ছাপা হয়েছে, বা অন্য কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ, আর ডানদিকের প্রান্ত যেখানে পৌঁছেছে, সেখানে বসে আছে কম্পিউটার। এইবারে বলা হলো উ-কার ছাপতে। উ-কারের চৌখুপির বাঁ প্রান্ত মেলানো হলো আগের বর্ণের ডান প্রান্তের সঙ্গে। ১৪ নম্বর ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে, উ-কারের চিহ্নটি ছাপা হচ্ছে এর বাঁ দিকে, অর্থাৎ আগের বর্ণের তলায় ঢুকে যাচ্ছে। এই কাজের ফলে কম্পিউটার কতোখানি এগোবে? এর উত্তর হলো—উ-কারের চৌখুপিটি যতোটা চওড়া, ততোখানি। এই চৌখুপির প্রস্থ যেহেতু শূন্য, কম্পিউটার এগোচ্ছে না, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরবর্তী বর্ণের জন্য অপেক্ষা করছে। ঊ-কার বা ঋ-কার নিয়েও এই একই কথা। ঈ-কারের জন্য ব্যবস্থাটাও এই ধরনেরই। ঈ-কারের প্রস্থ শূন্য হবে না, তার চৌখুপির বাঁদিকে, পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় তা শোভা পাবে। ই-কারের বেলায় ছাতার অংশটা বেরিয়ে থাকবে চৌখুপির ডানদিকে।

আর কী ভালো হলো? বেশ কিছু চিহ্নের সাশ্রয়ও হলো। যেমন ধরা যাক র-ফলার চিহ্ন। বিদ্যাসাগরী হরফে প্রতিটি ব্যঞ্জনে র-ফলা দেওয়া ছাঁদ থাকতো আলাদা করে। সেই র-ফলায় ঈ-কার উ-কার ইত্যাদি যোগ করে আলাদা আলাদা চিহ্নও থাকতো। লাইনোতে এই শেষ জটিলতাটা বর্জন করা গিয়েছিলো, কিন্তু র-ফলা যেহেতু পাশে বসে না, নীচে বসে, তাই র-ফলা দেওয়া ব্যঞ্জনের জন্য আলাদা ছাঁচ রাখতেই হতো। অবশ্য সমস্ত ব্যঞ্জনের নয়, 'প্র', 'গ্র' 'শ্র' ইত্যাদি যেগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়, শুধু সেগুলোরই আলাদা ছাঁচ থাকতো। তার বাইরে কালেভদ্রে যদি 'ঘ্র' বা 'খ্র' লিখতে হতো, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে পাশে বসানোর জন্য একটা আলাদা র-ফলা থাকতো। কম্পিউটারে এর থেকে অনেক সহজে হয় ব্যাপারটা। একটিই র-ফলার চিহ্ন দিয়ে প্রায় সব কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। যে-কটা ব্যঞ্জনবর্ণের কথা উল্লেখ করা হলো এই প্রসঙ্গে, তাদের সবকটারই ডানদিক বরাবর একটা দাঁড়ি আছে, র-ফলা বসে সেই দাঁড়ির সঙ্গে মিলে। 'গ' আর 'প'-এর চেহারা বানানোর সময়ে যদি এমনভাবে করা হয় যে, দুটোর ক্ষেত্রেই দাঁড়িটার সঙ্গে

ব্যঞ্জনের চৌখুপির ডানদিকের দূরত্ব সমান, তাহলে র-ফলাটা এমনভাবে বানানো যায় যে, উ-কারের মতো সেটিও ঠিক অতোটুকু পিছিয়ে গিয়ে বসবে। একই র-ফলা বসানো যাবে 'গ' আর 'প'-এর সঙ্গে, এবং সেই একই কারণে 'শ' 'স' ইত্যাদির সঙ্গেও। 'ক'-য় র-ফলা সেভাবে হবে না হয়তো, কেননা 'ক'-এর দাঁড়িটা দক্ষিণপ্রান্ত থেকে আরও বেশি দূরে। সে জন্য যদি একটা আলাদা চিহ্ন বানাতেও হয়. তবু তো অনেক সাশ্রয় হলো!

যুক্তব্যঞ্জন টাইপ করাও সহজ হলো। হাতে বর্ণযোজনার সময়ে যুক্তব্যঞ্জন বসাতে হলে ডালার মধ্যে তার অবস্থানটা হদিশ করে সেখান থেকে তুলে আনতে হতো ছাঁদ। কম্পিউটারে তার দরকার হয় না। কম্পিউটার নিজেই খুঁজে আনে যুক্তব্যঞ্জন। অর্থাৎ ধরা যাক 'ক্ত' বসাতে হবে। প্রথমে তার জন্য টাইপ করতে হয় একটি 'ক'। এর পরে টিপতে হয় একটি বিশেষ চাবি, যাতে কম্পিউটার বোঝে যে, এই 'ক'-এর সঙ্গে কিছু একটা যোগ করতে হবে। এর পরে যেই 'ত' টাইপ করা হয়, অমনি কম্পিউটার আগে লেখা 'ক' বর্ণটি মুছে ফেলে সে জায়গায় 'ক্ত'-এর জন্য যে-চিহ্নটি আছে সেটি বসিয়ে দেয়।

এ সবই ভালো কথা, কিন্তু মুশকিল হলো অন্য জায়গায়, সেটা বেশ হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার। যেসব যুক্তচিহ্ন স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো লাইনো হরফে, সেগুলোর অস্বচ্ছ রূপ তৈরি করা হলো কম্পিউটারে। এবং সেইসব অস্বচ্ছ রূপই অবিকল্প হলো, বিকল্প হিসেবে স্বচ্ছ রূপটিও রইলো না। আনন্দবাজারের জন্য হরফ বানানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন ফিয়োনা রস্ (৭)। তাঁর বইয়ের ভূমিকা লিখতে গিয়ে উইলিয়াম রাদিচে আক্ষেপ করে বলেছেন, 'লাইনোটাইপের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্য বাংলা যুক্তবর্ণে যেসব সরলীকরণ করা হয়েছিলো—সাক্ষরতা প্রসারের কাজে যেগুলোর কার্যকারিতা হতো অমূল্য—সেসবের আর কোনো প্রয়োজন রইলো না। এ ব্যাপারটা খানিকটা অদৃষ্টের পরিহাস বলা যেতে পারে।'

খুদে কম্পিউটার এসেও যে অন্যথা হলো, তা নয়। আনুপাতিক হরফ বানানোর কাজে যাঁরা উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলেন, তাঁরা কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ, কম্পিউটারের ব্যাপারটা তাঁরা আগাপাশতলা খুব ভালো জানতেন। কিন্তু ভালো হরফ তৈরি করার জন্য অন্য আর একটি ব্যাপারেও কিছুটা জ্ঞান দরকার হয়। সেইখানে তাঁদের ঘাটতি ছিলো—মুদ্রণ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না। সে কথা তাঁদের তৈরি হরফ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রেও দেখেছি, ছাপার সময়ে কোন কোন চিহ্ন বেশি প্রয়োজন হয় তা এঁরা জানেন না, কোথা থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা যায় তা পর্যন্ত জানেন না, লাইনো ছাপার নাম পর্যন্ত এঁরা শোনেননি, স্বচ্ছতা নিয়ে বাংলা মুদ্রণে যেসব কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না।

স্বচ্ছ রূপ তাঁরা কখনো চোখে দেখেননি তা হতে পারে না। চার দশকের বেশি সময় ধরে *আনন্দবাজার পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছে লাইনো হরফে, অজস্র বই বেরিয়েছে, পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে—সে সব কিছুই তাঁরা পড়েননি, এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁদের চোখ দীক্ষিত ছিলো না, হরফের তফাত তাঁরা খেয়াল করেননি, বিদ্যাসাগরী

ছাড়া অন্যরকম বাংলা হরফ যে হয় সে কথাও তাঁরা সচেতনভাবে জানতেন না। সেটা আশ্চর্যেব হলেও দোষের নয়, কিন্তু হরফ বানানোর কথা মাথায় আসার পরেও যে এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানবার বা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেননি, সেটার কারণ আমার বুদ্ধির অগম্য। হয়তো জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক *আনন্দবাজার পত্রিকা* ছিলো তাঁদের আদর্শ। আনন্দবাজাব যেভাবে হরফ বানিয়েছে, তাঁবাও অন্ধভাবে সেই পথেই গেছেন।

অনভিজ্ঞতাব জন্য সমস্ত হরফই যে দেখতে খারাপ হলো তা বলছি না। প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্কেব ভুলে কোনো কোনো হরফে একটু-আধটু গণ্ডগোল হয়তো হলো—হয়তো 'ড়' লিখে তাতে উ-কার দিতে গেলে দেখা গেলো তলার ফুটকিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, কিংবা 'ছ' লিখে তাব পরে 'ন' লিখতে গেলে দুটো ঠেকে যাচ্ছে—এই ধরনের। এগুলো ঠিক করে নেওয়া শক্ত নয়। সব মিলিয়ে কোনো হরফ চলনসই হলো, কোনোটা বেশ ভালোই হলো। কম্পিউটারের বাড়তি যা যা সুবিধে, সেসব তো পাওয়া গেলোই। তবে অনভিজ্ঞতার ফলে কিছু কিছু আপদ এসে জুটলো, যেগুলো অপরিহার্য ছিলো না।

একটা উদাহরণ দিই। কম্পিউটারে বর্ণযোজনা করতে হয় কি-বোর্ডে টাইপ করে। টানা বাংলা লেখায় একশোটা বর্ণচিহ্ন বসাতে গেলে গড়ে তার মধ্যে দশটার বেশি লাগে আ-কারেব চিহ্ন। অথচ আমি এমন বহু হরফ দেখেছি যাতে এই চিহ্নটি টাইপ করতে হয় দুটি বোতাম টিপে—কোথাও aa অর্থাৎ দু বার a টাইপ করে, কোথাও Shift বা হাত-বদলেব বোতামের সঙ্গে a টাইপ করে। শুধু এই একটি কারণেই এই সব হরফে ছাপার বেগ লক্ষণীযরকম কম হয়। এ থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তা হলো, একটিমাত্র বোতাম টিপেই আ-কারের চিহ্নটি টাইপ করার ব্যবস্থা করা উচিত, নাহলে টাইপেব বেগ কমে যায। দ্বিতীযত, যে-আঙুল দিয়ে আ-কারের চিহ্নটি টাইপ করা হবে, সেই আঙুলের ওপবে এমনিতেই চাপ বেশি, তাই তার এক্তিয়ারে অন্যান্য যেসব বর্ণচিহ্ন থাকবে সেগুলো যেন খুব বেশি দরকারি না হয সেদিকেও নজর রাখা উচিত।

আসলে যাঁরা এইভাবে হরফ তৈরি করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই শখের বশে কবেছিলেন। নিজেব কম্পিউটারে নিজে একটা চিঠি লিখে আত্মীয়কে বা বন্ধুকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে, এই ধরনের অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁরা কাজে নেমেছিলেন। পাকেচক্রে হরফ যখন তৈরি হয়েই গেলো, তখন অন্যরাও যাতে তা ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সে হরফের বিতবণ বা বিপণনের ব্যবস্থাও এঁরা করেছেন, কিন্তু বই বা পত্রিকা ছাপার জন্য কী করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁবা খুব একটা ভাবেননি। শুধু যদি বাড়িতে বসে আত্মীয়দের নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠানোর জন্য চার লাইনের চিঠি লিখতে হয়, তাহলে টাইপের বেগ কীসে কমে গেলো না গেলো তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

কিন্তু এই ধরনের কিছু হরফই চালু হয়ে গেছে বাংলা ছাপার কাজে। কম্পিউটার আসার ফলে যতোটা উন্নতি হতে পাবতো বাংলা ছাপার বেগে, ততোটা হয়নি। আর সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি যা হয়েছে, তার কথা আগেই বলেছি—অস্বচ্ছ যুক্তচিহ্ন আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

এখানে কেউ বলতে পারেন, 'লাইনোতে যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ করা হয়েছিলো মেশিনের খোপে সব বর্ণচিহ্ন ধরানোর জন্য। কম্পিউটারের স্মৃতিভাণ্ডার তো অতো সঙ্কীর্ণ নয়, সেখানে অনেক চিহ্নেরই জায়গা হয়। তাহলে স্বচ্ছ করার দরকারটা কী?'

দু-ভাগ করে উত্তর দিচ্ছি এ প্রশ্নের। প্রথমত, লাইনোতে যতো যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ করা হয়েছিলো, তার সবকটাই জায়গা সাশ্রয়ের জন্য করা হয়নি। যেমন ধরা ডাক 'ক্+ত' যুক্তবর্ণটি। চিহ্নটিকে স্বচ্ছ করা হয়েছিলো, তার জন্য একটি জায়গা রাখতে হয়েছিলো লাইনোর মেশিনে। চিহ্নটি বিদ্যাসাগরী ধাঁচে অস্বচ্ছ থেকে গেলেও তার জন্য একটি জায়গাই বরাদ্দ করতে হতো। সাশ্রযের জন্য স্বচ্ছতার দরকার ছিলো, কিন্তু শুধুমাত্র সাশ্রয়ের কারণেই স্বচ্ছতার কথা ভাবা হয়নি। যুক্তবর্ণ স্বচ্ছ হলে তা বুঝতে সুবিধে হয়, শিক্ষার্থীর পক্ষে শেখার সুবিধে হয়, অথচ বর্ণমালার প্রকাশক্ষমতার বিন্দুমাত্র হানি তো হয়ই না বরং বৃদ্ধি হয়। স্বচ্ছতার দরকার স্বচ্ছতার কারণেই। আগে রাদিচের যে-মন্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছে, তার সারমর্ম এটাই।

উত্তরের দ্বিতীয় ভাগটা নিয়ে আলোচনাটা আর একটু বিস্তারিত হবে। যাঁরা স্বচ্ছতার 'দরকার কী' এই প্রশ্ন করেন, তাঁরা প্রচ্ছন্নভাবে ধরে নেন যে, বিদ্যাসাগরী হরফের রূপটাই বাংলা লিপির 'আসল' রূপ, লাইনোতে প্রযুক্তির সঙ্গে আপোশ করতে গিয়ে সেই 'আসল' রূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো বাংলা হরফ। এই ধারণাটা যে ভিত্তিহীন, প্রথম থেকে এ লেখাটা পড়লে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। মুদ্রণশিল্পের রঙ্গমঞ্চে বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হওয়ার কুড়ি বছর আগেও অনেক বর্ণ অন্যভাবে ছাপা হতো, ৬ নম্বর ছবিতে আমরা তা দেখেছি। আরও একটু পিছিয়ে গেলে নানা বর্ণচিহ্নের চেহারায় আরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। ৪ নম্বর ছবিতে দেখুন, 'স্+থ' রীতিমতো স্বচ্ছ চেহারায়। তাহলে বিদ্যাসাগরী ধাঁচের অস্বচ্ছ রূপটাকেই কেন 'আসল' বলে মানতে হবে? এমন নয় যে, হালেদের ব্যাকরণ ছাপার সময়ে এই স্বচ্ছ রূপটি প্রথম কারুর কল্পনায় এসেছিলো। আগেই বলেছি, প্রথম দিকে ছাপার সময়ে সুন্দর হস্তাক্ষরের মতো করে ছাপার হরফ তৈবি করার চেষ্টা করা হতো। লোকের হাতের লেখায় এই স্বচ্ছ রূপ নিশ্চয়ই আগে থেকেই ছিলো, তা নাহলে হালেদের ব্যাকরণে এ রূপ স্থান পেতো না।

আরও আগেকার হস্তাক্ষরের যা নমুনা দিয়েছি এই লেখায়, তার মধ্যেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। ১ নম্বর ছবির প্রথম লাইনেই দেখুন 'দ্+ধ' যুক্তবর্ণের রূপ—'ধ'-এর ওপরের আঁকড়িটি এখানে রয়েছে। ভেতর দিকে জায়গা হয়নি বলে বাইরের দিকে মুখ করে রয়েছে, তবু বিদ্যাসাগরী হরফের মতো একেবারে নিম্নমুখী হয়ে চেনার অযোগ্য হয়ে পড়েনি। শেষ দিক থেকে গুনে পঞ্চম লাইনে দেখুন, 'তৃষ্ণা' কথাটা লিখতে গিয়ে কীভাবে 'ষ্+ণ' লেখা হয়েছে। এখন লেখা হয় 'ষ'-এর পিঠে দুটো কুঁজ দিয়ে, যার ফলে অনেকেই জানেন না যে ওই যুক্তবর্ণটি 'ষ'-এর সঙ্গে কী জুড়ে তৈরি হয়। অথচ অষ্টাদশ শতকের হাতের লেখায়, ১ নম্বর ছবিতে, দিব্যি স্বচ্ছভাবে বোঝানো হয়েছে এই যুক্তবর্ণ।

২ নম্বর ছবিতে শেষ লাইনের 'মুঞ্জরিবে' শব্দটি লক্ষ করুন, দেখবেন 'ঞ+জ' লিখতে গিয়ে 'ঞ'-র তলার ঢেউখেলানো অংশটা কেটে বাদ দেওয়া হয়নি।

মূল কথাটা খুব সহজ, এতো সহজ যে অনেকে চিন্তা করে দেখেন না। সেই কারণেই বার বার বলতে হয়। কথাটা হলো, অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ কোনো কারণেই অভিপ্রেত নয়। ঐতিহ্যের কথা তুলে অস্বচ্ছতার সমর্থন করতে চাইলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে, কেননা কোনো যুক্তচিহ্নই অস্বচ্ছ হয়ে প্রথম তৈরি হয় না, নানানভাবে অসাবধান প্রয়োগে অস্বচ্ছ হয়ে যায়। মনে করুন, কয়েক বছর পরে দেখা গেলো, বাংলা লেখায় কিছু নতুন শব্দ এসেছে, যেগুলোর জন্য 'ম্+ড' এই যুক্তবর্ণটি দরকার হচ্ছে। তখন যদি তার জন্য একটি চিহ্ন বানানো হয়, চিহ্নটা কীরকম দেখতে হবে? তার মধ্যে কি একটা ছোটো 'ম' আর একটা ছোটো 'ড' দেখা যাবে, না কি বিচিত্র একটা আঁকিবুকি কেটে বলা হবে যে, এইটি 'ম+ড'? স্বচ্ছ চিহ্ন থেকে শুরু করে কী করে বিভিন্ন অস্বচ্ছ চিহ্নের উদ্ভব হয়েছে, তার নানা উদাহরণ আমি দিয়েছি আমার *ধ্বনিমালা বর্ণমালা* (১৫) বইয়ের 'বাংলা লিপি' পরিচ্ছেদে, এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

আনন্দের কথা, গত কয়েক বছরে কম্পিউটারে তৈরি হরফের এই চিত্রটা খানিকটা পালটাচ্ছে। মুদ্রণের ব্যাপারে যাঁদের দীর্ঘ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা আছে, তেমনই কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছেন হরফ বানানোর ব্যাপারে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁদের হরফ ক্রমশ স্বচ্ছ করছেন। বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা শিশু সাহিত্য সংসদ সম্প্রতি উদ্যোগ নিয়ে একটি হরফ তৈরি করেছেন (১৬), বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে। আমি যে আনুপাতিক হরফ প্রথম প্রকাশ করেছি ২০০১-এ, তাতেও লক্ষ রেখেছি স্বচ্ছতার দিকে। সে হরফ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ছাপার জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু আরও নির্বিশেষভাবে তার ব্যবহার কীভাবে করা যায় তা নিয়ে অনেকে উল্লেখযোগ্য কাজ করছেন, আংশিকভাবে সফলও হয়েছেন। আমার হরফ, এবং এ সংক্রান্ত বিবিধ কাজের বিবরণ, পাওয়া যায় আন্তর্জালে। এই সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, কম্পিউটারে বাংলা ছাপা সাবালকত্বের দিকে এগোচ্ছে।

১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১)।
২. অতুল সুর, *বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর* (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮; কলকাতা: জিজ্ঞাসা ১৯৮৬)।
৩. শ্রীপান্থ, *যখন ছাপাখানা এল* (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭; কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬)।
৪. বিনয় ঘোষ, *জনসভার সাহিত্য* (প্রথম প্রকাশ ১৩৬২ বাং; কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৮৫ বাং)।
৫. যোগেশচন্দ্র বাগল, *মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা* (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮২)।
৬. অনিমা মুখোপাধ্যায়, *পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা রীতি* (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১)।

৭. Fiona G. E Ross, *The Printed Bengali Character and Its Evolution* (London. Curzon, ১৯৯৯)

৮. Nathaniel Brassey Halhed, *A Grammar of the Bengal Language* (প্রথম প্রকাশ ১৭৭৮; কলকাতা. আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৮০)।

৯. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলকাতা সাহিত্য সংসদ, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৮৪, মুদ্রণ ১৯৯৪)।

১০. *পঞ্চতন্ত্রের গল্প*, ২য় খণ্ড (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩)।

১১. *পরশুরাম রচনাবলী* (কলকাতা. এম সি সরকার, ৩য় সংস্করণ ১৩৮৮ বাং এবং ৪র্থ সংস্করণ ১৩৯২ বাং)।

১২. সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ১৪/১০/১৯৩৩ তারিখে লাইনোটাইপ কোম্পানিকে লেখা চিঠি (বস্-এর বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

১৩. লীলা মজুমদার, *খেরোর খাতা* (কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ ১৪০৩ বাং)।

১৪. পলাশ বরন পাল, Bangtex–A package for typesetting documents in Bangla using the Tex/Latex systems (প্রথম প্রকাশ ২০০১, প্রাপ্তিস্থান আন্তর্জাল, ঠিকানা http // tnp saha.ernet in/~pbpal/bangtex/bangtex html)।

১৫ পলাশ বরন পাল, *ধ্বনিমালা বর্ণমালা* (কলকাতা প্যাপিরাস, ২০০১)।

১৬. *সংসদ শব্দজগৎ* (কলকাতা শিশু সাহিত্য সংসদ, ১০ সংস্করণ, ২০০২)।

বইয়ের ভবিষ্যৎ

স্বপন চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর ভাষণে বলেন:

> কোন শরীরী জড় পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাবপদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। ...আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধুঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে।

সময়টা বাংলা ১৩১৪ সন। সম্মিলনের আয়োজক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তখনকার সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর যুগটাকে বলছেন বাঙালির 'দল বাঁধার যুগ'। সাহিত্যের কারবারিরা শূন্যে চরে বেড়ালেও স্বদেশি হাওয়ার অনুকূলে তাঁদের উড়তে হবে ঝাঁক বেঁধে। এবং সে কারণেই বাঙালি সাহিত্যকারদের এই জমায়েত।

বাঙালি জাতি আদতে এক মানস-পদার্থ, তার ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ ইতিহাস না থাকুক সাহিত্য আছে, তার সত্তাপরিচয়ের খাঁটি আকর তার জাতীয় সাহিত্য—এ গোছের কথা তখন বলছেন অনেকে। কাশিমবাজারে সেদিনকার সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তেরো বছর আগে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে এমন কথা বলেছিলেন স্বয়ং তিনি। কিন্তু আধুনিক জাতির সত্তানির্মাণের কাজে চাই যৌথ স্মৃতিব সংশয়াতীত অভিজ্ঞান। যা ধোঁয়ার মতো, বাষ্পের মতো, সেই ভাবপদার্থের বস্তুমাধ্যমকে আনা চাই ধরাছোঁওয়ার মধ্যে, পুনর্গঠিত জাতির যৌথ মুঠির নাগালে। জাতিসত্তার সংরচন ও ইতিহাসের সংরক্ষণের এই জোড়া উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 'সাহিত্য' যতই মানস-পদার্থ হোক না কেন। এই প্রকল্পে পরিষদের তদবধি সাফল্যের একটা ফিরিস্তিও রামেন্দ্রসুন্দর পেশ করেন তাঁর সম্পাদকীয় ভাষণে:

> এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহস্রাধিক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইযাছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষৎ বিস্মৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ...কবিকঙ্কণের হাতের লেখা

> পুথি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন।

কেবল পুথি উদ্ধার ও ছাপা নয়, ভাবপদার্থের ভৌত আশ্রয়ের যে-কোনো স্মারক সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে চান পরিষৎ সম্পাদক। পরিষদের প্রস্তাবিত মন্দিরে জড়ো করে রাখা হবে 'জাতি' ও 'জাতীয় সাহিত্য' নামক ফেরার পদার্থের ইন্দ্রিয়গম্য প্রতিটি নিশান:

> শ্রীচৈতন্যের হস্তাক্ষরের পার্শ্বে নিত্যানন্দের ছড়ি বিদ্যমান থাকিবে। ...বিদ্যাসাগরের পাদুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী শোভা পাইবে। ...প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙ্গা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব।[২]

পশ্চিমের দেশগুলিতে এ ধরনের টুকিটাকি জড়ো করে সংগ্রহালয় কিংবা লেখ্যাগার গড়ে তোলার সঙ্গে 'ইতিহাস' নামে এক 'বৈজ্ঞানিক' বয়ান নির্মাণের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, অন্তত এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে। আজকাল অনেকের বিশ্বাস যে, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সম্পর্ক ছিন্ন না করে এই তথাকথিত 'বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আধুনিকতার তত্ত্ববিশ্বে যা বেমানান, আজকের বাস্তবকে প্রভাবিত করতে যা অক্ষম, তা-ই 'অতীত' নামে এক বিষম জগতের জিনিস, সময়ের উচ্ছিষ্টের মতো টিকে যাওয়া সেই দুনিয়ার কিছু কাগুজে বা পাথুরে সাবুদ। এ সমস্তই ঐতিহাসিকের 'বৈজ্ঞানিক' অনুসন্ধানের রসদ। আর তার 'আবিষ্কৃত' ইতিহাস বিষয় হিসেবে ততটাই 'বৈজ্ঞানিক' যতটা তিনি বিষয়ী হিসেবে তাঁর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গরজ গোপন করতে সক্ষম। ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ফরাসি তাত্ত্বিক মিশেল দ্য সেরতো বলছেন: 'In the epistemology that was born with the Enlightenment, the difference between the subject of knowledge and its object is the foundation of what separates the past from the present.'[৩] কথাটা পশ্চিমের বেলা শর্তসাপেক্ষে সত্যি হয়তো, কিন্তু উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার ক্ষেত্রে বোধ হয় নয়। ওদের 'ইতিহাস' আছে, আমাদের নেই; আধুনিক অর্থে 'জাতি' হয়ে উঠতে গেলে আমাদেরও ইতিহাস চাই, নইলে আত্মবিস্মৃতির মাশুল হিসেবে বিসর্জন দিতে হবে জাতির সামূহিক আত্মতা। কিন্তু সেই জাতিপরিচয়ের ইতস্তত স্মৃতি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে 'সাহিত্যে', তার জড় অভিজ্ঞান উদ্ধার করা গেলেও তার ভেতরকার আসল জিনিস ধোঁয়া আর বাষ্পের মতোই উদ্‌বায়ী। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর সঙ্গে পলাশির লড়াইয়ের গোলাও সাজিয়ে রাখতে হবে, সাহিত্যের জাদুঘরে কলমের পাশাপাশি থাকবে আমাদেব পরাহত জাতিসত্তার লজ্জার দাগ, থাকবে সেই সত্তার

অমলিন অভিমানের প্রতীক বিদ্যাসাগরের চটিজুতো। অসংলগ্ন অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত করে এ সমস্ত জিনিস একত্র করা হবে বাঙালির জাতীয় স্মারক-সংগ্রহে, 'ইতিহাস' নামক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্মিত হবে আধুনিক বাঙালি নামক 'বিষয়ী'-র কুলজি।

ঠিক এই কারণেই 'সাহিত্য' শব্দটির কোনোরকম অর্থ-সংকোচনে রাজি ছিলেন না পরিষদের উদ্যোক্তারা। ১৩২১ বঙ্গাব্দে সভাপতির অভিভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ইংরেজি 'লিটারেচার' শব্দের অর্থব্যাপ্তি সত্ত্বেও তা পরিষদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 'লিটারেচার'-এর একতিয়ারে দর্শন-বিজ্ঞানও পড়ে, কিন্তু মৌখ সাহিত্য পড়ে না:

> ইংরাজিতে লিটারেচার শব্দ যেমন সংস্কৃতে সেইরূপ একটি শব্দ আছে। লিটারেচার অর্থ বরং সংকুচিত, কিন্তু সে শব্দের সংকোচ কোথাও নাই, সেই শব্দ 'বাঙ্ময়'। ইংরাজি লিটারেচার অর্থে যাহা-কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে, কিন্তু যাহা লেখা হয় নাই, সেখানে ও শব্দ যাইবে না; 'বাঙ্ময়' লেখাই হোক, না লেখাই হোক, সর্বত্র যাইবে। মানুষের মুখ হইতেই হোক, আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বাক্ হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে, তার অর্থ কোনোরূপ সংকোচ না করিয়া বাঙ্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নহিলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেখা ছড়াগুলি, মাঝিদের সারি গান, এবং অনেক ধর্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিসগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।[৪]

জাতিপরিচয় ও ইতিহাসের কথা মুলতুবি থাক। কিন্তু এই ঘুরপথে, প্রসঙ্গান্তরে এই সামান্য সফরের শেষেই, আমরা পৌঁছে গেছি রামেন্দ্রসুন্দর উত্থাপিত সেই মৌলিক কূটাভাসে। যা ধোঁয়া বা বাষ্পের মতো অধরা, সেই মানস-পদার্থ পুথি ও ছাপাকলকেও ছাপিয়ে যায়, ছড়িয়ে থাকে মেয়েদের ছড়ায় আর মাঝিদের গানে, লেখ্য সংস্কৃতির মান্য বিষয়ীদের ত্রিসীমার বাইরেও খুঁজতে হয় তার রক্তমাংসের অধিশ্রয়। পাঠ্যবস্তুর ভাবপদার্থ ও তার বস্তুগত নিধানের এই টানাপোড়েন রয়েছে বইয়ের ইতিহাসের অন্তর্দেশে। আর এই আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের কক্ষপথ ঘিরেই নির্মিত হয়েছিল বাঙালির জাতিপরিচয়ের আঁতুড়-বৃত্তান্ত, তার স্বদেশি আর্কাইভ। সেই নির্মাণকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের চরিতকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা ও কীর্তির কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের বহুপ্রসূ কর্মজীবনের সিংহভাগ কেটেছে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কিত গবেষণায়। বাংলায় ছাপা বইয়ের বয়স বেশি নয়, তা সবে দুশো পঁচিশ

বছর ছাড়িয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের চেনাজানা বই ও সাবেক পাঠ্যভ্যাস নিয়ে নানা সংশয় হাজির। এই সংশয় ও তজ্জনিত উদ্‌বেগ এ দেশে যত না, প্রযুক্তিতে অগ্রসর ও নিয়ত অস্থির পশ্চিমি দুনিয়ায় তার চাইতে ঢের বেশি। স্বাভাবিকভাবেই তাই আমার আলোচনায় সেই দুনিয়ার কথাই উঠবে বেশি করে। তবু বলব, বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা এক অর্থে আমাদের পাঠাভ্যাস ও সাহিত্যচর্চার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবনাচিন্তা। সেই ভাবনাচিন্তা ঘিরেই প্রবন্ধের বাকি কথা। আমার সৌভাগ্য, কথাগুলি ব্রজেন্দ্রনাথের বিপুল মেধা ও শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধায় নিবেদন করবার সুযোগ হল।

ছাপা বইয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে, আমাদের পড়বার অভ্যেস আর সেইসঙ্গে চিন্তার ধরন একেবারে বদলে যেতে চলেছে—এরকম আশঙ্কা (কেউ কেউ বলবেন আশ্বাস) ইদানীং ব্যক্ত করেছেন পশ্চিমের বেশ কয়েকজন পণ্ডিত। গত বিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি ইংরেজি বই ও প্রবন্ধের নাম থেকেই এই উৎকণ্ঠা অথবা উত্তেজনার আঁচ পাওয়া যাবে। যেমন ও. বি. হারডিসন-এর *ডিসঅ্যাপিয়ারিং থ্রু দ্য স্কাইলাইট* (১৯৮৯), গ্রেগরি আলমার-এর *টেলিথিওরি: গ্র্যামাটোলজি ইন দি এজ অফ ভিডিও* (১৯৮৯), অ্যালভিন কেরনান-এর *দ্য ডেথ অফ লিটারেচার* (১৯৯০), প্যাট্রিক কনর-এর প্রবন্ধ 'হাইপারটেক্সট ইন দ্য লাস্ট ডেজ অফ দ্য বুক' (১৯৯২), স্‌ভেন বারকের্টস-এর *দ্য গুটেনবার্গ এলেজিস: দ্য ফেট অফ রিডিং ইন অ্যান ইলেকট্রনিক এজ* (১৯৮৪), জর্জ ল্যানডো-র প্রবন্ধ 'টুয়েন্টি মিনিটস ইনটু দ্য ফিউচার, অর হাউ আর উই মুভিং বিয়ন্ড দ্য বুক?' (১৯৯৬), ওয়ারেন চেরনিয়াক ও অন্যান্যদের সম্পাদিত বই *বিয়ন্ড দ্য বুক: থিওরি, কালচার অ্যান্ড দ্য পলিটিক্‌স অফ সাইবারস্পেস* (১৯৯৬) ইত্যাদি।[৫]

শিরোনামগুলির ওপর চোখ বোলালেই বোঝা যাবে ছাপা বইয়ের আয়ু নিয়ে জল্পনায় মূল প্রসঙ্গ কোন কোনটি। ১৯৯৬ সালে বার্কলিতে বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক আলোচনাচক্রের শেষে প্রসঙ্গগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করেন উমবেরতো একো।[৬] সেগুলি হল: (১) অক্ষরভিত্তিক বনাম ছবিনির্ভর সংস্কৃতি; (২) বই বনাম বিকল্প পাঠ্যাধার; (৩) প্রকাশনা বনাম তথ্যজ্ঞাপন, বিশেষত জনসংযোগ; (৪) নানা গোত্রের (একো বলছেন তিন গোত্রের) অতিপাঠ বা হাইপারটেক্সট; (৫) পরিবর্তন বনাম সংশ্লেষ। এ ছাড়াও আছে অন্যান্য প্রশ্ন, যেমন সেন্সরশিপ ও কপিরাইট সংক্রান্ত আইনের ওপর নতুন পাঠ প্রযুক্তির প্রভাব, কিন্তু সেগুলি একোর পাঁচ ঠাঁইয়ের আওতাতেই আলোচনা করা চলে। তবে একটি প্রসঙ্গ একো পাড়েননি। সেটি হল, পুরোনো পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক চর্চা নতুন প্রযুক্তির ফলে কোনদিকে মোড় নেবে সেই প্রশ্ন। 'পাঠ্যবস্তু' খুব বড়ো মাপের শব্দ। তার ব্যাপ্তি পুরোটা জরিপ করতে পারে, এই লেখার দৌড় অতটা নয়। হরপ্রসাদের 'বাঙ্ময়' বা রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যাপ্তার্থে নয়, রোজকার ভাষায় শব্দটির যা মোটামুটি অর্থ, সেই অর্থে

'সাহিত্য' এবং তৎসম্পর্কিত পড়াশোনায় নতুন পাঠ্যাধারের ভূমিকার কথাটা আমরা কিন্তু ভাবতে পারি।

অক্ষর বনাম ছবির প্রসঙ্গটি আমাদের খুবই চেনা। হামেশাই খেদোক্তি শোনা যায়, আজকাল ছেলেমেয়েরা বই পড়ে না। টিভি আর কম্পিউটারের সামনে বড়ো বেশি সময় কাটায়। সেটা সবসময় ক্ষতিকর না-ও হতে পারে। বই পড়ে খেলাধুলো সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ের চাইতে টেলিভিশনে খেলা দেখা নিশ্চয়ই ভালো। কম্পিউটারও বইয়ের চাইতে খেলোয়াড়-কোচদের কাজে আসছে বেশি, যদিও ওই যন্ত্রের চাবি টিপে নকল ফুটবল-ক্রিকেট খেলার উপকারিতা সম্পর্কে খটকা থাকতেই পারে। নবারুণ ভট্টাচার্যের *কাঙাল মালসাট* উপন্যাসে গ্রন্থবিমুখ বাঙালি বাচ্চাদের সম্পর্কে কথকের আক্ষেপ: 'ছোটবেলা থেকে হাই প্রোটিন, ব্রেনোলিয়া, সুলভ ব্রয়লার, কেলগ ইত্যাদি গিলে অকালেই কেঁদো কেঁদো হয়ে ওঠে। তারপরই দেখা যায় হয় কম্পিউটার শিখছে বা লুচ্চামি।'[৭] লুচ্চামির কথা বলতে পারব না, কম্পিউটার শেখা তেমন গর্হিত বোধ হয় নয়। একো আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, অতীতের বেশিরভাগ কালপর্বে অক্ষরের চেয়ে ছবির ওপর মানুষ নির্ভর করেছে অনেক বেশি। তা ছাড়া কম্পিউটার শুধু ইমেজ-নির্ভর নয়, ঠিক যেমন বইও নয় টেক্সট-সর্বস্ব। আজকের কম্পিউটারের পরদায় ছবির চাইতে অক্ষরের বিন্যাস ও গতি ঢের বেশি মনোযোগ দাবি করে।

• বিশ শতকের শেষার্ধে গণমাধ্যমের ইমেজ-সর্বস্বতা নিয়ে মার্শাল ম্যাকলুহান-এর আশঙ্কা তাই কিছুটা বাতিকগ্রস্ত বলেই মনে হয়। ভিকতর উগো-র *Notre-Dame de Paris* উপন্যাসে একটি চরিত্র বইয়ের দিকে নির্দেশ করে বলে, এটাই ক্যাথিড্রালের কাল হবে। মানে লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে নোত্র-দামের মতো বড়ো গির্জার পাথরের ভাস্কর্য আর কাচে আঁকা ছবির জায়গা নেবে বই। একো লিখছেন যে, ম্যানহ্যাটান-এর ডিসকোথেক দেখে একই ভয় পেয়েছিলেন ম্যাকলুহান, জনসংস্কৃতির এই নিয়ন-নিশানকে তিনি অক্ষরের মৃত্যুসংকেত বলে ঠাওরেছিলেন।[৮] আখেরে অবশ্য তেমন নাটকীয় কিছু ঘটেনি। বৈদ্যুতিন পাঠ্যাধারকেও সিঁদুরে মেঘ বলে ভাববার কারণ নেই। কম্পিউটার প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় অনেক দ্রুত ও অনেক বেশি, ছাপা পাঠ্যবস্তুর সম্প্রচারে বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে নতুন গতি আর বিস্তার, সাক্ষরতার আদত ধারণাটার মধ্যেই এখন ঢুকে পড়েছে পাঠের বহুবিধ আধার সম্পর্কে তালিম। কিথ টমাস-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ইয়োরোপে ছাপাকল আসার অনেকদিন পর পর্যন্তও সাক্ষর হলেই সবাই সবকিছু পড়তে বা লিখতে পারত না। অনেকেই পড়তে পারত কিন্তু লিখতে পারত না, ইংরেজিতে যারা 'সেক্রেটারি হ্যান্ড' লিখতে জানত তারা সবাই অন্য ধাঁচের হরফ লিখতে সক্ষম ছিল না, যারা 'ব্ল্যাক লেটার'-এ লেখা বা ছাপা পড়তে পারত তাদের মধ্যে অনেকে রোমান হরফের পাঠোদ্ধারে অক্ষম ছিল।[৯] মুদ্রণোত্তর যুগে হরফের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন-এর ফলে এই খণ্ডিত সাক্ষরতার সমস্যা থেকে অনেকটাই রেহাই পায় পশ্চিমের পাঠক। কম্পিউটার

আসার পর থেকে পাঠের আধার ও লেখার কৌশলের বৈচিত্র্যের সঙ্গে নতুন করে মানিয়ে নিতে হয়েছে সাক্ষর দুনিয়াকে। একই টেক্সট ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম-এ হয়তো কেউ লিখতে বা পড়তে পারেন না, কিংবা একই প্রোগ্রাম-এ নানা ধরনের টেক্সট নির্মাণ করতে জানেন না অনেকেই। আবার, একই কলম দিয়ে নানা ভাষায় লেখা যায়, কিন্তু একই টাইপরাইটার, কি-বোর্ড বা প্রোগ্রাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লেখা অসম্ভব। আপনি হয়তো কম্পিউটারের পরদায় বাংলা অক্ষর পড়তে পারেন, কিন্তু বাংলা টাইপ করতে পারেন না বা কম্পিউটার-এ বাংলায় ওয়ার্ড প্রোসেসিং জানেন না। এ সমস্ত হয়তো একরকম সমস্যা, কিন্তু অক্ষর-সংস্কৃতির পক্ষে মারাত্মক কোনো দুঃসংবাদ আদৌ নয়।

একো-র তর্কটা মুখ্যত ম্যাকলুহান-এর সঙ্গে, ফলে তিনি মৌখ সংস্কৃতির প্রশ্নটি তোলেননি। আমাদেব দেশে কিন্তু প্রশ্নটি জরুরি। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'লোকশিক্ষা' নামের প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষা ও সাময়িকপত্রের প্রসার হলে কী হবে, বঙ্গদেশে লোকশিক্ষাব উপায় কমেছে বই বাড়েনি। ইয়োরোপে এক এক দেশে হাজার হাজার কাগজ, সেসব পড়ে লক্ষ লক্ষ লোক। এ দেশে মোটে দশ-পনেরোটা, পড়ে সাকুল্যে পাঁচ-সাত হাজার পাঠক। কাজেই শাক্যসিংহ যেভাবে গোটা ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখিয়েছিলেন, কিংবা চৈতন্যদেব যেভাবে সমগ্র উৎকলবাসীকে বৈষ্ণব বানিয়েছিলেন, সেভাবে রামমোহন রায়ের চেলারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচাব করতে পারছেন না:

> ...রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

এর পর বঙ্কিম অতীতে লোকশিক্ষার যে প্রধান উপায়টির কথা পাড়েন তা হল কথকতা:

> গ্রামে গ্রামে, নগরে, নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচি আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেঁজে, যে কাট্‌না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত...সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়?[১০]

ছবিটাতে রঙের পোঁচ একটু ভারী, কথক নাদুস-নুদুস না হলে বোধ হয় তার ওজন বইতে পারত না। অতীতের জন্যে হঠাৎ এতখানি কেন কাতর হয়ে পড়লেন বঙ্কিম? লোকশিক্ষার অবক্ষয়ের জন্যে তিনি দুষছেন আধাখ্যাঁচড়া ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবকের স্বধর্মভ্রষ্ট কুরুচিকে। প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষা যাঁরা হজম করেছেন তাঁরা জনশিক্ষার নতুন মাধ্যমগুলি স্বদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রচারের কাজে নিয়োজিত করবেন, এটা ছিল *বঙ্গদর্শন* গোষ্ঠীর বড়ো গলায় চাউর করা ইচ্ছে। ইংরেজি শিক্ষা ও ছাপাখানার সাজশে তৈরি নতুন নাগরিক হুঁশ যাতে বাকি লোকসমাজের থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে পড়ুয়া আর আনপড়ের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দেওয়াও ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু উপনিবেশের মুদ্রণ-সংস্কৃতি এই আমজনতার নাগাল কতখানি পেতে পারে তা নিয়ে বঙ্কিমের কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল বলেই মনে হয়। নব্য বঙ্গের সিভিল সোসাইটি-র গ্রন্থপাঠক অনেকটাই যাঁর ফুসমন্তরে মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছিল, সেই বঙ্কিমের লেখাতেই সাবেক মৌখ সংস্কৃতি নিয়ে এ ধরনের নস্ট্যালজিয়া বার বার ফাঁস হয়ে পড়ে। ১২৮১ সনের *বঙ্গদর্শন*-এ গ্রন্থ সমালোচনার সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন: 'আজি কালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক।'[১১]

এ হেন দোটানার বশে লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে কথকতার সামর্থ্য কিছুটা ফাঁপিয়েই দেখান বঙ্কিমচন্দ্র। 'কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম' শাক্যসিংহ ও তাঁর দলবল তামাম মুলুককে কেবল মুখের কথায় সমঝিয়েছিলেন, এ কথা বোধ হয় তিনি নিজেও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন না। হৃষ্টপুষ্ট কথক তাঁর নিরন্ন শ্রোতাদের যা শেখাতেন তার মধ্যে সে কারণেই হয়তো কূট বা অভিনব কিছুই নেই। তারা শিখত যে,

> ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পূণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য....[১২]

বইয়ের কাজ অন্য। বিমর্ষণ-সমালোচনের অপেক্ষাকৃত মন্থর ও অর্ন্তমুখীন প্রক্রিয়া কথা বলে ও শুনে অনেকদূর অবধি এগোতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সংলাপ-বিনিময়ের পক্ষে যাঁরা সওয়াল করেছেন প্লেটো থেকে শুরু করে তাঁরা প্রায় সবাই সাক্ষর, তার ওপর অনেকেই লেখক ও গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্কিমের কথকের মতো ছেঁড়া তুলট সামনে বিছিয়ে সেটা দেখতে না পাওয়ার ভান করে থাকেন। যারা

লাঙল চষে, তুলো পেঁজে তাদের হাতে পুথিটি তুলে দিলে নাদুস-নুদুস কথকের পিঁড়ির তলায় লিঙ্গ-শ্রেণি-বর্ণের গোঁজটা বেরিয়ে পড়বার ঝুঁকি আছে। বাংলা উপন্যাসে যে দুজন নায়ক বইয়ের পাহাড় ভেঙে আধুনিকতার স্বর্গে চড়তে চেয়েছিল তাদের একজন, বিভূতিভূষণের অপু, ব্রাহ্মণসন্তান; অন্যজন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের অনন্ত, মালোর ছেলে। *পথের পাঁচালি* ও *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর মধ্যে প্রায় আড়াই দশকের ফারাক, তবু বিশ্বজনীন এক আধুনিকতার লক্ষ্যে এই দুই নির্বিষ্ট পাঠক সমবয়স্ক সহযাত্রী। কথক হরিহরের সামাজিক বৃত্তে এমন উত্তরণের সম্ভাবনা ভ্রষ্ট হতে বাধ্য, যেমন বাধ্য অনন্তর মালোপাড়ায়। তাই পড়ুয়া নায়কদের পাড়ি দিতে হয় শহরে। ধুঁকতে থাকা গ্রামে ফিরেও আসে তারা, কিন্তু তাদের প্রত্যাগমনের পথ ক্রমশ দীর্ঘতর হতে থাকে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা বরাবরের মতো বদলে দেয় ছাপা বই ও আধুনিক নগরজীবনের জঙ্গম দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় প্রবেশ চেয়েছিল সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই, রামায়ণ পড়তে কষ্ট করে শিখেওছিল সে। কিন্তু মৌখ লৌকিক সংস্কৃতির বদ্ধ আবহাওয়ায় তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। শেষকালে তুলসীদাসের বই সে আনমনা অবহেলায় ফেলে আসে অন্যের ঘরে—সে গল্প আপনাদের জানা।

বইয়ের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে বইয়ের অতীতের প্রসঙ্গটি পাড়তে হল, কারণ শিক্ষিত লোকসমাজের পত্তন ও আধুনিক পুর সমাজের সঙ্গে তাকে রফায় আনার কাজটি আজও এ দেশে বকেয়া রয়ে গেছে। সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার-সাক্ষরতার মাহাত্ম্য নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অনবরত বাণীবর্ষণ করতে হচ্ছে, ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে আমাদের ব্যাপক বিভ্রান্তির মধ্যে নীতির দ্বিধা ও স্বার্থের দ্বৈধ অহরহ প্রকট হচ্ছে। কথকতা সমেত মৌখ সংস্কৃতির মান্য প্রকরণগুলি আজ লোপাট, তার জায়গা নিয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৃশ্য-শ্রাব্য জগৎ। পূর্ণ সাক্ষরতার পাট না চুকিয়েই লোকসমাজ কতটা বৈদ্যুতিন ইমেজ-এর দাপট মেনে নিয়েছে তা আমরা রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহৃত চিত্রকল্প কিংবা রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপ-এর গতিবিধি খেয়াল করলেই টের পাব। ম্যাকলুহান-এর আশঙ্কা আমাদের কাছে কোনোদিনই তেমন দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল না। বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন ও হলিউড-এর পয়দা করা নব্য নিরক্ষরতার চাইতে বৈদ্যুতিন ইমেজ-এর দুনিয়ায় আমাদের ভিটেছাড়া মৌখ ও লৌকিক সংস্কৃতির রাতারাতি পুনর্বাসন এ দেশে অনেক বড়ো সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

পাঠের যে-কোনো বাহনের মতোই টেলিভিসুয়াল মাধ্যমের কোনো অমোঘ গতিপথ নেই, ইতিহাসের গুঁতো খেয়ে তা নানা দিকেই মোড় নিতে পারে। 'বুকস্ ইন টাইম' নামের এক প্রবন্ধে কার্লা হেস্‌সে আমাদের জানাচ্ছেন যে, 'প্রিন্ট কালচার' জাতীয় শব্দবন্ধে এক ধরনের প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদের ঝোঁক আছে, সাংস্কৃতিক উৎপাদনের প্রকরণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎপাদনের ব্যবস্থাকে গুলিয়ে ফেলার একটা বিপদ রয়েছে। 'মোড অফ কালচারাল প্রোডাকশন' আর 'মিনস্ অফ কালচারাল

প্রোডাকশন' এক জিনিস নয়, এটাই তাঁর এক নম্বর তাত্ত্বিক সূত্র।[১৫] ঠিক কথা। কিন্তু হেস্‌সে-ও নিশ্চয়ই মানবেন যে, কিছু কিছু 'মিন্‌স' বিশেষ ধরনের 'মোড'-কে মদত জোগায়, ক্ষেত্রবিশেষে সেই বিশেষ ব্যবস্থা সম্ভব করে তোলে।

উদাহরণ দেওয়া যাক। আজকাল অনেকেই রামায়ণ-মহাভারত টিভি দেখে শেখে। *লোকরহস্য* বইতে রামায়ণের সম্ভাব্য প্রণেতা সম্পর্কে বিলিতি পণ্ডিতের মীমাংসা স্মরণ করুন:

> রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।[১৬]

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না যে, একবিংশ শতকের গোড়ায় এই বঙ্গদেশে কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ডিগ্রির আবেদনকারী রামায়ণের রচয়িতা হিসেবে জনৈক রামানন্দ সাগরের নাম করতে পারেন। দূরদর্শনের পরদায় সপ্তকাণ্ড দেখার পর এমন মনে হতেই পারে। এমনিতে টিভি-তে রামায়ণ-মহাভারত দেখা কোনো অপবাধ নয়। এই তো, স্বয়ং একো বলছেন যে, ক্যাথিড্রাল ছিল মধ্যযুগের টেলিভিশন। তফাতের মধ্যে ক্যাথিড্রাল-এর নির্মাতারা ভালো ভালো বই পড়তেন ও দেশেব-দশের মঙ্গলের জন্যে অহোরাত্র নিস্বার্থ পরিশ্রম করতেন।[১৭] মস্ত পণ্ডিতরাও মাঝেমধ্যে মুখ ফসকে দু-চারটে হাবিজাবি কথা বলে থাকেন। একো-র অভয় সম্বল করে আমরাও এ দেশের টেলিভিশন-কে এ যুগের কথক বলতে পারতাম, রামানন্দ সাগরেব প্রতি বঙ্কিমের কল্পনীয় উষ্মার সেটাই হত উচিত জবাব।

মুশকিল হল, বঙ্কিমের কথকঠাকুর বিজ্ঞাপনের জন্যে জিরোতেন না। গবেষণার কাজে বিলেতবাসের সময় আমাদের ছ-সাত বছর বয়সের পুত্র পিটার ব্রুক্‌স্-এর মহাভারত ছবিটি বার বার করে দেখতে চাইত। নাটকের চাইতে ছবিটি কম দৈর্ঘ্যের হলেও সেটি ছ-ঘণ্টার কম নয়, তাই খেপে খেপে দেখাতে হত। ভিডিও টেপটি টেলিভিশন-এর অনুষ্ঠান থেকে রেকর্ড করা। সম্প্রচারের সময় সম্ভাব্য দর্শকের খাদ্যরুচি আঁচ করে বাসমতি চাল, আচার, পাঁপড়, চানাচুর ইত্যাদির বিলিতি ব্র্যান্ড-এর নির্মাতারা ছবির ফাঁকে ফাঁকে সেসবের বিজ্ঞাপন গুঁজে দিয়েছিলেন, আলসেমিতে সেগুলো মুছে ফেলা হয়নি। 'আজ কতটা দেখলি?' জিজ্ঞেস করলে সে নিঃসংকোচে জানাত, 'আপ টু টিলডা রাইস', বা 'আপ টু পাঠক্‌স্ পিক্‌ল্‌স্'। টিভি-র সম্প্রচার ব্যয়সাধ্য, তাব জন্যে বিজ্ঞাপনদাতা দরকার, নয়তো দর্শকদের থেকে পয়সা আদায় করতে হয়, যা সহজবোধ্য কারণেই সবসময় সম্ভব নয়। ফলে অনুপম শিল্পকর্মের স্মৃতির সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের ব্র্যান্ড-এর নাম লক্ষ লক্ষ দর্শকের মনে অনায়াসেই জুড়ে দেওয়া

যায়। 'মোড'-এর সঙ্গে 'মিন্‌স্‌'-এর সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে তাই প্রায় অচ্ছেদ্য। দর্শক শিক্ষাহীন হয়েও যদিও বা কারসাজিটা ধরতে পারে, ছবির নির্মাতা বাঁধা পড়েন কর্পোরেট বিজ্ঞাপনদাতা, চ্যানেল মালিক ও সম্প্রচার নীতির প্রণেতাদের কাছে। এ কারণেই মনে হয় দেশে চৈতন্য রথ বা রাম রথের উদ্যোক্তারা যতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে সাবেক সংস্কৃতির স্মৃতি আর নতুন টেলিভিসুয়াল মাধ্যমের চিত্রকল্প জুড়ে নিজেদের কাজ গুছোতে পেরেছেন, তাঁদের প্রতিপক্ষ তথা পুর সমাজের প্রতিবাদী শক্তি ততটা পারেননি।

সমস্যাটির সঙ্গে একো-র তিন নম্বর প্রসঙ্গের যোগ আছে। প্রসঙ্গটি, মনে করিয়ে দিই, (মুদ্রিত) প্রকাশনা বনাম তথ্যজ্ঞাপন, তথা জনসংযোগ। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির নাগাল এমন চমকপ্রদভাবে বেড়ে গেছে যে, জনসংযোগের অনেক ক্ষেত্রেই আজ বই অপ্রাসঙ্গিক। ছাপা বই ও কম্পিউটারের পরদার আধুনিক পাঠক নিঃসঙ্গ, তাকে সামাজিক-রাজনৈতিক গরজে অন্যের সঙ্গে একজোট করে বই-কম্পিউটার সহ জনসংযোগের নানা মাধ্যম। ই-মেল, ব্লগ, ওয়েবসাইট, মোবাইল টেক্সট, ইউ-টিউব কিংবা খুচরো সি.ডি. ও ডি.ভি.ডি. এই কাজ করতে পারে অনেক বেশি সক্ষমভাবে; বিপণন, প্রচার, স্বত্ব ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনকানুনের টহলদারিও তারা এড়াতে পারে বইয়ের চাইতে অনেক সহজে। কিন্তু এই কৃতিত্বের অন্যতম শর্ত হচ্ছে অক্ষর-সংস্কৃতিতে প্রাক্-দীক্ষা। ডিম্যাট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এর মতো ডিমেটেরিয়ালাইজ্‌ড টেক্সট-এর বিপুল সম্ভাবনাও তাই নিরক্ষরতা বা আধা-সাক্ষরতার অভিশাপে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য। মানুষকে বক্তব্য পড়িয়ে আমরা একজোট করতে পারি না, তাই বক্তব্য শোনাবার জন্যে তাদের সময়ে-অসময়ে একজোট করতে হয়। রাজনৈতিক সংযোগের জন্যে কাজের দিনে শহরের ব্যস্ত রাস্তায় মিছিল-জমায়েতই সেরা উপায় কি না তা নিয়ে এ রাজ্যের সাম্প্রতিক বিতণ্ডার মধ্যেই এ ব্যাপারে আমাদের অসহায়তার প্রমাণ মিলবে। সাক্ষরতার প্রসার তাই আজও আমাদের প্রতিবাদী আন্দোলনের ভরসা, গণতান্ত্রিক মননের আয়ুধ। এত অজস্র ভাষার এই দেশে সে কাজ সস্তা ছাপা বই দিয়েই হবে, যন্ত্রপাঠ্য টেক্সট দিয়ে নয়। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে শিক্ষিত জনমত সংগঠিত করতে বৈদ্যুতিন সংযোগ-মাধ্যমের গতি ও বিস্তার চাই। নর্মদা-বাঁচাও আন্দোলনের সংগঠকরা উৎখাত হওয়া গ্রামবাসীদের স্বার্থে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে যেভাবে দুনিয়া জুড়ে প্রচার চালাচ্ছেন তার থেকে মনে হয় এ দেশে জনসংযোগ ও প্রকাশনা প্রযুক্তি লড়াই না করে বরং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য আমরা রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা ও প্রশাসনিক জনসংযোগের কথা বলছি না, যদিও তার সামাজিক গুরুত্ব খাটো করবার মতো নয়।

একো উত্থাপিত অন্য তিনটি প্রসঙ্গ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ, অতএব এ তিনটির আলোচনা একসঙ্গে করা যেতে পারে। এক, বই বনাম অন্যান্য পাঠ্যাধার। লেখার চল শ্রুতিনির্ভর সংস্কৃতি সম্পর্কে যেমন উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল, অথবা চলমান হরফের

আবিষ্কার জাগিয়েছিল হাতে লেখা পুথি সম্পর্কে, ব্রেল বা অডিওটেপ ছাপা বই সম্পর্কে তেমন উৎকণ্ঠার সঞ্চার করেনি। অন্য পাঠ্যাধার বলতে তাহলে এখানে মুখ্যত কম্পিউটার-এর কথাই বলা হচ্ছে, বিশেষ করে ইন্টারনেট-উত্তর যুগের ছোটো পার্সোনাল কম্পিউটার। এখানে গোড়াতেই বলবার মতো কথা হল এই যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে লেখা ও পড়ার নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবে পুরোনো পদ্ধতি পুরোপুরি বর্জন করা হয় না, বরং চলতি পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সমঝোতা করেই নতুন প্রণালী ক্রমে নিজেকে গ্রহণীয় করে তোলে। অতএব একো-র পাঁচ নম্বর আইটেম, পরিবর্তন বনাম সংশ্লেষ, পাঠ্যাধারের প্রসঙ্গটি থেকে আলাদা করা কঠিন।

ফের উদাহরণ দেওয়া যাক। গুটেনবার্গ-যুগের আগে জাইলোগ্রাফি বা কাঠখোদাই ব্যবহার করে এক রকমের ছাপা চলত। একটি পৃষ্ঠা ছাপা হত একটিই কাঠের ব্লক থেকে, সেখানে হরফ বা অন্য টাইপ নাড়ানো-চাড়ানো সম্ভব ছিল না। এভাবে ছাপা বাইবেল-এ হরফ বা ছবির বিন্যাসে আজকের মতো বাঁ-দিক থেকে ডান-দিক বা ওপর থেকে নীচের নিয়ম সেভাবে মানা হত না। পৃষ্ঠাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে একরকম প্রতীকী ছক তৈরি করা হত। বাঁ-দিকে হয়তো তিমির পেট থেকে জোনা-র জ্যান্ত মুক্তির ছবি আর গল্প; ডান-দিকে যিশুর পুনরুত্থানের। বাঁ-দিকে নীচের প্যানেল-এ হয়তো মুসার ছবি; ডান-দিকে একই জায়গায় পিটার-এর। বাইবেল-এর পূর্বভাগ ও উত্তরভাগের মধ্যে প্রতীকী সংগতি নির্দেশ করতে এইভাবেই ছাপা হত জনতার বাইবেল বা *বিবলিয়া পপেরুম*। এটা যে আসলে গির্জার কাচের জানালার রঙিন চিত্র ও ভাস্কর্যের পাঠবিন্যাসের অনুকরণ সেটা প্রথম দেখান লেসিং।[১৬] আবার চলমান হরফ আসার পর একই ছক অনুসরণ করে বহুদিন পর্যন্ত ছাপা হয়েছে বাইবেল বা অন্যান্য বইয়ের নামপত্র। এনগ্রেভিং ব্যবহার করে নামপত্রে বিভিন্ন প্রতীকী প্রতিকৃতি, স্থাপত্য ইত্যাদির সাহায্যে বইয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে টমাস মিডলটন *দ্য টু গেটস অফ স্যালভেশন* নামে একটি বই লেখেন। বইটির আরেক নাম আছে, *দ্য ম্যারেজ অফ দি ওল্ড্ অ্যান্ড নিউ টেস্টামেন্ট*। মোক্ষেব দুই ফটক হল বাইবেল-এর পূর্বভাগ আর উত্তরভাগ, সেটা গ্রন্থনাম থেকেই পরিষ্কার। বইটি ছাপা হয় মুখোমুখি দুই পৃষ্ঠাকে তিন + তিন ছয় কলমে ভাগ করে। বাঁ-দিকের পৃষ্ঠার তিন স্তম্ভে পূর্বভাগের কথা ও টীকা: ডান-দিকের পৃষ্ঠায় উত্তরভাগের সদৃশ কাহিনি ও টীকা।[১৭]

ইয়োরোপে প্রথম দিককার ছাপা অনেক বইয়ে চিত্রিত ম্যানুস্ক্রিপ্ট-এর অনুকরণ দেখা যায়। মাঝখানে ছাপা টেক্সট, চারধারে হাতে আঁকা রঙিন ছবি—এরকম গ্রন্থ ছাপাকল আসবার দুই শতক পরেও দেখা গেছে। এতে করে ধনী সংগ্রাহক আশ্বস্ত হতেন যে, পাইকারি হারে বই ছাপা হলে কী হবে, আমার কপিটা ঠিক আর পাঁচজনেব কেনা কপিগুলোর মতো নয়। ধর্মীয় কারণেও পুরোনো পাঠ্যাধারের অনুকৃতি প্রয়োজন হত। সম্প্রতি ব্লেক মরিসন *দ্য জাস্টিফিকেশন অফ য়োহান গুটেনবার্গ* নামে একটি

উপন্যাস লিখেছেন। তাতে একজন সন্ন্যাসী ও গুটেনবার্গের সংলাপ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি। সন্ন্যাসীর কথা দিয়ে উদ্ধৃতির শুরু :

> 'The word of God needs to be interpreted by priests, not spread about like dung.'
> 'I do not wish to despoil the Word.'
> 'But it will happen. To hand it about to all and sundry is dangerous. Would you have ploughmen and weavers debating the Gospel in taverns?'
> 'If that is what they want to do...'
> 'But what of the dangers? It would be like giving a candle to infants.'
> 'Such copies we make of the Bible would first be for monasteries and churches.'
> 'The Bible! You plan to make the Bible as well?'
> 'I have considered it.'
> 'The Bible, to have authority, must be written, by monks, not by some heretic machine.'
> 'With my press, it will look as though a monk has written it'.
> 'But it will be counterfeit, the work of an engine. And God does not inhabit an *engine*.'[১৮]

কাল্পনিক সংলাপটি পড়লে বোঝা যাবে, ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে শ্রীমদ্ভাগবত বা মনুসংহিতা ছাপতে হয়েছিল তুলট কাগজে পুঁথির বহরে ব্রাহ্মণ কম্পোজিটারকে দিয়ে তা আমাদের দেশের বিশেষ কোনো মানসিক বৈকল্যের কারণে নয়।[১৯] সি.ডি.-তে বা ইন্টারনেট-এ পড়া যায় এরকম অনেক টেক্সট আজও যে বাঁধানো বই বা কোডেক্স-এর চেহারা অনুকরণ করে থাকে তার কারণটাও এক— পুরোনো পাঠাভ্যাস যেন আচমকা বড়ো ধাক্কা না খায়।

অনুকরণের কথা বাদ দিলেও আপাতত নতুন ও পুরোনো পাঠ্যাধারের সহাবস্থান চালিয়ে যেতে আমরা বাধ্য। কিছু কিছু কাজে বই যন্ত্রের চাইতে বেশি জুতসই। বিয়ের ঘটকালি ইন্টারনেট-এ হোক, বিয়ের মন্ত্র বই থেকে পড়াই বেশি সুবিধের। অন্যদিকে, অভিধান ও জ্ঞানকোষের কাজে কম্পিউটার অনেক বেশি সমর্থ। শব্দ থেকে মানেতে না গিয়ে আমরা উলটো পথে মানে থেকে শব্দে পৌঁছোতে পারি, চাবি টিপে চলে যেতে পারি সমার্থে বা সংলগ্ন প্রসঙ্গে। অদূর ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিন পুস্তক ও ডিজিট্যাল কালি দুই মলাটের মধ্যে শয়ে-শয়ে বই গুঁজে দেবে, বাচ্চারা পেল্লায় থলের বদলে ছোটো মেমরি-স্টিক হাতে ইশকুলে যাবে, আর সেসব বই-খাতা পড়তে দরকার হবে

কম্পিউটার-এর। তা সত্ত্বেও ছাপা বইয়ের আসন্ন বিলুপ্তির কোনো সম্ভাবনা দেখি না।

আসল সমস্যা অন্য জায়গায়। যেভাবে আমরা চিন্তা করি, শিক্ষিত চোখ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখি, অর্জিত তথ্য ও জ্ঞান ভেঙে সাজাই—সেই তাবৎ প্রক্রিয়াটিকেই নতুন পাঠ প্রযুক্তি বদলে দেবে কি না সেটাই বড়ো প্রশ্ন। তার সঙ্গে কি পালটে যাবে পাঠ্যবস্তু ও তার নির্মাণের ধারণা, লেখক-পাঠকের সংজ্ঞার্থ ও সম্পর্ক? আর সেসব বশে রাখতে কি প্রয়োজন হবে নতুন শাসনবিধির? এ সবকটি আসলে একই প্রশ্নের আলাদা আলাদা লেজুড়। আমরা এই প্রশ্নগুলির প্রথমটি নিয়েই আপাতত ভাবব।

মুখনিঃসৃত শব্দ আদতে একটি আনুপূর্বিক ঘটনা, তার অস্তিত্ব ক্ষণের ক্রমিকতায়। লেখার কিন্তু একটা অবয়ব আছে, পাকা ঠিকানা আছে, বাহ্য আশ্রয় আছে। লেখার আয়ু দীর্ঘ, ফলে তার বাহ্যরূপের প্রতি মানুষের এক ধরনের বস্তুকামী সম্ভ্রম আছে। শয়তানের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সই করবার আগে গেয়টের ফাউস্ট সেই কথাটা প্রায় রঙ্গ করে বলে মেফিস্টোফিলিসকে। মুখ থেকে কলমে চালান হলেই শব্দের মৃত্যু, যে জড় পৃষ্ঠায় তাকে উপুড় করে দেওয়া হল তা-ই এর পর থেকে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। ইংরেজি তরজমায় দুটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করি: 'The word expires, in passing to the pen, / And wax and sheepskin lord it over men.'[২০]

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে রেজি দ্যব্রে বলেছেন যে, প্রাচীন খ্রিস্টধর্মের কোনো স্থায়ী ডেরা ছিল না, ষষ্ঠ শতকের পর থেকে অগাস্টিনের প্রভাবে নিউ টেস্টামেন্টকে একটি আবাস হিসেবে কল্পনা করা হতে থাকে।[২১] প্রাচীন ইহুদিদের যাযাবর জীবন ও রোমানদের গার্হস্থ্য সভ্যতার তফাতের সঙ্গে হয়তো এই ইতিহাসের যোগ আছে। তবে বইকে সত্যের আধার বা আবাস বলে কল্পনা করা বা বইয়ের প্রতি বস্তুকামী মনোভাব অনেক সংস্কৃতিতেই কমবেশি দেখা যাবে। আমরাও বইয়ে পা লেগে গেলে মাথায় ঠেকাই, বই নিয়ে কবরে বা চিতায় যাই। গ্রন্থবিদ্ ওয়ালটার অং বলছেন যে, মুদ্রণের প্রচলন হওয়াতে বাক্সবন্দি সত্য বা স্মৃতি হিসেবে বইয়ের অন্তঃসংহতির এই ধারণা আরও দৃঢ়মুল হয়।[২২] অনেকেই অবশ্য বলবেন যে, ছাপাখানা আসবার আগেও বইয়ের প্রতি এই বস্তুকামী মনোভাব আদৌ বিরল নয়, যদিও আধুনিক অর্থে বইয়ের তেমন সংহতি—অর্থাৎ একটি স্বতন্ত্র আখ্যাপত্রে বর্ণনা করা যায়, বিষয় ও রচনার এমন সংহতি—হয়তো ছিল না। বোরহেস-এর 'বেবেল-এর গ্রন্থাগার' গল্পে কাল্পনিক নানা অঞ্চলের কথা আছে যেখানকার তরুণরা সাষ্টাঙ্গে পুস্তকপ্রণাম করে, ভক্তিভরে বইয়ের পাতা চুম্বন করে, কিন্তু একটি অক্ষরও পড়তে পারে না।[২৩] এটা নাহয় অলীক কাহিনি। কিন্তু ষোড়শ শতকের শেষদিকে ওয়ালটার রলি-র বন্ধু টমাস হ্যারিয়ট ভার্জিনিয়ার উপনিবেশে সেখানকার অধিবাসীদের বাইবেল-এর মহিমা বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হন। বইয়ে কী বলা হয়েছে তা উপেক্ষা করে নিরক্ষর মানুষগুলি বইটিকে ছুঁয়ে দেখতে চায়, গায়ে ঘষতে চায়, চিবিয়ে খেতে চায়।[২৪] আর বইকে কবচ বা তুক হিসেবে ব্যবহারের নজির রয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যে।

আলোচনার শুরুতে সাহিত্যের ভাবপদার্থ ও গ্রন্থরূপী জড়পদার্থের যে-কূটাভাসের কথা রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য ধার করে পেড়েছিলাম তা ফের স্মরণ করা যাক। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষণের ছয় দশক পরে রোব্যের এস্কারপি তাঁর *দ্য বুক রেভোলিউশন* (১৯৬৬) গ্রন্থে লেখেন: 'হাতে যে-বই ধরে আছি সেটা আসলে কাগজ, বইটা সর্বদাই রয়েছে অন্য কোনোখানে।'[২৫] যাকে এস্কারপি বলছেন বইয়ের 'প্লাস্টিক' এবং 'সেম্যান্টিক' মাত্রা, তাকেই আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের জড়পদার্থ আর ভাবপদার্থে তরজমা করে নিতে পারি। বইয়ের ভাবপদার্থের তথাকথিত ঐক্য যে তার বস্তুরূপের ঐক্যের ফলে সৃষ্ট এক বিভ্রম, এ কথা ঘটা করে রাষ্ট্র করেছিলেন মিশেল ফুকো, তাঁর জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বইটিতে।[২৬] হাতে যে দুই মলাটের জিনিসটা ধরে আছি বই মানে সেই জিনিসটিই কেবল নয়। মলাট ছেড়ে বেরোলেই বইয়ের শব্দরাজি বাইরের দুনিয়ার আরও ব্যাপকতর বয়ানসমূহের ছিন্ন অংশ বলে ধরা পড়ে, এবং সেই অংশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের রীতিনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই আলাদা। গ্রন্থের সংহতি সম্পর্কে সংশয় জানানোর পরই ফুকো একজন লেখকের রচনাবলির ঐক্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। প্রশ্নগুলি সংগত হলেও একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার। গত চারশো বছর ধরে পশ্চিমের পাঠনির্ণয় তাত্ত্বিকরা বিশেষ বিশেষ টেক্সট-এর ঐক্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন। তাতে অন্য লেখকের খোদকারি, অনুলিপির প্রমাদ, যৌথ রচনা, ছাপার ভুল, সেন্সর-এর ছাঁটাই সম্পাদক বা অভিনেতার প্রক্ষেপ—এ সব নিয়েই তাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন। একটি গণিতের বইয়ের ঐক্য যে একটি কাব্য সংকলনের ঐক্যের মতো নয়, এ তুমুল সমাচার শোনানোর জন্যে ফুকোর অপেক্ষায় ছিলেন না তাঁদের কেউই। কিন্তু লেখকসত্তার সংহতি নিয়ে খটকার কথা এরা মাঝেসাঝে বললেও শব্দস্রষ্টার এক সংহত আদর্শায়িত পরিচয় নিয়ে এঁরা কোনো মৌলিক অনাস্থা প্রকাশ করেননি। ফুকো যা-ই বলুন, প্রণেতার ঐক্যের ধারণা সর্বদা প্রণীতের আপাত-সংহতির ওপর নির্ভর ছিল না।

শব্দের ধ্বনি ও লিখিত রূপ নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তির জন্যে উপমা ও রূপকও মনে হয় কম দায়ী নয়। লিখিত পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে প্লেটোর সংশয় সুবিদিত। লেখক সবসময়ই নিরুদ্দেশ, তাঁর উদ্দিষ্ট শ্রোতারাও রচনার মুহূর্তটিতে অনুপস্থিত। ফলে শ্রোতার স্বরূপ সম্পর্কে বক্তা কিছুই জানতে পারেন না। শ্রোতা যখন পাঠক হতে বাধ্য হন, তখন তাঁর স্মৃতি নির্জীব হয়ে আসে, জ্ঞান ও মননের টাটকা জীবন পুঁথির জড় শরীরে মৃতকল্প হয়ে পড়ে থাকে।[২৭] বাস্তবে যে আদৌ তা হয় না, সে কথা সম্ভবত প্লেটোও জানতেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে গ্রন্থই হয়ে উঠবে স্মৃতির উপমা, দ্বাদশ শতকে হিউ অফ সেন্ট ভিক্টর একটি বিশ্বজনীন স্মৃতিকোষের নকশা সৃজন করবেন উৎকীর্ণ লিপির ফলক অথবা পুঁথির পৃষ্ঠার ভিতে।[২৮] দুই মলাটের মধ্যে ভাঁজ করা দুনিয়া হয়ে উঠবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌধ, এক নিটোল জগতের রূপক। মুদ্রণের প্রযুক্তি সেই জগৎকে একটা কঠোর অনুশাসনের মধ্যে নিয়ে এসেছে বলে

অনেকের মত। ১৯৮২ সালে, কম্পিউটার-এর ব্যাপক চল হবার আগে, ওয়ালটার অং লেখেন:

> Writing moves words from the sound world to a world of visual space, but print locks words into position in this space. Control of position is everything in print.[২৯]

'লক', 'কনট্রোল' জাতীয় শব্দের মধ্যে কেমন ফৌজি গন্ধ আছে, একটা দমবন্ধ ভাব আছে। অনেকেই মনে করেন, অং কিছুটা বাড়িয়ে বলেছেন, অক্ষরের রূপ ও বিন্যাস সম্পর্কে ছাপাকলের সৃজনক্ষম সম্ভাবনাকে লঘু করেছেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে শব্দের বন্দিদশা নিয়ে অনেকেই অস্বস্তিতে ছিলেন, যেমন দার্শনিক জন লক, বা এমনকী রবীন্দ্রনাথও। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'লাইব্রেরি' নামে একটি ছোটো গদ্যরচনায় তিনি গ্রন্থাগারকে জেলখানার সঙ্গে তুলনা করেন, 'এখানে...মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।'[৩০] আর *জীবনস্মৃতি*-তে তিনি ছেলেবেলার ইংরেজি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সান্ত্রিবেষ্টিত পাষাণদুর্গের মিল বর্ণনা করেন: 'প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাক্‌সেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ম সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত।'[৩১]

জার্মান কবি সেবাস্টিয়ান ব্রান্ট-এর *মূর্খের জাহাজ* নামের কাব্যে এক গ্রন্থমূর্খের কথা আছে যে তার ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বই দিয়ে বন্ধ করে রাখে। প্রথম সংস্করণে মূর্খটির এক স্মরণীয় এনগ্রেভিং ছিল, শিল্পী অ্যালব্রেখ্‌ট ড্যুরার।[৩২] গেয়টের ফাউস্টকে এরকমই একটা পাঠকক্ষে আমরা দেখি নাটকের প্রথম দৃশ্যে। অন্যদিকে, বিশ্বচরাচরকে ঈশ্বরের মহাগ্রন্থ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে খ্রিস্টীয় সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে। বই তাই একদিকে বিশ্বসংসারের উপমা, অন্যদিকে সেই সংসার থেকে নির্বাসনের হেতু। গৌরব ও কলঙ্কের এই জোড়া অলংকার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল ছাপা বই। বই থেকে মুখ তুলে নিসর্গের দিকে তাকানোর পরামর্শ আমরা এই সেদিন অবধি পেয়েছি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কবিতায়।[৩৩]

বইয়ের পাষানদুর্গ ভেঙে শব্দ তবে মুক্ত হবে কেমন করে? দুই মলাটের মধ্যে অন্তরীণ শব্দকে বয়ানের অবারিত স্রোতে খালাস করবার সুযোগ কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার প্রসূত অতিপাঠ বা হাইপারটেক্সট-এর মধ্যে। এখানেই এসে পড়ে একো-র চার নম্বর প্রসঙ্গ, অর্থাৎ তিন রকমের অতিপাঠের কথা। বৈদ্যুতিন টেক্সট সম্পর্কে আজকাল অগুনতি লেখা বেরোচ্ছে, তাতে অতিপাঠের নানাভাবে বর্গবিচার করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্য একো প্রস্তাবিত তিন বর্গেই কাজ চলে যাবে। একটিকে উনি বলছেন 'সিস্টেম', যেমন অভিধান বা কোষগ্রন্থ। এর পরিধি সীমিত, কিন্তু তারই

মধ্যে নতুন অর্থ, সংজ্ঞা, উদাহরণ, ছবি ইত্যাদি পাঠোৎপাদনের সম্ভাবনা অফুরান। দ্বিতীয়টি একটি বিশেষ টেক্সট। এর পরিধি ছোটো; নতুন ব্যাখ্যা, ভাষ্য ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষমতা এতে একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে দেওয়া আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলির অতিপাঠ তৈরি হলে তার অনেক অভূতপূর্ব ব্যবহার আমরা কল্পনায় আনতে পারি, কিন্তু 'শক্তি' শব্দটির খেই ধরে অশ্বশক্তি কিংবা শক্তিগড়ের ল্যাংচার রহস্যে পৌঁছোনো যাবে না। একো এটিকে বলছেন 'টেক্সট', অথবা 'টেক্সটুয়াল হাইপারটেক্সট'। তৃতীয়টি হল মুক্তপ্রান্ত বা 'ওপেন' টেক্সট, যার পরিধি ও প্রত্যুৎপাদন ক্ষমতা কার্যত অনন্ত। সেখানে যে-কেউ যা-কিছু যোগ করতে পাবে, একটি পাঠের সেখানে অগুনতি প্রণেতা, অনির্দিষ্ট পরিণতি।[৩৪]

মনে হয়, এই তৃতীয় ধরনের অতিপাঠই উৎকণ্ঠা ঘটাচ্ছে সবচাইতে বেশি করে। এর মধ্যে ছাপা বইয়ের মৃত্যুসংকেত দেখছেন কেউ কেউ। তার চেয়েও বড়ো কথা, সব ধরনের অতিপাঠই তথ্য ও পাঠ্যবস্তুর ওপর ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক অধিকারের দ্বন্দ্বটি প্রকট করে তুলছে প্রতিনিয়ত, ইন্টারনেট-এর দখল নিয়ে চলছে চাপা লড়াই, গ্রন্থস্বত্ব ও 'পাবলিক ডোমেইন'-এর পুরোনো ধারণা টিকিয়ে রাখা ক্রমে দুষ্কর হয়ে উঠছে।[৩৫]

একটা কথা মনে রাখা দরকার, ঠিক এ ধরনের 'ওপেন টেক্সট' না হলেও 'ওপেন ডিসকোর্স'-এর প্রতিশ্রুতি মুদ্রণ প্রযু্ি র মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন অতীতে কেউ কেউ; ফরাসি বিপ্লবের পূর্বাহ্নে ফ্রান্সে লেখকের কপিরাইট পুরোদস্তুর কায়েম হবার আগেই, কঁদরসে মননের রাজ্য থেকে ব্যক্তি-মালিকানাব ধারণাকে বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন।[৩৬] সেটা হয়নি, হতে পারেনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক দখলদারির তাগিদে। অর্থাৎ, প্রযুক্তিব সামর্থ্য মানেই শব্দ ও বয়ানের নিরর্গল মুক্তি নয়। বর্তমানে ইন্টারনেট-এ নানা ধরনের টেক্সট সেভাবে সামলানো তুলনায় কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। একদিকে দুনিয়াজোড়া মেধা-সম্পত্তি আইনের বজ্র আঁটুনি, অন্যদিকে ইন্টারনেট-এর ফসকা গেরো—এই আপাতবৈষম্যের ফল কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক টক্কর ও কৌশলেব ওপব, স্রেফ প্রযুক্তির ওপর নয়। এ ব্যাপাবে 'মিন্‌স্' ও 'মোড'-এর যে-তফাতের কথা কার্লা হেস্‌সে বলেছেন তা মনে রাখা প্রয়োজন।

এ তো গেল পাঠ্যবস্তুর ওপর অধিকারেব প্রশ্ন। এবার আসি পাঠ্যবস্তুর স্বরূপ নিয়ে উদ্‌বেগের কথায়। যন্ত্রজাত উন্মুক্ত অতিপাঠেব সম্ভাবনা অনেক, তাকে স্বাগত না জানাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু 'ওপেন টেক্সট'-এর প্রবেশ মানেই অন্য ধরনের বাকি সব টেক্সট-এর প্রস্থান নয়। একো গানবাজনার দুনিয়া থেকে একটি নমুনা দিয়েছেন। জ্যাজ-এর গঠন অনেকটা খোলামেলা, তাৎক্ষণিক ও যৌথ সৃজনের ওপব নির্ভরশীল। তার আগমনের ফলে পাশ্চাত্য সংগীতের অন্যান্য শৈলী বাতিল হয়ে যায়নি।[৩৭] একইভাবে দৃশ্যকলাব জগতে আমরা কিছু কিছু ইনস্টলেশন-এর কথা ভাবতে

পারি, যেখানে বিশেষ স্থানানুষঙ্গ, এমনকী দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও শিল্পবস্তুর অনির্দিষ্ট ফর্ম ভাঙতে-গড়তে পারে। তাই বলে সাবেক ছবি ও ভাস্কর্য সৃষ্টির কাজে ভাঁটা পড়েনি।

জ্যাজ, ইনস্টলেশন ইত্যাদির প্রভাব দেখা যাবে সংগীত ও দৃশ্যশিল্পের প্রথাগত আঙ্গিকগুলিতে। অতএব উন্মুক্ত অতিপাঠের কিছু কৌশল, কিছু অভিজ্ঞতা ছাপা বই ও সাহিত্য আত্মসাৎ করবে, এমনটাই স্বাভাবিক। এখানেও উপমা ও রূপক আমাদের চিন্তা গুলিয়ে দিতে পারে। জাক দেরিদা প্রশ্ন তুলেছেন, ফ্রয়েডের যুগে ই-মেল, ফ্যাক্স ইত্যাদি থাকলে তাঁর স্মৃতি সংক্রান্ত তত্ত্ব ও মনঃসমীক্ষণ শুধুমাত্র লিখন তথা 'ইমপ্রেশন'-এর উপমায় আটকে থাকত কি না।[৩৮] এসব ব্যাপারে কিন্তু কোনো চটজলদি অঙ্ক মেলে না। ফ্রয়েড বেঁচে থাকলে মগজের সি.টি. স্ক্যান আর এম.আর.আই. নিয়েই উত্তেজিত হতেন বেশি, ই-মেল বা ফ্যাক্স নিয়ে বোধ হয় নয়। লিখন ও মুদ্রণের মাধ্যমে স্মৃতির ভৌত সংগঠনের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তার পরেও কিন্তু 'বিশুদ্ধ' স্মৃতিকে জড়জগৎ-নিরপেক্ষ এক প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি বের্গসঁ-র, চেতনাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করতে একটুও কষ্ট হয়নি উইলিয়াম জেমস-এর।

আগেই বলেছিলাম, বইয়ের কথা সাঙ্গ করে একটু সাহিত্যের কথা পাড়ব। আমরা যারা সাহিত্য পড়ি ও পড়াই তাদের তো পুরোনো বই নিয়েই থেকে যেতে হবে আরও বহুদিন। আমাদের তাহলে বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে উত্তেজনা বা উৎকণ্ঠার কোনো কারণ আছে কি? এই নিয়ে সংক্ষেপে দুটো কথা বলেই শেষ করব।

প্রথম কথা, উন্মুক্ত অতিপাঠের উঠতি গরমে সাবেক পাঠবিচারের পেট দমশম করছে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সাহিত্যবিদ্‌দের মধ্যে অনেকে ফোকটে একটু নাটক ফেনাতে পছন্দ করেন। তাঁদের ভাবখানা এমন যেন অতিপাঠের সালিশিতে এখন সব পাঠ্যবস্তুরই সিংদুয়ার আর খিড়কির দোর হাট করে খুলে গেছে, এখন সমস্ত টেক্সট-এর ঘরদালানই তাত্ত্বিকের মামার বাড়ি, সেখানে যখন খুশি ঢুকে পড়ে যা খুশি চাওয়া যায়। এ ব্যাপারে একো-র খানিকটা হুঁশ-দিশ আছে। যেমন খুশি টেক্সট নির্মাণ করতে পাবা আর নির্মিত টেক্সট-এর প্রতি কর্তব্যবোধের মধ্যেকার তফাত সম্পর্কে তাঁর চেতাবনি অতিপাঠাসক্তের টনক কাঁপালে ভালো:

> However there is a difference between implementing the activity of producing texts and the existence of produced texts. We shall have a new culture in which there will be a difference between producing infinitely many texts and interpreting precisely a finite number of texts. That is what happens in our present culture in which we evaluate differently a recorded performance

of Beethoven's Fifth and a new instance of New Orleans jam session.[৩৯]

দ্বিতীয় কথা, পুরোনো বই নিয়ে পড়ে থাকলে কী হবে, সেই বইয়ের বিশ্লেষণে বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বাড়বে। 'লিটারেচার অন লাইন' জাতীয় ডেটাবেস-এ এখন এত বিপুল পাঠ ও তথ্যের সন্নিবেশ যে, লেখক নিরূপণ বা শৈলীর ব্যবচ্ছেদ অনেক সহজ হয়ে গেছে। পাঠভেদের বিন্যাস, সম্পাদকীয় টীকা—এ সমস্তই হাইপারটেক্সট-এর প্রকরণ মেনে অনেকটাই বদলাতে বাধ্য। এমনকী পুরোনো পাঠ্যবস্তুর ছাপা 'ক্রিটিকাল' সংস্করণেও এর প্রতিফলন ক্রমেই আরও স্পষ্ট হচ্ছে।[৪০]

সাহিত্যবিচারের কাজে কম্পিউটার-এর ব্যবহার বাড়লেও সেই যন্ত্রে কীভাবে তথ্য বা বিশ্লেষণের গাণিতিক পর্বক্রম ঢোকানো হয়েছে তা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ জানেন না। আমার কলমটা কারখানায় কীভাবে বানানো হয়েছে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু জানলে বোধ হয় এই লেখাটার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন হত না। যখন পরিগণক যন্ত্রে লিখি তখন গাণিতিক সংকেত থেকে হরফে তরজমার একটা ক্রিয়া চলতে থাকে আমার অজান্তেই। সেটাও জানলে হয়তো আমার বক্তব্য একই থাকত। কিন্তু সাহিত্যের বিশ্লেষণে যে-সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যবহার হয়ে থাকে সেটাব মতিগতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভুল হল। িনি এই কাজে সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরি করছেন তিনি সাহিত্যবিচার সম্পর্কে আনপড় হলে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়।

২০০১ সালে নামজাদা পাঠতাত্ত্বিক জোরোম ম্যাকগান 'ভিসিব্‌ল্ অ্যান্ড ইনভিসিব্‌ল্ বুক্‌স্' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বিখ্যাত রোসেটি আর্কাইভস ইন্টারনেট-এর জন্যে নির্মাণ করবার পব তাঁর মালুম হয় যে, এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর বেশিরভাগই ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রয়োজন ও ফরমাশ বুঝে তৈরি।[৪১] সাহিত্য বিশ্লেষণে আমরা যে-ধরনের সফ্‌ট্‌ওয়্যার চাই তা কিন্তু অন্য জাতের। যেমন, ছাপা পদ্য যখন পড়ছি তখন অন্ত্যমিল, যতি, ফাঁক, পুনরাবর্তন যেভাবে মনের কান দিয়ে শুনি সেভাবে হয়তো মুদ্রাকরও ছেপে উঠতে পারেন না। এসব মাপতে পারার মতো যন্ত্রবান্ধব না পেলে সাহিত্যের প্রযুক্তিযাত্রা কিন্তু বোকা-বোকা ওজর তুলে থমকে যেতে বাধ্য।

ভবিষ্যতে সাহিত্য বিশ্লেষণের কাজে সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরির কাজে প্রযুক্তিবিদ্ কি সাহিত্যজ্ঞের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন? হাত মেলাবার দরকার নেই, অ্যাজেন্ডা মিললেই হবে। তাতে করে কি আমরা আমাদের পাঠরীতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীর নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করব? জানি না। আশার বাণী শুনিয়েছেন রিচার্ড ল্যানহাম, ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত *দি ইলেকট্রনিক ওয়ার্ড* নামের এক বইয়ে। ল্যানহাম ভবিষ্যৎ শুনে বলেছেন যে, বৈদ্যুতিন পাঠ আমাদের paedeia বা রেটরিক-নির্ভর জ্ঞানচর্চার আদর্শে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, যে-আদর্শ পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে পাঠ্যাধারের প্রতি সমান মনোযোগ

দাবি করে।[৪২] হলে ভালো। তবে কথার প্রেরণা আর কথার প্রেরকের মধ্যে তো এখন কথা নেই। যদি নতুন পাঠ প্রযুক্তির দৌলতে বিজ্ঞানী ও কলাবিদ্‌দের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব হয়, তবে সেটা হবে বইয়ের পক্ষে সেরা খবর। নতুন অতিপাঠের কপালে যা-ই থাকুক, এতে করে অতীতের বইয়ের নতুন ভবিষ্যৎ খুলে যাবে, এ কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

প্রবন্ধটিব প্রাথমিক খসড়া ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা হিসেবে পড়া হয়।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৮ম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮), পৃ ৪১৫-৩২। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য একটু ভিন্ন, তাতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ছেদের কথা আছে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার কথা আছে। বাংলাব ঐক্য যে তার ভাষা ও সাহিত্যে, বাংলা যে এক 'চিন্ময়' পদার্থ, এ কথা আবও স্পষ্ট করে তিনি বলবেন কাশীতে ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে, উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে। দ্রষ্টব্য: 'সভাপতিব অভিভাষণ', *সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২৩শ খণ্ড (১৩৫৪), পৃ ৪৬৭-৭৭।

২। রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী, 'মাতৃমন্দির', *রামেন্দ্র-রচনা-সংগ্রহ*, সম্পাদক. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল (কলকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৭১), পৃ ৫২৩, ৫৩২-৪।

৩। Michel de Certeau, 'History Science and Fiction', *Heterologies Discourse on the Other*, trans Brian Massumi (Minneapolis University of Minnesota Press, 1986), p 216

৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ: ১৩২১', *নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সবকার (কলকাতা. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২), পৃ ১৮৩।

৫। O B Hardison, *Disappearing through the Skylight: Culture and Technology in the Twentieth Century* (London. Viking, 1989); Gregory Ulmer, *Teletheory Grammatology in the Age of Video* (New York Routledge, 1989), Alvin Kernan, *The Death of Literature* (New Haven, Conn · Yale University Press, 1990), Patrick Connor, 'Hypertext in the Last Days of the Book', *Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester*, 74 3 (1992), pp 1-24, Sven Birkerts, *The Gutenberg Elegies The Fate of Reading in an Electronic Age* (New York: Ballantine, 1994), George P Landow, 'Twenty Minutes into the Future, Or How are We Moving beyond the Book?', *The Future of the Book*, ed Geoffrey Nunberg (Berkeley, LA University of California Press, 1996), pp 209-37, Warren Cherniak et al (eds), *Beyond the Book Theory, Culture and the Politics of Cyberspace* (Oxford: Office for Humanities Communication, 1996)

৬। Umberto Eco, 'Afterword', *Future of the Book*, ed. Nunberg, pp 295-306

৭। নবারুণ ভট্টাচার্য, *কাঙাল মালসাট* (শ্রীরামপুর: সপ্তর্ষি, ২০০৩), পৃ ২০।

৮। Eco, 'Afterword', p 295 দ্রষ্টব্য· Marshall Mcluhan, *The Gutenberg Galaxy The Making of Typographic Man* (London: Routledge and Kegan Paul, 1962).

৯। Keith Thomas, 'The Meaning of Literacy in Early Modern England', *The Written Word Literacy in Transition*, ed Gerd Baumann (Oxford. Clarendon Press 1986), pp 97-131

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'লোকশিক্ষা', *বঙ্কিম রচনাবলী*, সম্পাদক: যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১; ১৩শ মুদ্রণ, ১৪০৫), পৃ ৩২৪। দ্রষ্টব্য: [লেখক-নাম অনুল্লিখিত], 'বাঙ্গালার পাঠক পড়ান ব্রত', *বঙ্গদর্শন*, ৭.১০ (মাঘ ১২৮৭), পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ (কলকাতা: ন্যাশানাল লিটারেচার, ১৩৪৬), ৭ম খণ্ড, পৃ ৪৫৯-৬৪।

১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ ৮২৫।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'লোকশিক্ষা', পৃ ৩২৪।

১৩। Carla Hesse, 'Books in Time', *Future of the Book*, ed Nunberg, p 22

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রামায়ণের সমালোচন', *লোকরহস্য*, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬।

১৫। Eco, 'Afterword', p 298

১৬। দ্রষ্টব্য. Alberto Manguel, *A History of Reading* (London Harper Collins, 1996), PP 103-4

১৭। বইটি সম্পর্কে আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য. *Society and Politics in the Plays of Thomas Middleton* (Oxford. Clarendon Press, 1996), p 42

১৮। Blake Morrison, *The Justification of Johann Gutenberg* (London Chatto and Windus, 2000), p. 160

১৯। দ্রষ্টব্য· *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, সম্পাদক. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড (১৩৩৯, ৩য় সংস্করণ, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৮), পৃ ৮৮, সুকুমার সেন, 'বটতলার বেসাতি', *বিশ্বভারতী পত্রিকা* ৭ (১৯৪৮), পৃ ২০, ২৭; Sukumar Sen, 'Early Printers and Publishers in Calcutta, *Bengal Past and Present*, 87 (1986), p 63

২০। Johann Wolfgang Goethe, *Faust*, Part I, trans Philip Wayne (Harmondsworth Penguin, 1949), p 88

২১। Regis Debray, 'The Book as Symbolic Object', trans Eric Rauth, *Future of the Book*, ed Nunberg, p 149

২২। Walter Ong, *Ramus, Method, and the Decay of Dialogue* (Cambridge, Mass Harvard University Press, 1958), pp. 307-14

২৩। Jorge Luis Borges, 'The Library of Babel', *Collected Fictions*, trans Andrew Hurley (London: Allen Lane, 1999), p 118

২৪। Thomas Hariot, *A True and Brief Report of the New-found Land of Virginia* (1588), *The Literature of Renaissance England*, ed John Hollander and Frank Kermode (New York Oxford University Press, 1973), p 47

২৫। Robert Escarpit, *The Book Revolution* (London George G Harrap, 1966), p 17 আমার করা অনুবাদ।

২৬। Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, trans A M Sheridan Smith (1972, London· Tavistock, 1974), pp 23-4

২৭। প্লেটো তাঁর মত নানা সংলাপে ব্যক্ত করেছেন। সবচেয়ে চেনা সূত্র *ফেড্রাস*।

২৮। দ্রষ্টব্য: Marry J Carruthers, *The Book of Memory A Study of Memory in Medieval Culture* (Cambridge Cambridge University Press, 1990), pp 231-9

২৯। Walter J. Ong, *Orality and Literacy The Technologizing of the Word* (London Methuen, 1982), p. 121

৩০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'লাইব্রেরি', *বিচিত্র প্রবন্ধ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড (১৩৪৭), পৃ ৪৩৯।

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭শ খণ্ড (১৩৫০), পৃ ২৮৮। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি। দ্রষ্টব্য: 'গ্রন্থ, পাঠ, শিল্পকর্ম: রবীন্দ্রনাথ ও রচনার দৃশ্যপট', *অবভাস*, ৫.৪ (২০০৬), পৃ ১২৪-৪১।

৩২। দ্রষ্টব্য: Manguel, *History of Reading*, p 298.

৩৩। William Wordsworth, 'The Tables Turned' (1798), *Poetical Works*, ed. Thomas Hutchinson, rev Ernest De Selincourt (London: Geoffrey Cumberlege, 1904), p. 481.

৩৪। Eco, 'Afterword', pp. 302-4. দ্রষ্টব্য: Michael Joyce, *Of Two Minds: Hypertext, Pedagogy and Poetics* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995), pp. 39-54, 177-9. 'হাইপারটেক্সট' কথাটা যিনি প্রথম ব্যবহার করেন সেই থিওডর নেলসন শব্দটির সংজ্ঞার্থ করেছেন এভাবে: 'By "hypertext" I mean non-sequential writing-text that branches and allows choices to the reader, best read in an interactive screen As popularly conceived this is a series of text chunks connected by links which offer the reader different pathways ' উদ্ধৃতিসূত্র: Theodor H. Nelson, *Literary Machines* (Swarthmore, Pa.: self-published, 1981), p. 2. 'টেক্সট' বলতে যদি এর সঙ্গে বৈদ্যুতিন লিংক দিয়ে জুড়ে দেওয়া দৃশ্য, ধ্বনি ইত্যাদিও ধরি তাহলে 'হাইপারমিডিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা চলে। দ্রষ্টব্য: George P. Landow, *Hypertext 3 0: Critical Theory and New Media in an Era of Globalization* (1992: Baltimore Johns Hopkins University Press, 2006), p. 3. হাইপারটেক্সট আর অন্য ধরনের বৈদ্যুতিন পাঠ্যবস্তু—বিজ্ঞাপনের গ্রাফিক্স, ই-মেল ইত্যাদি—আলাদা জিনিস। আলোচনায় এদের গুলিয়ে ফেললে মুশকিল।

৩৫। দ্রষ্টব্য: *Contested Commons / Trespassing Publics: A Public Record* (Delhi: Sarai, 2005)। এটি জানুয়ারি ২০০৫-এ অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের প্রতিবেদন। বিশেষ দ্রষ্টব্য· John Frow, Peter Jaszi ও McKenzie Wark-এর বক্তব্য; পৃ ১-৩, ২৩-৪, ৫৩-৪। আমার বক্তব্যের প্রতিবেদন রয়েছে ৩১-৩ পৃষ্ঠায়। প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইট-এ দেখা যেতে পারে: www.sarai.net/events/ip_conf/ip_conf.htm

৩৬। Hesse, 'Books in Time', pp 23-4

৩৭। Eco, 'Afterword', p 303

৩৮। Jacques Derrida, *Archive Fever: A Freudian Impression*, trans. Eric Prenowitz (Chicago· University of Chicago Press, 1996).

৩৯। Eco, 'Afterword', p 303.

৪০। সম্পাদনার তত্ত্বের ওপর বৈদ্যুতিন পাঠের প্রভাব সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে বিস্তর, বাংলায় প্রায় কিছুই হয়নি। নমুনা হিসেবে দ্রষ্টব্য: Kathryn Sutherland (ed.), *Electronic Text Investigations in Method and Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1997); Richard J. Finneran (ed), *The Literary Text in the Digital Age* (Ann Arbor· University of Michigan Press, 1996); Peter L. Shillingsburg, *Scholarly Editing in the Computer Age· Theory and Practice* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996).

৪১। Jerome McGann, 'Visible and Invisible Books: Hermetic Images in N-Dimensional Space', *New Literary History*, 32 (2001), pp. 289-90

৪২। Richard A Lanham, *The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts* (Chicago. University of Chicago Press, 1993), p. 24.

ব্যক্তিনাম নির্দেশিকা

চিত্রসূচি